বঙ্গদর্শন।

BENGAL LIBRARY
1880
CALCUTTA

ষষ্ঠ বৎসর।

১২৮৫ সাল।

5

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শনযন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৯।

মূল্য ৩, টাকা।

ডাকমাশুল ৷৹

সূচিপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

১। অশনি ৩৬০
২। অশোক ৪৯৭
৩। আকবরসাহের খোসরোজ ১২
৪। ইয়াং বাঙ্গালির সামাজিক বুদ্ধি ২৭৯
৫। উৎকলের প্রকৃতাবস্থা ২৮৩,৩০৫, ৩৪২
৬। একসচেঞ্জ ... ৫৩৮
৭। একজন বাঙ্গালি গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব ... ১৩৭
৮। কমলাকান্তের পত্র ... ১৮৪
৯। কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ ২৪১
১০। কালিদাস ও সেক্ষপীয়র ২৮
১১। কুন্দনন্দিনী ৬৯
১২। গুরুগোবিন্দ ৪৩৩
১৩। চন্দ্রের বৃত্তান্ত ... ৫৫২
১৪। চিত্ত-মুকুর ৩৭৩
১৫। জটাধারীর রোজনামচা ২১,৬২,১১৩, ১৬৭,১৯৩,২৫২,৩১৪,৩৪৮,৪০৬, ৪৪৩,৪৮৪,৫২৯
১৬। জুরীর বিচার ২২৭
১৭। জেন্দ অবস্থা... ... ৪৭৭
১৮। তর্ক সংগ্রহ ... ৪১,৫৮,১০৩,১৫৫
১৯। তবু বুঝিল না মন ... ৪১০
২০। তৈল ৫৪৯
২১। দুর্গোৎসব ২০২
২২। নানক ১০৬
২৩। পদোন্নতির পন্থা ... ৫৬৮

২৪। প্রত্যাখ্যান ৫০৫
২৫। প্রাচীন ভারতবর্ষ ... ১৭৪
২৬। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৪৫,৯৩,১৪০,১৮৮, ৩৮১,৫২৮
৩৮। বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি ৩৯৬
৩৯। বঙ্গোন্নয়ন ৪৮১,৫৬৬,
৪০। বক্তৃতা ১৩৪
৪১। বাঙ্গালা বর্ণমালা ... সংস্কার ৪১৩,৪৬৯,৪৯৩
৪২। বাঙ্গালা ভাষা ... ৭৭
৪৩। বাঙ্গালির জন্য নূতন ধর্ম্ম ৩০১
৪৪। বাঙ্গালির বীরত্ব ... ২০৯
৪৫। বিবেক ও নৈরাশ ... ৫৬৩
৪৬। বৈজিকতত্ত্ব ... ১৭,১৬০
২৭। ভার্গব বিজয় ... ২৬৯
২৮। ভারতবর্ষে লোকবৃদ্ধির ফল ৩১৯
২৯। মন্দর পর্ব্বত ... ৩৮৫
৩০। মণিপুরের বিবরণ ... ২৬০
৩১। মনুষ্যজাতির উন্নতি ... ৪৫৯
৩২। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ৫২০
৩৩। মাধবীলতা ৩২৭,৩৬২,৪৬৭,৫০৯
৩৪। রত্ন রহস্য ৩৩৭,৩৯২
৩৫। রাগ নির্ণয় ৮০,১৩০,২১৮
৩৬। রাজসিংহ ১,৪৯,৯৭,১৪৫,২৩৪
৩৭। লোক শিক্ষা ... ৩৭৯
৪৭। সমাজ সংস্কার ... ২৮৯
৪৮। সমাজের [illegible] ... [illegible]

বঙ্গদর্শন।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

রাজসিংহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুল-পুরোহিত। কন্যানির্ব্বিশেষে, চঞ্চল-কুমারীকে ভাল বাসিতেন। তিনি মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত। চঞ্চলের নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন—কুলপুরোহিতের অবারিত দ্বার। পথিমধ্যে নির্ম্মল তাঁ-হাকে গ্রেপ্তার করিল।—এবং সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিভূতিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, রুদ্রাক্ষশোভিত, হাস্যবদন, সেই ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মল দেখিয়াছিল, যে চঞ্চল কাঁদিতেছে কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার মেয়ে নহে। গুরু-দেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমূর্ত্তি। বলি-লেন,

"মা লক্ষ্মী,—আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন?"

চ। আমাকে বাঁচাইবার জন্য। আর কেহ নাই যে আমায় বাঁচায়।

অনন্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন,"বুঝেছি রুক্মিণীর বিয়ে, সেই পুরোহিত বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তা দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কিনা—পথ খরচটা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।"

চঞ্চল, একটী জরির থলি বাহির ক-রিয়া দিল। তাহাতে আশরফি ভরা। পুরোহিত দুইটা আশরফি লইয়া অব-শিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন "পথে অন্নই খাইতে হইবে—আশরফি খাইতে

পারিব না। একটি কথা বলি, পারিবে কি ?''

চঞ্চল বলিলেন, "আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও, আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাও পারি। কি আজ্ঞা করুন।"

মিশ্র। রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে ?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "আমি বালিকা—পুরস্ত্রী; তাঁহার কাছে অপরিচিতা—কি প্রকারে পত্র লিখি ? কিন্তু আমি তাঁহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লজ্জারই বা স্থান কই ? লিখিব।"

মিশ্র। আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে ?

চ। আপনি বলিয়া দিন।

নির্ম্মল সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল,

"তা হইবে না। এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয়—এ মেয়েলি বুদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন।"

মিশ্রঠাকুর চলিয়া গেলেন কিন্তু গৃহে গেলেন না। রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, "আমি দেশপর্য্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।" কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্য্যন্ত যাইবেন তাহা স্বীকার করিলেন, এবং রাণার নিকট পরিচিত হইবার জন্য একখানি লিপির জন্য প্রার্থিত হইলেন। রাজাও পত্র দিলেন।

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততক্ষণ চঞ্চল ও নির্ম্মল, দুইজনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী, একটী কৌটা হইতে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট মুক্তাবলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধি স্বরূপ আপনি এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুত কুলের যিনি চূড়া তিনি কখন রাজপুতকন্যার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিশ্রঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র, যষ্টি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া অনন্ত মিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, "কেন যাইবে ?" মিশ্রঠাকুর বলিলেন, "রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন ; বিরহযন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল

না, অর্থলাভের আশা স্বরূপ শীতলবারি-প্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিবিয়া গেল। মিশ্র ঠাকুর একাকী যাত্রা করিলেন।

পথ অতি দুর্গম—বিশেষ পার্ব্বত্য পথ বন্ধুর, এবং অনেক স্থানে আশ্রয়শূন্য। একাহারী ব্রাহ্মণ যে দিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সেদিন সেখানে আতিথ্য স্বীকার করিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন করিতেন। পথে কিছু দস্যুভয় ছিল—ব্রাহ্মণের নিকট রত্নবলয় আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গী ছাড়া হইলেই আশ্রয় খুঁজিতেন। একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, পরদিন প্রভাতে গমনকালে, তাঁহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চারিজন বণিক্ ঐ দেবালয়ের অতিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি উদয়পুর যাইব।" বণিকেরা বলিল, "আমরাও উদয়পুর যাইব। ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়পুর আর কতদূর।" বণিকেরা বলিল, "নিকট। আজি সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুর পৌঁছিতে পারিব। এ সকল স্থান রাণার রাজ্য।"

এই রূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতে ছিল। পার্ব্বত্য পথ, অতিশয় দুরারোহণীয়, এবং দুরবরোহণীয় এবং সচরাচর বসতিশূন্য। কিন্তু এই দুর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল—এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে। পথিকেরা এক অনির্ব্বচনীয় শোভাময়, অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। দুইপার্শ্বে অনতি উচ্চ পর্ব্বতদ্বয়, হরিৎ বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে; উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিণী নীলকাচপ্রতিম সফেণ জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনান্তের অভিমুখে চলিতেছে। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে, আর কোন দিক্ হইতে কেহ পথিককে দেখিতে পায় না; কেবল পর্ব্বতদ্বয়ের উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভৃতস্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক্ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঠাঁই টাকা কড়ি কি আছে?"

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন বুঝি এখানে দস্যুর বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে। দুর্ব্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমার কাছে কি থাকিবে?"

বণিক্ বলিল, "যাহা কিছু থাকে আ

মাদের নিকট দাও। নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না।”

ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন “রত্নবলয় বক্ষার্থ বণিক্‌দিগকে দিই,” আবার ভাবিলেন, “ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই বা বিশ্বাস কি?” এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ বলিলেন, “আমি ভিক্ষুক আমার কাছে কি থাকিবে?”

বিপদ কালে যে ইতস্ততঃ করে সেই মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছদ্মবেশী বণিকেরা বুঝিল যে অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। একজন তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকে আঁটু দিয়া বসিল—এবং তাহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। ব্রাহ্মণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিল। আর একজন, তাহার গাঁটরি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারীপ্রেরিত বলয়, দুইখানি পত্র, এবং দুই আশরফি পাওয়া গেল। দস্যু তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, “আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল, তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।”

আর একজন দস্যু বলিল, “ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজ কাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য—বীর পুরুষে তাহার শাসন আর বাহুবলে অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এই গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।”

এই বলিয়া দস্যুগণ মিশ্রঠাকুরের হস্ত পদ এবং মুখ তাহার পরিধেয় বস্ত্রে দৃঢ়তর বাঁধিয়া পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত একটা ক্ষুদ্রবৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চলকুমারীদত্ত রত্নবলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্রনদীর তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না, পলায়নে ব্যস্ত।

দস্যুগণ পার্ব্বতীয়া প্রবাহিণীর তটবর্ত্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি দুর্গম ও মনুষ্যসমাগমশূন্য পথে চলিল। এইরূপ কিছু দূর গিয়া, এক নিভৃতগুহা-মধ্যে প্রবেশ করিল।

গুহার ভিতর খাদ্য দ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্যুগণ কখন কখন এই গুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে। এমন কি কলসীপূর্ণ জল পর্য্যন্ত ছিল। দস্যুগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল। এবং এক একজন পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল। একজন বলিল,

“মাণিকলাল, রসুই পরে হইবে। প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক।”

মাণিকলাল বলিল, "মালের কথাই আগে হউক।"

তখন আশরফি দুইটি কাটিয়া চারিখণ্ড হইল। এক এক জন এক এক খণ্ড লইল। রত্নবলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না—তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র দুইখানি কি করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। দলপতি বলিলেন, কাগজে আর কি হইবে—উহা পোড়াইয়া ফেল। এই বলিয়া পত্র দুইখানি সে মাণিকলালকে অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার জন্য দিল।

মাণিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্র দুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। বলিল "এ পত্র নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।"

"কি? কি?" বলিয়া আর তিন জন গোলযোগ করিয়া উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চলকুমারীর পত্রের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চৌরেরা বড় আনন্দিত হইল।

মাণিকলাল বলিল, "দেখ এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।"

দলপতি বলিল, "নির্ব্বোধ! রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা এ পত্র কোথায় পাইলে তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি বলিবে যে আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি? রাণার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। তাহা নহে। এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহকে দিব—বাদশাহের কাছে এরূপ সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায় আমি জানি। আর ইহাতে—"

দলপতি কথা সমাপ্ত করিতে অবকাশ পাইলেন না। কথা মুখে থাকিতে থাকিতে তাঁহার মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অশ্বারোহী পর্ব্বতের উপর হইতে দেখিল, চারিজনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই, তখন সে পৌঁছে নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল উহারা কোন পথে যায়। তাহারা যখন, নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিল। পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, "বিজয়! এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্ব্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্রঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন।" মিশ্র বলিলেন, "চারিজনের সঙ্গে আমি একত্রে আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ, তাহারা বলে আমরা বনিক্। এই খানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "একগাছি মুক্তার বালা দুইটি আশরফি, দুই খানি পত্র।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন। উহারা কোন্‌দিকে গেল, আমি দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে? তাহারা চারিজন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিল "দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক।"

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল, এবং হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত, যে পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে, অতি সাবধানে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্ব্বতের শিখর দেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন, যে দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, চারিজনে যাইতেছে। সেই খানে কিছু ক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে উহারা হয় ঐ খানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না। নয়, ঐ পর্ব্বততলে গুহা আছে দস্যুরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত, বৃক্ষাদি চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বন্যপথে প্রবেশপূর্ব্বক, সেই সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে, বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ব্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্ব্বততলে একটী গুহা আছে। গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

এই পর্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। উহারা চারি জন—তিনি একা; এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না। যদি গুহাদ্বার রোধ করিয়া উহারা চারিজনে তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ কথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয়

কি? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে দুই এক জন অবশ্য মরিবে? যদি উহারা সেই দস্যুদল না হয়? তবে নিরপরাধীর হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথা বার্ত্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীত হইল যে, ইহারা দস্যু বটে। রাজপুত, তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিষ্কোষিত করিয়া দক্ষিণহস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বামহস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া অন্যমনস্ক ছিল—সেই সময়ে রাজপুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢমুষ্টিধৃত তরবারিতে দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই, দ্বিতীয় এক জন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়া ছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন, যে সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত, অন্য দুইজনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, যে একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক দেখিয়া, গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে রাজপুত যে বর্শা, বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল, তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহাহইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ।" এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য

করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন, দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া, মাণিক-লালের চুল ধরিলেন। এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! আমার জীবনদান করুন—রক্ষা করুন—আমি শরণাগত!"

রাজপুত, তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন,

"তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই—কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে, আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষের জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখন দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, এক দিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন?"

"দস্যু বলিল, "মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে?"

তখন রাজসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার জীবনদান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ আমি যদি তোমাকে কোনপ্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হইব।"

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শাস্তি লইতেছি।"

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে, আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল ঐ শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটীতে পড়িল। দস্যু বলিল, "মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।"

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন,

"ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?"

দস্যু বলিল, "এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।"

রাজসিংহ বলিলেন, "মাণিকলাল,

আজি হইতে তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে। এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে—তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও, তোমাকে ভূমি দিব বাস করিও।।"

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল। এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি,এবং আশরফি চারিখণ্ড আনিয়া দিল। বলিল, "ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনারই জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন,তাঁহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা। বলিলেন,

"মাণিকলাল—পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস—তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।"

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে দস্যু একবার তাহার ক্ষত ও আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না, বা তৎসম্বন্ধে একটা কথাও বলিতেছে না—বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণাতটিনীতীরে এক সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তথায়,উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীর সঙ্গে সুমন্দ-মধুর-বায়ু, এবং স্বরলহরী বিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহঙ্গমগণ ধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বন্যকুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্ব্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে। তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে, এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে। সেইখানে রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া, পত্র দুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তার পর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র এইরূপ,—

"রাজন্—আপনি রাজপুত কুলের চূড়া—হিন্দুর শিরোভূষণ। আমি অপরিচিতা হীনমতি বালিকা—নিতান্ত বিপন্না না হইলে কখনই আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। নিতান্ত বিপন্না বুঝিয়াই আমার এ দুঃসাহস মার্জ্জনা করিবেন।

যিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন—আমি রাজপুতকন্যা। রূপনগর অতি

ক্ষুদ্র রাজ্য—তথাপি বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি রাজপুত—রাজকন্যা বলিয়া আমি মধ্যদেশাধিপতির কাছে গণ্যা না হই,—রাজপুতকন্যা বলিয়া দয়ার পাত্রী। কেন না আপনি রাজপুতপতি—রাজপুত কুলতিলক।

অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ শ্রবণ করুন। আমার দুরদৃষ্টক্রমে, দিল্লীর বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য, আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য আসিবে। আমি রাজপুতকন্যা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভবা—কি প্রকারে তাতারের দাসী হইব? রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বকসহচরী হইব? হিমালয় নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঙ্কিল তড়াগে মিশাইব? রাজপুতকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী বর্ব্বরের আজ্ঞাকারিণী হইব? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ করিব।

মহারাজাধিরাজ! আমাকে অহঙ্কৃতা মনে করিবেন না। আমি জানি যে আমি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর কন্যা—যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজাধিরাজগণও দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান করা কলঙ্ক মনে করেন না—কলঙ্ক মনে করা দূরে থাক, বরং গৌরব মনে করেন। আমি সে সব ঘরের কাছে কোন ছার? আমার এ অহঙ্কার কেন? এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ! সূর্য্যদেব অস্তে গেলে খদ্যোত কি জ্বলে না? শিশিরভরে নলিনী মুদিত হইলে, ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুম কি বিকশিত হয় না? যোধপুর অম্বর কুলধ্বংস করিলে রূপনগরে কি কুলরক্ষা হইতে পারে না? মহারাজ, ভাটমুখে শুনিয়াছি, যে বনবাসী রাণা প্রতাপের সহিত মহারাজা মানসিংহ ভোজন করিতে আসিলে, মহারাণা ভোজন করেন নাই, বলিয়াছিলেন যে তুর্ককে ভগিনী দিয়াছে তাহার সহিত ভোজন করিব না। সেই মহাবীরের বংশধরকে কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে এই সম্বন্ধ রাজপুতকুলকামিনীর পক্ষে ইহলোকে পরলোকে ঘৃণাস্পদ? মহারাজ! আজিও আপনার বংশে তুর্ক বিবাহ করিতে পারিল না কেন? আপনারা বীর্য্যবান মহাবলাক্রান্ত বংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নহে। মহাবল পরাক্রান্ত রুমের বাদশাহ কিম্বা পারস্যের শাহ দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান গৌরব মনে করেন। তবে উদয়পুরেশ্বর কেবল তাহাকে কন্যাদান করেন না কেন? তিনি রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই রাজপুত। মহারাজ! প্রাণত্যাগ করিব তবু কুল রাখিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

প্রয়োজন হইলে প্রাণবিসর্জ্জন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, এ অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বি

পদে এ জীবন রক্ষা করিবে? আমার পিতার ত কথাই নাই, তাঁহার এমন কি সাধ্য যে আলমগীরের সঙ্গে বিবাদ করেন। আর যত রাজপুত রাজা, ছোট হউন বড হউন, সকলেই বাদশাহের ভৃত্য—সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর। কেবল আপনি—রাজপুতকুলের একা প্রদীপ—কেবল আপনিই স্বাধীন—কেবল উদয়পুরেশ্বরই বাদশাহের সমকক্ষ। হিন্দুকুলে আর কেহ নাই—যে এই বিপন্না বালিকাকে রক্ষা করে—আমি আপনার স্মরণ লইলাম—আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না।

কত বড গুরুতর কার্য্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, তাহা আমি না জানি, এমত নহে। আমি কেবল বালিকাবুদ্ধির বশীভূতা হইয়া লিখিতেছি এমত নহে। দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই, যে তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে। কিন্তু মহারাজ! মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রাম সিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন—আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর—আপনি কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা হীনবল? শুনিয়াছি নাকি মহারাষ্ট্রে এক পার্ব্বতীয় দস্যু আলমগীরকে পরাভূত করিয়াছে—সে আলমগীর কি রাজস্থানের রাজেন্দ্রের কাছে গণ্য?

আপনি বলিতে পারেন "আমার বাহুতে বল আছে—কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্য এত কষ্ট কেন করিব? আমি কেন অপরিচিতা মুখরা কামিনীর জন্য প্রাণিহত্যা করিব?—ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব?" মহারাজ! সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাজধর্ম্ম নহে? সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা কি রাজপুতের ধর্ম্ম নহে?

মহারাজ! আর একটা কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নহে। আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি, যে, যে বীর আমাকে মোগল হস্তহইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে স্ত্রীলাভ বীরের ধর্ম্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাণ্ডব দ্রৌপদীলাভ করিয়াছিলেন। যাদবীসেনাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অর্জ্জুন সুভদ্রাকে পাইয়াছিলেন। কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমণ্ডলসমক্ষে আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া ভীষ্মদেব রাজকন্যাগণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হে রাজন্! রুক্মিণীর বিবাহ কি মনে পড়ে না? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদ্বিতীয় বীর—আপনি কি বীরধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইবেন?

আমি মুখরা, কতই বলিতেছি—পাছে বাক্যে আপনাকে না বাঁধিতে পারি—

এজন্য গুরুদেবহস্তে রাখিব বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন—তার পর আপনার রাজধর্ম্ম আপনার হাতে। আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষ-ভোজন করিব।”

———

পত্র পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন; পরে মাথা তুলিয়া মাণিকলালকে বলিলেন,

“মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে?”

মাণিক। যাহারা জানিত মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিয়াছেন।

রাজা। উত্তম। তুমি গৃহে যাও। উদয়পুরে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

এই বলিয়া রাজসিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

আকবর শাহের খোষরোজ।

১

রাজপুরী মাঝে কি সুন্দর আজি
বসেছে বাজার, বসের ঠাট।
রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে
লেগেছে রমণী রূপের হাট॥

বিশালা সে পুরী নবমীর চাঁদ,
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে
খরিদ্দার ডাকে, হাসিয়া ছলে॥

ফুলের তোরণ, ফুল আবরণ
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান, ফুলের নিশান,
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা॥

লহরে লহরে ছুটিছে গোলাব,
উঠিছে ফুবারা জ্বলিছে জল।
তাধিনি তাধিনি নাচিতেছে নটী,
গায়িছে মধুর গায়িকা দল॥

রাজপুর মাঝে লেগেছে বাজার,
বড় গুলজার সরস ঠাট।
রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে
লেগেছে রমণীরূপের হাট॥

কত বা সুন্দরী, রাজার দুলালী,
ওমরাহ জায়া, আমীর জাদী।
নয়নেতে জ্বালা, অধরেতে হাসি,
অঙ্গেতে ভূষণ মধুর-নাদী॥

হীরা মতি চুনি বসন ভূষণ
 কেহ বা বেচিছে কেনে বা কেউ।
কেহ বেচে কথা নয়ন ঠারিয়ে
 কেহ কিনে হাসি রসের ঢেউ॥
কেহ বলে সখি এ রতন বেচি
 হেন মহাজন এখানে কই?
সুপুরুষ পেলে আপনা বেচিয়ে
 বিনামূলে কেনা হইযা রই॥
কেহ বলে সখি পুরুষ দরিদ্র
 কি দিয়ে কিনিবে রমণী-মণি।
চারি কড়া দিযে পুরুষ কিনিয়ে
 গৃহেতে বাঁধিযে রেখো লো ধনি॥
পিঞ্জরেতে পুরি, খেতে দিও ছোলা,
 সোহাগ শিকলি বাঁধিও পায।
অবোধ বিহঙ্গ পড়িবে আটক
 তালি দিয়ে ধনি, নাচায়ো তায॥

২

এক চন্দ্রাননী, মরাল-গামিনী,
 সে রসের হাটে ভ্রমিছে একা।
কিছু নাহি বেচে কিছু নাহি কিনে,
 কাহারেও, সহিত না করে দেখা॥
প্রভাত নক্ষত্র জিনিয়া রূপসী,
 দিশাহারা যেন বাজারে ফিরে।
কাণ্ডারী বিহনে তরণী যেন বা
 ভাসিয়া বেড়ায় সাগরনীরে॥
রাজার দুলালী রাজপুতবালা,
 চিতোরসম্ভবা কমলকলি।
পতির আদেশে আসিয়াছে হেথা,
 সুখের বাজার দেখিবে বলি॥
দেখে শুনে রামা সুখী না হইল—
 বলে ছি ছি এ কি লেগেছে ঠাট।
কুলনারীগণে, বিকাইতে লাজ
 বসিয়াছে ফেঁদে রসের হাট!
ফিরে যাই ঘরে কি করিব একা
 এ রঙ্গ সাগরে সাঁতার দিয়ে?
এত বলি সতী ধীরি ধীরি ধীরি
 নির্গমের দ্বারে গেল চলিয়ে॥
নির্গমের পথ অতি সে কুটিল,
 পেঁচে পেঁচে ফিরে, না পায দিশে।
হায কি করিনু বলিয়ে কাঁদিল,
 এখন বাহির হইব কিসে?
না জানি বাদশা কি কল করিল
 ধরিতে পিঞ্জরে, কুলের নারী।
না পাই ফিরিতে নারি বাহিরিতে
 নয়নকমলে বহিল বারি॥

৩

সহসা দেখিল, সমুখে সুন্দরী,
 বিশাল উরস পুরুষ বীর।
রতনের মালা দুলিতেছে গলে
 মাথায রতন জ্বলিছে স্থির॥
যোড় করি কর, তারে বিনোদিনী
 বলে মহাশয় কর গো ত্রাণ।
না পাই যে পথ পড়েছি বিপদে
 দেখাইয়ে পথ, রাখ হে প্রাণ॥
বলে সে পুরুষ অমিয় বচনে
 আহা মরি হেন না দেখি রূপ।
এসো এসো ধনি আমার সঙ্গেতে
 আমি আকব্বর—ভারত-ভূপ॥
সহস্র রমণী রাজার দুলালী
 মম আজ্ঞাকারী, চরণ সেবে।
তোমা সমা রূপে নহে কোন জন,
 তব আজ্ঞাকারী আমি হে এবে॥

চল চল ধনি আমার মন্দিরে
আজি মোর রোজ সুখের দিন।
এ ভারত ভূমে কি আছে কামনা
বলিও আমারে, শোধিব ঋণ॥
এত বলি তবে রাজরাজপতি
বলে মোহিনীরে ধরিল করে,
যূথপতি বল সে ভুজ বিটপে
টুটিল কঙ্কণ তাহার ভরে॥
শুকাল বামার বদন-নলিনী
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি বাচাও জননি।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে॥
ডাকে কালি কালি ভৈরবি করালি
কৌবিকি কপালি কর মা ত্রাণ।
অপর্ণে অম্বিকে চামুণ্ডে চণ্ডিকে
বিপদে বালিকে হারায় প্রাণ॥
মানুষের সাধ্য নহে গো জননি
এ ঘোর বিপদে রক্ষিতে লাজ।
সমর-রঙ্গিণি অসুর-ঘাতিনি
এ অসুরে নাশি, বাঁচাও আজ॥

৪

বহুল পুণ্যেতে অনন্ত শূন্যেতে
দেখিল রমণী, জ্বলিছে আলো।
হাসিছে রূপসী নবীনা ষোড়শী,
করীন্দ্র বাহনে, মূরতি কালো॥
নরমুণ্ডমালা দুলিছে উরসে
বিজলি ঝলসে লোচন তিনে।
দেখা দিয়ে মাতা দিতেছে অভয়,
দেবতা সহায় সহায়হীনে॥
আকাশের পটে নগেন্দ্র-নন্দিনী
দেখিয়া যুবতী প্রফুল্ল মুখ।
হৃদি সরোবর পুলকে উছলে
সাহসে ভরিল, নারীর বুক॥
তুলিয়া মস্তক গ্রীবা হেলাইল
দাঁড়াইল ধনী ভীষণ রাগে।
নয়নে অনল অধরেতে ঘৃণা
বলিতে লাগিল নৃপের আগে॥
ছিছি ছিছি ছিছি তুমি হে সম্রাট্,
এই কি তোমার রাজধরম।
কুলবধূ ছলে গৃহেতে আনিয়া
বলে ধর তারে নাহি শরম॥
বহু রাজ্য তুমি বলেতে লুটিলে
বহু বীর নাশি বলাও বীর।
বীরপণা আজি দেখাতে এসেছ
রমণীর চক্ষে বহায়ে নীর?
পররাহুবলে পর রাজ্য হর,
পরনারী হর করিয়ে চুরি।
আজি নারী হাতে হারাবে জীবন
ঘুচাইব যশ মারিয়ে ছুরি॥
জয়মল্ল বীরে * ছলেতে বধিলে
ছলেতে লুটিলে চারু চিতোর।
নারীপদাঘাতে আজি ঘুচাইব
তব বীরপণা, ধরম চোর!
এত বলি বামা হাত ছাড়াইল
বলেতে ধরিল রাজার অসি।
কাড়িয়া লইয়া, অসি ঘুরাইয়া,
মারিতে তুলিল, নবরূপসী॥
ধন্য ধন্য বলি রাজা বাখানিল
এমন কথন দেখিনে নারী।
মানিতেছি ঘাট ধন্য সতী তুমি,
রাখ তরবারি; মানিনু হারি॥

৫

হাসিয়া রূপসী নামাইল অসি,
বলে মহারাজ এ বড় রস।
রমণীর রণে হারি মান তুমি
পৃথিবীপতির বাড়িল যশ॥
দুলায়ে কুণ্ডল, অধরে অঞ্চল,
হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে।
বলে মহাবীর, এই বলে তুমি
রমণীরে বল করিতে এলে?
পৃথিবীতে যাবে, তুমি দাও প্রাণ,
সেই প্রাণে বাঁচে, বলে হে সবে।
আজি পৃথ্বীনাথ আমার চরণে
প্রাণ ভিক্ষা লও, বাঁচিবে তবে॥
যোড়ো হাত দুটো, দাঁতে কর কুটো
করহ শপথ ভারত প্রভু।
শপথ করহ হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু॥
তুমি না করিবে, রাজ্যেতে না দিবে
হইতে কখন এ হেন দোষ।
হিন্দুললনারে যে দিবে লাঞ্ছনা
তাহার উপরে করিবে রোষ॥
শপথ করিল, পরশিয়ে অসি,
নারীআজ্ঞামত ভারতপ্রভু।
আমার রাজ্যেতে হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু॥
বলে শুন ধনি হইয়াছি প্রীত
দেখিয়া তোমার সাহস বল।
যাহা ইচ্ছা তব মাগি লও সতি,
পুরাব বাসনা, ছাড়িয়া ছল॥
এই তরবারি দিনু হে তোমারে
হীরক খচিত ইহার কোষ।
বীর বালা তুমি তোমার সে যোগ্য
না রাখিও মনে আমার দোষ॥
আজি হতে তোমা ভগিনী বলিনু
ভাই তব আমি ভাবিও মনে।
যা থাকে বাসনা মাগি লও বর
যা চাহিবে তাই দিব এখনে॥
তুষ্ট হয়ে সতী বলে ভাই তুমি
সম্প্রীত হইনু তোমার ভাষে।
ভিক্ষা যদি দিবা, দেখাইয়া দাও
নির্গমের পথ, যাইব বাসে॥
দেখাইল পথ, আপনি রাজন্
বাহিরিল সতী, সে পুরী হতে।
সবে বল জয়, হিন্দুকন্যা জয়,
হিন্দুমতি থাক ধর্ম্মের পথে॥

৬

রাজপুরী মাঝে, কি সুন্দর আজি
বসেছে বাজার রসের ঠাট।
রমণীতে কেনে রমণীতে বেচে
লেগেছে রমণী রূপের হাট॥
ফুলের তোরণ ফুল আবরণ
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান ফুলের নিশান,
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা॥
নবমীর চাঁদ বরষে চন্দ্রিকা
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে
ঝলসে কটাক্ষ হাসিয়া ছলে॥
এ হতে সুন্দর, রমণী ধরম,
আর্য্যনারী ধর্ম্ম, সতীত্ব ব্রত।
জয় আর্য্য নামে, আজ(ও) আর্য্যধামে
আর্য্যধর্ম্ম রাখে রমণীতে যত॥

জয় আর্য্যকন্যা, এ ভুবনে ধন্যা, হায় কি কারণে, আর্য্য পুত্রগণে
ভারতের আলো, ঘোর আঁধারে। আর্য্যের ধরম রাখিতে নারে॥

বৈজিকতত্ত্ব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা জাতিবিবাহের ফল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছি। স্বগোত্রে বিবাহ করা আমাদের মধ্যে নিষেধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা পিতৃগোত্র সম্বন্ধে; মাতৃগোত্র সম্বন্ধে বিশেষ নিষেধ নাই। শাস্ত্রকারদিগের বিশ্বাস ছিল যে পিতাই জনক, সন্তান কেবল পিতা হইতে জন্মে, মাতা ক্ষেত্র মাত্র। এই জন্য পিতৃগোত্রে বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে জন্ম সম্বন্ধে মাতাই প্রধানা পিতৃবীজ কেবল উত্তেজক মাত্র; পিতৃবীজ অভাবেও গর্ভ হইতে পারে তবে গর্ভরক্ষা বড় হয় না। অনেকেই দেখিয়াছেন পিঞ্জরবদ্ধা পালিতা পক্ষিণী গর্ভবতী হইয়া অণ্ড প্রসব করিয়াছে, পক্ষীর সহিত সাক্ষাৎ নাই অথচ পক্ষিণী অণ্ড প্রসব করে। যাঁহারা গৃহে হংসী পালন করেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন নিকটে কোথাও হংস নাই অথচ হংসী অণ্ড* প্রসব করে। অতএব পক্ষী ব্যতীত পক্ষিণী গর্ভবতী হয়। কীট পতঙ্গের মধ্যে এরূপ গর্ভে শাবক পর্য্যন্তও জন্মে; তবে অধিক নহে, যাহাও জন্মে, তাহাও দীর্ঘজীবী হয় না।† পুরুষ সংস্রব ব্যতীত জন্মকে ইংরেজিতে Parthenogenisis বলে। জীব জন্তুর মধ্যে এরূপ জন্মের প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। মনুষ্যমধ্যে এরূপ জন্মের কোন বিশেষ প্রমাণ নাই, কেবল

---

* এই অণ্ডকে সচরাচর লোকে "বাওয়া ডিম" বলে।

† Mr. Jourdan found that, out of about 58,000 eggs laid by unimpregnated silk moths, many passed through their early embryonic stages, shewing that they were capable of self developement, but only twenty nine out of the whole number produced caterpillers—*Darwin's Variation of Animals. Vol II page 357.*

Weijenbergh raised two successive generations from unimpregnated females of a lepidopterous insect. These insects did not prduce at most one twentieth of their full complement of eggs, and many of the eggs were worthless. Moreover the cuterpillars raised from these unfertilised eggs possessed far less vitality than those from fertilised eggs. In the third parthenogenitic generation not a single egg yielded a caterpiller. *Nature, Decr, 91, 1871 quoted in ibid.*

প্রবাদ আছে। খ্রীষ্টানদিগের খ্রীষ্টের জন্ম, হিন্দুদিগের ভগীরথের জন্ম* তাহার উদাহরণের স্থল। মনুষ্যমধ্যে বাস্তবিক এরূপ জন্ম কখন ঘটে বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস থাকায় পূর্ব্বতন শরীরতত্ত্ববিদেরা এই সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; সে সকল পরিচয় এ স্থলে অনাবশ্যক।

যাহা বলা হইল তাহাতেই প্রতীতি জন্মিতে পারে যে জন্মবিষয়ে মাতাই মূল। তাহা যদি সত্য হয়, তবে বিবাহকার্য্যে পিতৃগোত্র অপেক্ষা মাতৃগোত্র বর্জ্জন করা আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রকারদিগের বিশ্বাস ছিল যে জন্ম সম্বন্ধে পিতাই প্রধান, তাহাই পিতৃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে পিতৃবংশ অপেক্ষা মাতৃবংশ আরও নিকট। বোধ হয় সেই মূলে "নরাণাং মাতুলক্রমঃ" কথা প্রচলিত হইয়াছিল। মাতৃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ না থাকায় আমাদের দেশে প্রকারান্তরে জ্ঞাতিবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। ফলাংশে বোধ হয়, আর কাহার পক্ষে না হউক, কুলীন দিগের মধ্যে কিছু মন্দ দাঁড়াইয়াছে। তাহার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম অবস্থায় কুলীনেরা পিতৃ জ্ঞাতিভিন্ন অপর বংশে সকলেই বিবাহ করিতে পারিতেন। তিনশত বৎসর হইল দেবীবর ঘটক বলিলেন তাহা অনুচিত, এরূপ বিবাহ "সর্ব্বদ্বারী।" কুলীনেরা ভয় পাইলেন। ভিক্ষুকেরা "সর্ব্বদ্বারী" নীচব্যক্তিরা "সর্ব্বদ্বারী" সর্ব্বদ্বারী শব্দের সহিত এমনই একটা ঘৃণাকর সম্বন্ধ তৎকালে বুঝাইত যে কোন ব্যক্তি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাৎকালিক কুলীনেরা মহাতেজা ছিলেন, সর্ব্বদ্বারী শব্দ তাঁহাদের অসহ্য হইল। দেবীবর তখন সুবিধা বুঝিয়া তাঁহাদের পালটি বাঁধিয়া দিলেন অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাঁহাদের হস্তপদ বাঁধিয়া দিলেন। পালটি বদ্ধ হইয়া আর তাঁহারা পূর্ব্বমত সকল বংশে আদান প্রদান করিতে পারিলেন না, একটি কি দুইটী বংশে তাঁহাদের আবদ্ধ থাকিতে হইল। রাম শ্যামের বংশে আর শ্যাম রামের বংশে বিবাহ দিবে, অন্যথা কুলধ্বংস হইবে। ফলাংশে ইহা জ্ঞাতিবিবাহ দাঁড়াইল। রামের বংশে যত সন্তান হইতে লাগিল তাহাতে কাজেই শ্যামের রক্ত রহিল আবার শ্যামের বংশে যত সন্তান হইল তাহাতে কাজেই রামের রক্ত রহিল। শ্যাম আর রাম, রাম আর শ্যাম এই ভিন্ন অন্য বংশে তাহাদের বিবাহ নাই। এক শত বংশের পরে এই পাল্টীবদ্ধ বংশে যাহারই পরিচয় লও তাহারই শরীরে অর্দ্ধেক রামের রক্ত অর্দ্ধেক শ্যামের রক্ত। বোধ হয় অনেকেই কুলীনদিগের এই

* আমাদের মধ্যে পূর্ব্বাপর বিশ্বাস আছে যে পিতা হইতে অস্থি, ও মাতা হইতে মাংস উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক।

নিয়মটি সবিশেষ না জানায় এই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন না। *অনেকেই মনে করিতে পারেন যে মুখোপাধ্যায় মাত্রেই একই রূপ নিয়মে বদ্ধ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অনেক শ্রেণীর মুখোপাধ্যায় আছেন। সেইরূপ অনেক শ্রেণীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় আছেন। তাঁহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর নিমিত্ত দেবীবর পৃথক্ পৃথক্ নিয়মবদ্ধ করিলেন। মুখোপাধ্যায় মাত্রেই যে,যে কোন বন্দ্যোপাধ্যায় বা চট্টোপাধ্যায় বংশে কন্যাদান করিবেন সে ক্ষমতা রহিল না। উদাহরণ উপলক্ষে কানাই ছোট ঠাকুরের কথা বলা যাইতেছে। তিনি মুখোপাধ্যায়। তাঁহার সহিত চট্টোপাধ্যায়ের পাল্টি বদ্ধ হইল। চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠি চৈতল, ধন, অবসথি প্রভৃতি অনেক আছে, তন্মধ্যে অবসথি বংশের এক প্রশাখা গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার আদান প্রদান স্থির হইল। সেই অবধি কানাই ছোট ঠাকুরের সন্তানেরা পুরুষানুক্রমে গঙ্গানন্দ বংশে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। আবার গঙ্গানন্দের সন্তানেরা ঐরূপ পুরুষানুক্রমে কানাইয়ের বংশে বিবাহ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় কিছু কাল পরে উভয় বংশের রক্ত সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হইয়া গেল তখন ইহাদের মধ্যে যে স্ত্রী বা যে পুরুষ দেখাইবেন তাহারই শরীরে অর্দ্ধেক কানাই ছোট ঠাকুরের রক্ত অর্দ্ধেক গঙ্গানন্দের রক্ত। তদ্ভিন্ন আর কাহার রক্ত নাই। এই অবস্থায় যাহাকে মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বলিয়া চট্টোপাধ্যায়ের বংশে বিবাহ দিতে হইল তাহার রক্ত যত ভাগ মুখোপাধ্যায় হইতে উৎপন্ন তত ভাগ আবার চট্টোপাধ্যায় হইতে উৎপন্ন, কাজেই তাহার সহিত চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ দিলে জ্ঞাতি বিবাহের আর কোন অংশে বাকি রহিল না। বোধ হয় মধ্যে মধ্যে শ্রোত্রীয় বংশে বিবাহ করায় অনেকের বংশ রক্ষা পাইয়াছে। কুলীনেরা আপন পাল্টী-বংশে ভিন্ন অন্যকে কন্যা দান করিতে পারিবেন না কিন্তু শুদ্ধ শ্রোত্রীয়ের বংশে বিবাহ করিলে করিতে পারিবেন এমত অনুমতি ছিল। তদনুসারে কখন কখন বিবাহ হইত। বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে যে স্থলে কুলবীজক রীতি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আইসে সেখানে কখন কখন নূতন রক্ত সংযোগ করাইতে পারিলে বংশ রক্ষা হয়।* বোধ হয় আমাদের

* It is a great of law of nature that all organic being profit from an occasional cross with individuals not closely related to them in blood—*Darwin*

The Revd W. D. Fox has communicated to me the case of a small lot of bloodhounds long kept in the same family, which had become very bad breeders and nearly all had a bony enlargement in the tail. A single cross with a distinct stamp of bloodhounds

কুলীনদিগের মধ্যে শ্রোত্রীয় রক্ত কখন কখন মিশ্রিত হওয়ায় তাঁহাদের বংশ একেবারে লোপ পায় নাই।

কৌলীন্য প্রথাকে আমরা নিন্দা করি না বরং শত শত প্রশংসাই করি। দেবীবর ঘটক যে পাল্টী প্রভৃতি মেল ইত্যাদির নিয়ম করিয়া গিয়াছেন তাহারই প্রশংসা করিতে পারি না। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠদল যে এত অপকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেবল দেবীবরের দোষে। তাঁহার সমুদয় নিয়ম বৈজিকতত্ত্বের বিরোধী। বল্লালের সমুদয় নিয়ম বৈজিকতত্ত্বের অনুযায়ী। বিজ্ঞান শাস্ত্র তখন বাঙ্গালায় ছিল না, না থাকুক, বল্লাল তাহা বুঝিয়াছিলেন, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির একেবারে মূল ধরিয়া তিনি আইন করিয়াছিলেন। গুণবানের সন্তান গুণবান্ হয়। অতএব গুণবানের বংশে গুণবাণের বিবাহ দিয়া রাজ্যে গুণবানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এই তিনি স্থির করেন। পরে বাঙ্গালার মধ্যে ১৯ জন† অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া, তাঁহাদিগকে কুলীন করিলেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের বিবাহ কি রূপ কাহার সহিত হইবে তাহার নিয়মবদ্ধ করিয়া দিলেন। এই শেষ ভাগটী নূতন। সকল রাজ্যেই রাজারা ইচ্ছানুরূপ কৌলীন্য বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা গুণগ্রাহী, গুণের পুরস্কার করেন, অর্থ দেন, সম্পদ দেন, কৌলীন্য দেন তাঁহাদের রাজ্যে আর গুণবানের অভাব থাকে না, কিন্তু তাহাতে একটি দোষ ঘটে, তথায় পুরস্কারের লোভে গুণের বর্দ্ধন হয় কাজেই পুরস্কারের শিথিলতা হইলে গুণোন্নতির হ্রাস হয়। বল্লাল যে নূতন নিয়মবদ্ধ করিলেন তাহাতে সে দোষ রহিল না। গুণবানের বংশে গুণবানের বিবাহ হইলে সন্তান অবশ্য গুণবান্ হইবে, ইহা

---

restored their fertility and drove away the tendency to malformation in the tail--*Darwin*. Mr. Clerk, whose fighting cocks were so notorious, continued to breed from his own kind till they lost all their disposition to fight, but stood to be cut up without making any resistance, and were so reduced in size as to be under those weights required for the best prize; but on obtaining a cross from Mr Leighton they again resumed their former courage and weight—*Wright*

† বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জাহ্লন, মকরন্দ, ঈশান, মহেশ্বর, দেবল, ও বামন এই ছয় জন।

চট্টোপাধ্যায় বংশে হলায়ুধ, বহুরূপ, অরবিন্দ, গুচ, ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জন।

মুখোপাধ্যায় বংশে উৎসাহ ও গরুড় এই দুই জন।

কাঞ্জিলাল বংশে কুতূহল ও কানু এই দুই জন।

ঘোষালবংশে শিব।

গাঙ্গুলি বংশে শিশু।

পুতিতুণ্ডু বংশে গোবর্দ্ধন আচার্য্য।

কুন্দগ্রাম বংশে রোষাকর।

দৈবিক নিয়ম, প্রায় অকাটা, পুরস্কার থাকুক বা না থাকুক, রাজ্যে গুণবানের অভাব থাকিবে না।

কিন্তু যে নবটি* গুণ বল্লাল আপন রাজ্যে বিস্তার করিবার নিয়মস্থাপন করিলেন তাহাতে রাজ্যের বড় উন্নতি বা খ্যাতির সম্ভাবনা ছিল না। গুণগুলি প্রার্থনীয় বটে, থাকিলে সংসার উজ্জ্বল হয় কিন্তু রাজ্য সম্বন্ধে তাহার কোনটিই কিছুই নহে। সেই জন্য রাজ্যের কোন উপকারই হয় নাই। কিন্তু সংসার সম্বন্ধে ফল অতি চমৎকার হইয়াছিল। বাঙ্গালার ন্যায় পবিত্র সংসার, সুখের সংসার, বোধ হয় আর কোন রাজ্যেই ছিল না। বহুদিন অবধি তাহা নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে তথাপি যাহা অদ্যাপি আছে তাহা বোধ হয় আর অন্যত্র বড় অধিক নাই।

অন্য দেশের রাজারা কুলীনদিগের বিবাহে হস্তক্ষেপ করেন নাই করিলে হয় ত রাজ্যের উপকার হইত। এক্ষণে প্রায় লোকে নিজ নিজ প্রণয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত অথবা মর্য্যাদা রক্ষার্থ বিবাহ করেন। যে সকল বিবাহে নিজ সুখ সমৃদ্ধি ভিন্ন দেশের কোন উন্নতি হয় না সে সকল বিবাহ লোকবিশেষের নিকট স্বার্থপর বলিয়া ঘৃণিত। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে বিবাহ প্রণয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত হইত, তাহার অন্যথা করিলে অনিষ্ট আছে, কিন্তু যে বিবাহ কেবল মর্য্যাদা রক্ষা নিমিত্ত সে বিবাহ অনেক সময় না হইলেই ভাল। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে ধনবান্ বা উচ্চপদস্থ তাঁহাদের সন্তানেরা প্রায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায় তাঁহারা আপন আপন বিষয় কার্য্যে অক্ষম, তাঁহাদিগের অপ্রাপ্ত বয়সে কোর্ট অব ওয়ার্ডস, প্রাপ্ত বয়সে দেওয়ান, বিষয় রক্ষা করে। এরূপ ব্যক্তি যদি তদবস্থাপ্রস্ত বংশে বিবাহ করেন তাহা হইলে তাঁহার সন্তান আরও অপটু হইবার সম্ভাবনা।

* আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, দান, এই কুললক্ষণ।

IMPERIAL LIBRARY

গঙ্গাধর শর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুরুতর মোকর্দ্দমা।

দারগা সাহেব থানা অভিমুখী। তাঁহার ঘোটক-পৃষ্ঠে বাঙ্গা রঙ্গের পাবজামা চড়িয়াছে, গলায় ঘুঙ্গুরের মালা ঝুলিতেছে, তার উপর নীল সূতে জরি জড়ান দুটি চাক্‌চিক্যমান পৈঁচ, কর্ণদ্বয়ের কিঞ্চিৎ নিম্নে গলদেশে শোভমান। অশ্বের অগ্রপদদ্বয়ের কিঞ্চিৎ উপরে আদুরে ছেলের সজ্জিত বক্ষদেশের মত রৌপ্য-নির্ম্মিত দ্বাদশটি তক্তি-মালা সুশোভিত নোক্তা ও খলিন রজ্জু আবার আর এক প্রকার সিন্দুরে রঙ্গের সুলতানী বনাতে জড়িত। উভয় কর্ণের পাশে নোক্তার কোণে দুটী রূপার চাঁদ ও নোক্তার উপরিভাগে মধ্যদেশ হইতে অশ্বের অক্ষিদ্বয়ের কিঞ্চিৎ নিম্নতলে একটী উজ্জ্বল জরির তবক ও জরির ফুল ঝুলিতেছে। গোল, স্থূল, তাজি ঘোড়া যথার্থই গাজি মরদ সাজিয়াছে। বাগডোর সহিস ধরিয়া রহিয়াছে—কিন্তু অশ্বটী অস্থির, ঘুরিতেছে নাচিতেছে, হ্রেষা রবে হাঁসা ঘোড়া সকলকে আপ্যায়িত রাখিয়াছে, আজ পাড়ার ছেলের নিদ্রা নাই, একটী যেমন তেমন তামাসা মজুদ থাকিলে কি ছেলেরা সুস্থির থাকে? আমি আপনার অনুচরগণকে ঘর হইতে, ঘাট হইতে, পাঠশালার কানাচ হইতে ইসারা করিয়া "দারগার ঘোঁড়া দেখ্‌বি" বলিয়া একত্রিত করিয়াছি। ঘোঁড়াটি হেঁ হেঁ করিলে এক একটী ছেলে হেঁ হেঁ করিতেছে। দারগার ভয় প্রবল, তবু কেহ কেহ সুমৃদুস্বরে "ঘোঁড়া মুখে নড়া" কেহ "ঘোঁড়া বাগ্‌না পাড়া—নাকে দড়ি" কহিয়া কপচাইতেছে। আবার কেহ বচন সংশোধন করিয়া দিতেছে—

"ও ঘোঁড়া তোর নাকে দড়া
নিয়ে যাব বাগনাপাড়া।"

এমন সময় দারগা সাহেব গোলাবাটীর বৈঠক হইতে চাবুক হস্তে বহির্গত হইলেন, তাঁহার বৃহৎ শ্মশ্রু দর্শনে অনেক ছেলে বৃক্ষের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, দুই একটী শিশু কান্দিয়া হাত তুলিয়া ভয়ে অপরিচিত জনের কোলে চড়িলেন, কিন্তু গোলাম সরদার সাহেব আমার পুরাতন বন্ধু, আমাকে দেখিয়া মনে করিলেন জটার কাছে ফাঁকি নাই।

ভাবিলেন, "যত গুলি টাকা গুণে লই-য়াছি, ওটা সব দেখিয়াছে—সব মনে মনে গণিয়াছে। সহাস্য বদনে আমায় কহিলেন "ক্যা লেডকা বহুত রোজ সে মুলাকাত নাহি।" আমি বিনাবাক্যে একটি সেলাম করিলাম। দারগা সাহেব নিকটে আসিয়া চাপকানের নীচে সামনের জেবে হাত দিলেন, ঝনাত করিয়া উঠিল, তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন, আবার বড় সাবধানে একটি টাকা বাহির করিয়া গ্রামের ছেলেদিগকে মেঠাই খাইতে দিলেন, গ্রামস্থ সকলে সন্তুষ্ট হইল—এটি ঘুসের উপর ঘুস চড়িল।

দারগা সাহেব অশ্বারোহণে উদ্যত। এমন সময় রঘুবীরের একটী নূতন নালিশ উপস্থিত হইল, সে হঠাৎ কহিয়া উঠিল, "দারগা সাহেব হুজুর! আমার বিচার হল না ধর্ম্মাবতার।"

দা। ঘোঁড়া চড়িতে পেছু ডাকিলি।

হিতে বিপরীত, দারগা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন হারামজাদা—পাঁচ রূপেয়া জরিমানা। রঘু কহিল "জরিমানা করুন, মেরে ফেলুন, কেটে ফেলুন, আজ রঘু হুজুরের অনুগত, পদানত—হে প্রভু! পিঠে চিহ্ন দেখুন—জায়গা নাই—গন্ধর্ব্ব উড়ে গেছে।"

রঘুবীর পৃষ্ঠদেশের বস্ত্র উত্তোলন করিয়া, লাঠি ও বেতের দাগের উপর দাগ দেখাইল। "এত দাগ কিসে হল?" এই কথাগুলি দারগা কহিতে না কহিতে রঘুবীর নয়নজলে ভাসিয়া গেল। কাঁদ কাঁদ অর্দ্ধোচ্চারিত কথায় কহিল "মেরে গেছি কর্ত্তা!" আবার কহিতে কহিতে ভূমে পতিত হইল।

গজানন এই সময়ে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত, "ওরে রে রঘুরে! ছ্যা! —কান্দিস্ না—সকল কথা বল, এবার সিংহের পোয়েদের—শ্রাদ্ধ হবে—হবেই হবে—করবই করব।" অমনি বাম হস্তের মুষ্টিতে দক্ষিণ হস্তে দুই তিনটী চপেটাঘাত করিলেন। গজাননের কথায় দারগা সাহেব উঠেন, বসেন, তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন; রঘুবীরের অভিযোগ আরম্ভ হইল, আবার কাছারী গরম হইল। রঘুবীর আরম্ভ করিল "হজুর চড় চাপড়, কিল, গড়ারি, ঘাড়-ধাক্কা, মারপিট, গুতাগুতি, লাঠালাঠির কিছু বাঁকি নাই।" বলিয়াই আবার রোদন আরম্ভ করিল।

গজানন কহিলেন, "রঘু এতদ্রূপ বল-বান্ না হইলে বোধ হয় মারা পড়িত। ও ফেরার ছিল, মনে মনে আপনাকে দোষী না জানিলে একাই দশ গ্রামের লোক ভাগাত।" আবার রঘুর দিকে দেখিয়া কহিলেন, "রহ—রহ তোর হয়ে আমি বলিতেছি—বল্‌ছি, তুই থাম—থামরে থাম।"

"যখন আত্মহত্যার মোকর্দ্দমা—"

রঘু। আমার আত্মহত্যা হওয়া ছিল ভাল—বাপ! এত অপমান!

গজা। থামরে রঘু থাম—কথা কৈতে দিবি, না গোলযোগ করবি? দারগা

সাহেব। যখন আত্মহত্যার উপযোগিতা জন্য, আপনি রঘুবীরকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দেন, সে ফেরার হইয়া গ্রামে গ্রামে ফিরিতে ছিল। মাঠে মাঠে—রৌদ্রে রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া শান্তিপুরের সিংহ বাবুদের বাটীর পশ্চাদ্ভাগে পুষ্করিণীর বান্ধাঘাটে শ্রান্তি দূর করিতে গিয়াছিল—ওর গ্রহ!

রঘু অংসভাগ কুঞ্চিত করিয়া কহিল "না গেলেই ভাল হত—বাপ।"

গজানন কহিলেন, "থাম—থাম রে থাম—তার পর আপন বস্ত্রে পাথের খাদ্য বান্ধিয়া রঘু ঘাটে হাত পা ধুইতে অগ্রসর হইল, তখন ঘাটে সেই সিংহ বাবুদের একটিমাত্র কিশোরী কন্যা স্নান করিতেছিলেন—"

রঘু। সেই কাল, সেই কন্যাই কাল—

গ। এদিকে রঘু রৌদ্রতাপে তপ্ত হইয়া জলে নামিতেছে, যত নামে তত অঙ্গ শীতল বোধ হয়, আরো জলে নামে—ও দিকে কন্যা ভীতা হইয়া জলের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে গভীর জলে পতিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিল। নিকটে ক্ষেত্রে কতকগুলি কৃষী ঐ ক্রন্দন শুনিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল, মনে করিল কন্যা ঘোর বিপদে পতিত—মনে করিল রঘুবীর জলতৃষ্ণাচ্ছলে দস্যু কার্য্যে প্রবৃত্ত, কারণ কন্যা সালঙ্কারা ছিলেন।

রঘু। দস্যু! তাই! আমার চৌদ্দ পুরুষ কখন কাহার পাতকেটে ভাত খায় না, তাতে মা জননীর অঙ্গ!

গজা। থাম্—পরে সিংহবাবু স্বয়ং লাঠীয়ালসহ ঘাটে উপস্থিত হইয়া রঘুকে বন্দী করিলেন—তার পর যা হইল উহার সর্ব্বাঙ্গে বর্ত্তমান। ওর ঘোর বিপদ মহাশয়!

রঘু। বিপদের উপর বিপদ বলুন—বাপ! সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা!

দারগা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কেবল মাত্র কহিলেন "ও খফিফ মারপিট—"

রঘু। এ ছোল—দাগ নহে—ছোল মার কি আমরা মারপিট বলি—ইহাতে রক্তপাত হয়েছিল, জিব বেরিয়ে পড়েছিল, অজ্ঞান হয়েছিলাম।

দা। হাঁ, বেহুঁস হইলে আলবৎ মোকর্দ্দমা সঙ্গীন হইত, অপরাধীকে এই ক্ষণেই ধৃত করিতাম।

গজানন কহিলেন "তবে নিগূঢ় কথা সব বলি, ওরে যাও সকলে বাহিরে যাও"—হুকুম হইবামাত্র সকলে গোলা বাটীর বহির্দ্দেশে আসিল, কেবল আমি নিকটস্থ একটী পাল্কীর ভিতর বসিয়া বিনা সন্দেহে সকল কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতে থাকিলাম—"

গজানন হস্ত উত্তোলন করিয়া পঞ্চ-অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষীণস্বরে দারগা সাহেবকে কহিলেন "বড়—কম নহে—টাকা!—এক চাপড় টাকা! সিংহ বাবুদের চরিত্র আপনি কি জ্ঞাত নহেন? দাঙ্গা করিয়া, লাঠী চালাইয়া, সড়কি

মারিয়া সেই বাদশাহী জায়গীর গ্রাম সমস্ত বাজেয়াপ্তির সময় আমাদের কি না কষ্ট দিয়েছে? ভুলে গেলেন—হে মহাশয় অল্পদিনে সব ভুলিলেন। একটা পাক লাগান—ছুট মোচড় দিন—অমনি অমনি যাবে, ওরা যে এ সরকারের চিরশত্রু—চালান না করিলে আমরা মহাশয়কে ছাড়িব না। কৈ? আপনি কেমন আমাদের কথা হেলা করে যাবেন যান্ ত?"

রঘু এই সকল কথা শুনিয়া কহিয়া উঠিল, "যেমন সওাল করিতে হয় তা দেওয়ানজী করলেন।" ও নিম্নস্বরে গান করিয়া কহিল

"রাঙ্গা বরণ, দুখানি চরণ,
হৃদে লব জোর করিয়া!"

গজানন অমনি কহিয়া উঠিলেন "রঘু মারের আঘাতে প্রায় পাগল হইয়াছে। বলি বেহুঁস? তা সব হবে—ও বেহুঁসই ত ছিল কেবল অপার্য্যমাণে কি করে কথা না কহিলে চলে না, এ জন্যই রঘু—আমি অনেক বলায়—বসিয়াছে নচেৎ ও ত শুইয়াই ছিল—ঐ দেখুন" (উচ্চস্বরে) "আবার শুইল—"

বলিতে বলিতে রঘু ভূমিশয্যাগত, অচেতন চোকের গোলা উল্টাইয়া পড়িল। গজানন দারগা উভয়ে তাহার নিকট আগত—স্নিগ্ধ জল আসিল, হিমসাগর তৈল আসিল, রঘুবীর অজ্ঞান, দাঁতে খিল লাগিয়াছে—বেতাব হইয়াছে। আবার মুহূর্ত্তে লোক জমা হইল, অনেক কষ্টে রঘু ঈষৎ চাহিল, চক্ষু মিলিল, কিন্তু বাক্য? রোধ হইয়াছে—সর্ব্বাঙ্গে গুরুতর ব্যথায় কাতর—আর মোকর্দ্দমাও গুরুতর হইবার বাকি নাই, সিংহদের ভিটায় ঘুঘু চরাইবার বাকি নাই! দারগা সাহেব খাটিয়া আনিতে হুকুম দিলেন, রঘুবীর সত্য সত্য খাটিয়াশায়ী হইল, সকলে কহিল এবার লাস চালান যাইবে, একে লোকের ভিড়ে পাকি অন্ধকার, তাহাতে লাসের নাম, তাহাতে হঠাৎ দেখিলাম একটী কাল কুকুরের আঁখিদ্বয় শিবিকার ছাউনিতলে জ্বলিতেছে, শশব্যস্তে শিবিকার দ্বার খুলিয়া বাহির হইলাম। দারগা সাহেব কহিলেন, "এ কোথায় ছিল।" মনে করিলেন জটাধারী আবার সব কথা শুনিয়াছে।

মুহূর্ত্তে বাহকগণ উপস্থিত হইল, রঘুবীর খাটসহ তাহাদের স্কন্ধে বাহিত হইল—কেহ কেহ "হরিবোল" দিয়া উঠিল, রঘুবীর একবার বেতাব অবস্থা ভুলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল "সমুন্দির পো! আমি কি যথার্থই মরিয়াছি?" গজানন কহিলেন "বেদনা মস্তকে চড়িয়াছে প্রলাপ দেখিতেছে।" এ দেওয়ানজীর কৃত প্রলাপ!

দারগা সাহেব মনে করিলেন তাঁহার এক কর্ম্মে দুই কর্ম্ম সিদ্ধ হইল। লোকে জানিল রঘুবীর মারপিটের মোকর্দ্দমায় বাদী হইয়া চলিতেছে; দারগা তাহার সহিত একটী আত্মহত্যার সাহায্যের অপরাধী বলিয়া চালান গোপনে লিখিয়া-

দিলেন, আপনার শাফায় ও নিজ বৈবাহিক নাজির সাহেবের পূজার পন্থা করিয়া দিলেন। গজাননের একবুদ্ধি ত দাবগার শত বুদ্ধি; কিন্তু দাবগার মনের কথা তাঁহার মনই জানিল। এদিকে আবার সিংহ বাবুদের কন্যাটিকে হাজির করিবার জন্য একটী হুকুম নামা লিখা হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তোমরা কেউ সাহেব দেখেছ ?

এক দিন দুই প্রহর দুইটার সময়, লাউসেন দত্ত গুরুমহাশয় আহারান্তে পাঠশালার দেওয়ালে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছেন, ঊর্দ্ধকনিবারিণী মলমলের এক পাট্টা মিহি পাগড়ি কপালের উপর একটি গিব দিয়া বান্ধিয়াছেন, গিবার ফুঁপি ও মাথার ঋজু পলিত কেশ একত্র হইয়া টাকশালার শোভা ধারণ করিয়াছে, মাথাটী বক্র হইয়া বক্ষঃস্থলের দিকে—বাঁশ ঝাড়ের পুচ্ছময় অগ্রভাগের ন্যায় নত হইয়া আসিতেছে; দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিতে বেত গাছটি তবু ধরা রহিয়াছে। তখন আহারান্তে সকল বালক লিখিতে উপস্থিত হয় নাই, গঙ্গাধর সমুপযুক্ত কয়েকটি সঙ্গী লইয়া মুখে "মহামহিম" উচ্চারণ করিয়া খতের মুসবিদা হাঁকিতেছেন; হাতে পাঠশালের দেওয়ালে একটী হরিণের আকৃতি আঁকিতেছেন। নিদ্রার প্রারম্ভে গুরুমহাশয়ও মধ্যে মধ্যে আমাদের স্বরে সুস্বর মিশাইয়া "হা হয়ে দাঁড়িহসিকার" কহিতে কহিতে নাক ডাকাইয়া ফেলিলেন। এমন সময় বেণেদের গোপাল আসিয়া আমার কাণে কাণে কহিল "ওরে সাহেব দেখেছিস্ ?" সাহেব দেখিতে ব্যগ্র হইলাম কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানিতাম দত্তজ মহাশয় কখন কখন কপটনিদ্রা যান ও আমরা কি করি ঈষৎ চাহিয়া দেখেন। সময়ে সময়ে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় আলস্যপ্রিয় বালকের পিঠে বেত্রাঘাতও বর্ষণ করেন, অতএব গুরুমহাশয় প্রকৃতরূপে নিদ্রিত কি না তাহা পাঠশালার বাহির হইবার পূর্ব্বে নিশ্চয় জানা আবশ্যক। ভঙ্গী করিয়া মহাশয়ের নিকট যাইয়া বসিলাম, নিম্ন স্বরে "মশয় মশয়" বলিয়া ডাকিলাম ও অবশেষে বেতের অগ্রভাগ ধরিয়া ধীরে একবার টানিলাম, মহাশয় তাহাতেও চমকাইলেন না, জানিলাম তিনি যথার্থই নিদ্রিত। সঙ্গিগণকে ইঙ্গিত করিয়া এক লম্ফে পাঠশালার বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইলাম; পরক্ষণেই দেখিলাম দত্তজ মহাশয় কহিতেছেন "কে ছেলেটা আমার বেত ধরিয়া টানিল রে ? নষ্ট জটা—আমার সঙ্গেও ব্যঙ্গ?" এই কথা কহিতে কহিতে বেত হস্তে আমাদের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন, অগ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় এই সময়ে পাঠশালায় প্রত্যাগমন করা অবিধেয় মনে করিয়া অগ্রভাগে আরও দ্বিগুণ ধাবমান হইলাম, কিয়দ্দূর আসিয়া মহাশয়ও

শুনিলেন "সাহেব আসিযাছে।" তখন আমরা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসি নাই এই অভিমানেই পূর্ব্ব ক্রোধ ভুলিয়া তিনিও সাহেব দেখিতে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া লম্বা পদদ্বয় চালাইয়া দিলেন। সাহেব দেখিতে গ্রাম সমস্ত এত ব্যস্ত কেন? ইহার কারণ আছে, তখন পল্লী গ্রামে সাহেবের প্রায় আগমন ছিল না। এখন যেমন রায় সাহেব, পাল সাহেব, কর সাহেব দে সাহেব, দত্ত সাহেব, চটরজি, বানরজি, পালিত সাহেবদের কৃষ্ণাঙ্গে কালকোর্ট পেন্টলুনের বাহার দেখা যায় সে সময়ে এ শোভা কোথাও দেখা যাইত না, কেবল শ্যামাঙ্গ সাহেবের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহিত বিলাতগামী এক রাম হরি মালী সাহেবকে সাহেবী পরিচ্ছদে ভ্রমণ করিতে দেখা যাইত ও কোন মহারাজার বিখ্যাত উদ্যানে অধীনস্থ মালী সকলকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "টুমি নিটান্ট ঠক্ আডমি" বলিয়া ভৎর্সনা করিতে শুনিতাম। এখন রামহরি সাহেবের নাম ডুবিয়া গিয়াছে, পুঞ্জ পুঞ্জ রামহরি সাহেব দেখা দিয়াছেন। সাহেব দেখিতে কৌতুকেরও হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু যে সময় হইতে আমার এই বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইতেছে তখন প্রশস্ত দেশবিভাগের মধ্যে দুই তিনটি শ্বেত কলেবর সাহেব দেখা যাইত। আমরা শুনিলাম ইহাদেরই মধ্যে একটী সাহেবের আশুতোষ বাবুর বৈঠকখানায় আবির্ভাব হইয়াছে। বৈঠকখানার বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বড় ভিড়, দুই পার্শ্বে দেওয়ালে দুটি বৃহৎ আরসি আলম্বিত থাকায় এক জন লোকের দশ দশ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, একা গুরুমহাশয় দশ অবতার দেখিয়া ভীত হইলাম, যাঁহার এক সংহার মূর্ত্তিতেই রক্ষা নাই তাঁর দশমূর্ত্তি! কিন্তু এই মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হয় দত্তজা মহাশয়ের বিশেষ স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি হইল, আপনার বালকের দলবৃদ্ধিতে রাজত্ববৃদ্ধি দেখিলেন ও ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি শীতল করিয়া এখন আমায় সম্মুখে রাখিয়া দাঁড়াইলেন; তখন আমাদের সাহেবদর্শন হইল, তাঁহার আয়ত লোচনে নীলপদ্মের আভা প্রশস্ত ললাট ও প্রকাণ্ড মস্তক দেখিয়া বোধ হইল ইনি রাজপুরুষ মধ্যে যথার্থই অগ্রগণ্য। ইতিমধ্যে সাহেব একবার চুরুটের পাইপে টান দিলেন, অগ্নির আভায় তাহার আঁখি, মুখ, রাঙ্গা শ্মশ্রুদল ও প্রকাণ্ড বক্ষবস্ত্র প্রভাশালী হইল, বোধ হইল যেন একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ঝাঁপ দিতে উদ্যত। তাঁহার পার্শ্বে আর একটি আসনে আশুতোষ বাবু মহাশয় উপবিষ্ট, এক জন শ্বেতকলেবর এক জন গৌরাঙ্গ, কিন্তু গঠন প্রত্যঙ্গ দেখিলে বোধ হয় উভয়ে এক শ্রেণীস্থলোক —উভয়েই প্রশস্ত অঙ্গশালী গম্ভীরমূর্ত্তি ভক্তির আস্পদ। উভয়ে নানা বিষয়ের কথা হইল; পত্তনী লইবেন, নীলকুটি খুলিবেন, রেসমের ও লায়ের কারবার আরম্ভ হইবে আশুতোষ বাবুর নিকট

কেবল বিংশতি সহস্র মুদ্রা ঋণের প্রার্থনা রাখেন, তাহা দিতেও আশুতোষ বাবু সম্মত হইলেন, বিষয় কার্য্য প্রায় শেষ হইল। আমি জানিলাম ইনিই বাবু মহাশয়ের পরম বন্ধু ডাক্তর ইটুয়াল সাহেব, কথা কহিতে কহিতে যখনই সাহেবের চক্ষু আমাদের দিকে পড়িতেছে অমনি গুরুমহাশয় দুই এক পদ পশ্চাতে গমন করিয়া আমার পৃষ্ঠভাগে চিমটি কাটিয়া কহিতেছেন "চুপ কর, পালিয়ে আয়।" কিন্তু আমি সাহেবের একটি অভ্যাস দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলাম, রুমাল লইয়া তিনি দন্ত পাটি হইতে এক একটি ক্ষুদ্র দ্রব্য বাহির করিতেছেন পুনরায় বদনে নিক্ষেপ করিতেছেন। গুরুমহাশয় আমার কানে কানে কহিলেন "এ কি? মাংস খণ্ড?" আমি কহিলাম "চুপ করুন, সাহেবের ছোট হাজিরি হইতেছে।" দন্তজ্ঞ কহিলেন "ম্লেচ্ছ। যাঁহারা সাহেব সাজেন তাঁহারাও এইরূপ ছোট হাজিরি করেন।" পরক্ষণেই গুরুমহাশয় ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্রমে কার্য্য শেষ করিয়া ২০ হাজার টাকার একটী হুণ্ডি পকেটে ভরিয়া অগণিত ধন্যবাদ দিতে দিতে সাহেব বাহাদুর দাঁড়াইলেন ও হস্ত প্রসারিয়া বাবু মহাশয়ের করাবলম্বন করিয়া কহিলেন নগরে গমন হইলে আবার সাক্ষাৎ হইবেক। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহণ করিলেন, চারি দিকে সেলামের ধুম পড়িয়া গেল।

আবার আমার দিকে আশুতোষ বাবু চাহিয়া কহিলেন 'কি হে জটাধারী, সাহেবের ইংরেজি কথা বুঝিতে পারিলে?" আমি কহিলাম "মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া, বুঝাইলে পারি।" দয়ার শরীর আর্দ্র হইল, বাবু মহাশয় হাসিয়া কহিলেন বল "রিং দি বেল" "বাজাও ঘণ্টা।" আবার কহিলেন "সট দি বক্স "আমি কহিলাম "সট দি বক্সো—" হল না বক্সো নয়—বক্স দুটি পাঠই আমার সত্বর অভ্যাস হইল, তখন বৃদ্ধ ভৈরব ভৃত্যকে ডাকিয়া একটি বৃহৎ আলমারী খুলিতে অনুমতি দিলেন। ভৈরব আলমারির নিকট গেল, কহিল " আলমারি খুলিল না, কপাট ঝাড়ের ঝালরে ঠেকিতেছে।" আমাদের সকল বন্দবস্তই এইরূপ সন্তোষজনক। কোন মতে কপাট কতক দূর খুলিয়া একটি দপ্তর বাহির করিলেক, তাহাতে বাঙ্গালা, ফারসী ও ইংরেজি কতকগুলি পুরাতন পুস্তক দেখিলাম, এক একটী ফারসী পুস্তক এক এক হাত পরিমাণ, মনে করিলাম এসব কবে পড়িব। বাবু মহাশয় একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া আমায় দিলেন ও কহিলেন "এটি ম'চর্চস্ ইস্পেলিং। ভায়া। যে সময় আসিতেছে ইংরেজি বিদ্যা উপার্জ্জন না করিলে আর বড় লোক হইবার উপায় থাকিবে না।" আশুতোষ বাবু বিদ্যার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার এই কথাগুলি এখন ভবিষ্যৎ বচন স্বরূপ জ্ঞান হয়; মনে হয়,

এক জন প্রকৃত হিতৈষী দূরদর্শী পুরুষ উপযুক্ত সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যয়ে যত্নে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন হয় ও ইংরেজি শিক্ষার আমার হাতে খড়ি পড়ে।

কালিদাস ও সেক্ষপীয়র।

পাঠকেরা তুলনায় সমালোচনা বড় ভাল বাসেন। সেই জন্য অদ্য আমরা কালিদাস ও সেক্ষপীয়র এই দুইজন বড় বড় কবিকে তুলনায় সমালোচনা করিব স্থির করিয়াছি। ছোট খাট বটতলার ও গ্রেষ্ট্রীটের বহুসংখ্যক কবি থাকিতে এত বড় দুইজন কবির উপর হস্তক্ষেপ করা কেন? এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে বলিব "মারি ত হাতি লুটি ত ভাণ্ডার" এদের দুজনের একজনেরও ভাল করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে সেই সঙ্গে আমারও কিছু হইতে পারে এই এক ভরসা। আমরা কালিদাস ও সেক্ষপীয়র মধ্যে কে কেমন লিখিয়াছেন দেখাইতে চেষ্টা করিব। কোন একটা বিষয় লইয়া দেখিব কে জিতিয়াছেন কে হারিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের দুজনের মধ্যে কে বড় কে ছোট কাহার কবিত্বশক্তি অধিক, কাহার অল্প তাহা নির্ণয় করা বড় শক্ত, বিশেষতঃ আমার মত ক্ষুদ্রজীবী লোকের পক্ষে। যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির পার নাই তাঁহারাই হঠাৎ বলিতে পারেন সেক্ষপীয়র—ছা—কালিদাসের ছাঁইচ পর্য্যন্ত মাড়াইতে পারে না।

কালিদাস একজন সুনিপুণ চিত্রকর। রঙ ফলাইতে অদ্বিতীয়। সেড দিবার ক্ষমতাও খুব আছে। সকলের অপেক্ষা তাঁহার বাহাদুরী সাজানতে আর বাছিয়া লওয়াতে। কোন্ কোন্ জিনিস্ বাছিয়া লইতে হইবে আর কেমন করিয়া বসাইলে সে সব গুলি ভাল করিয়া খুলিবে এই দুটী বুঝি ত তাঁহার মত ওস্তাদ মিলিয়া উঠা ভার। তিনি চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন ও কবির কলমে লিখিতেন। প্রকৃতিতে যা কিছু আছে সবই সুন্দর অথবা লিপিচাতুর্য্যে সব সুন্দর করিয়া তুলিব এ ভাব তাঁহার মনে কখন উদয় হয় নাই। তিনি স্বভাব-শোভা কাহাকে বলে জানিতেন, চিনিতেন, এবং সেগুলি বাছিয়া লইতে ও সাজাইতে খুব মজবুদ ছিলেন।

সেক্ষপীয়রের পক্ষে বাছিয়া লইবার কিছু দরকার ছিল না। তাঁহার দুই চক্ষে যাহাই পড়িত, তাহাই লইতেন, কিন্তু কাজের সময় সে গুলিকে ছাঁটিয়া পরি

স্কার করিয়া নিজব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতেন। সৌন্দর্য্য বাছিয়া লইবার তাঁহার দরকার ছিল না, যে হেতু অসুন্দরকে সুন্দর করিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। পরের লেখা ছাই ভস্ম পরিষ্কার করিয়া তিনি শিক্ষানবিসি সাঙ্গ করেন সুতরাং পরের জিনিস কিরূপে আপন করিতে হয় সে টুকু তাঁহার খুব অভ্যস্ত ছিল। অসুন্দর বস্তুর উপর কালিদাসের এমনি বিতৃষ্ণা যে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থমধ্যে কোথাও পাপের বর্ণনা বা কোন বীভৎস রসের বর্ণনা নাই। কিন্তু সেক্ষপীয়রের পাপের ছবিই সর্ব্বা পেক্ষা সমধিক উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত। আমরা কালিদাসে শ্মশানবর্ণনা পাই না নরক বর্ণনা পাই না ম্যাকবেথ পাই না ইয়া গোও পাই না। কিন্তু সেক্ষপীয়রে অদ্ভুত পাপ সৃষ্টি কালিবান্‌কে প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। কালিদাস হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া কোথায় হিমালয়ের প্রকাণ্ডতা দেখাইবেন, প্রকাণ্ড বস্তুর বর্ণনে পাঠকের শরীর কণ্টকিত করিবেন তাহা না করিয়া হিমালয়ে অপ্সরাগণের মতিভ্রম দেখা ইতে বসিলেন; সূর্য্যকিরণ বক্র করিয়া পুষ্করিণীর পদ্ম ফুটাইতে বসিলেন; আরো কত সুন্দর বস্তু দেখাইয়া হিমালয়কে বিলাসকাননবৎ করিয়া তুলিলেন। কালিদাসের এইরূপ উৎকট সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা হেতুই তাঁহার পুস্তকাবলীতে এত রমণীয় বর্ণনা দৃষ্ট হয় এই জন্যই তিনি কটমট ছন্দঃ সূত্র লিখিতে গিয়াও সেগুলিকে প্রিয়া বিশেষণ পদ প্রয়োগে ললিত করিয়া তুলিয়াছেন।

পৃথিবীতে বর্ণনীয় জিনিস দুই—অন্তর্জ্জগৎ—মনুষ্যের মন, আর বাহ্যজগৎ। নির্ম্মল আকাশ, সুদূরবিস্তৃত অরণ্যশ্রেণী, মেঘমালাবৎ প্রতীয়মান পর্ব্বতশ্রেণী ইত্যাদি। কালিদাসের বই পড়িলে বোধ হয় এই দুইএর মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর সবই তাঁহার একচেটে। মনুষ্যজাতির মধ্যে সুন্দর রমণীগণ; রমণীহৃদয়ে পবিত্র প্রণয়, পরম সুন্দর। কালিদাস সেই প্রণয়ই নানা প্রকারে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। হৃদয়ের অন্যান্য প্রবৃত্তির মধ্যে যেগুলিতে লোকের মন আকর্ষণ করে সেগুলি সব তাঁহার পুস্তকে আছে। বাপ ছেলেকে কোলে লইয়া চুম্বন করিতেছে, বাপ বনে যাবেন শুনিয়া ছেলে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাইবে বুড়া বাপ কাঁদিতেছে, প্রিয়তমার অকালমৃত্যুতে পতি শোকে অভিভূত হইয়াছে, স্বামীর অকাল মৃত্যুতে নববিধবা মোহপরায়ণ হইয়া পড়িয়া আছে, প্রিয়ার হঠাৎ বিরহে প্রিয় উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে আর যাহাকে পাইতেছে প্রিয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে; কোথাও লতা কোথাও ময়ূরকে প্রিয়া বোধে আলিঙ্গন করিতেছে—এ সব মনুষ্যহৃদয়ের মোহিনীময় ভাব। এ ভাবের প্রকৃত ওস্তাদ কালিদাস। কিন্তু যেখানে দশ পনরটী পরস্পর

বিরোধী ভাব যুগপৎ উদয় হইয়া অন্তরাকাশকে অন্ধকার করে, যেখানে হৃদয় ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত, যেখানে ভাবসন্ধি ভাবশবল হইবার কথা সেখানে কালিদাস আসিবেন না, সেখানে সেক্ষপীয়র ভিন্ন গতি নাই। একদিকে দুর্জ্জয় দুরাকাঙ্ক্ষা রাশি রাশি পাপকার্য্যে রত হইতে বলিতেছে, আর একদিকে স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞতা বাধা দিতেছে; একদিকে পাপের স্মৃতি অনুতাপের ভরে হৃদয় ভারাক্রান্ত করিতেছে, আর তখনই সেই পাপ ঢাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে, তখনি সে ভাব গোপনের জন্য কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া যেন সে নয়, এইরূপ দেখাইতে হইতেছে,—এ সব হৃদ্বৃত্তির জটিলতা, মনুষ্যস্বভাবের অস্থিরতা, পরস্পর বিরোধী ভাবসমূহের যুগপৎ বিকাশ, সেক্ষপীয়র ভিন্ন আর কেহ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারেন নাই পারিবেনও না। সেক্ষপীয়র মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন। তুমি যেমন মানুষ চাও, সেক্ষপীয়র তেমনি মানুষ তোমায় দিবেন। তুমি শকুন্তলার মত সরলা মুগ্ধহৃদয়া সামাজিক কুটিলতানভিজ্ঞা বালিকা চাও মিরন্দা দেশদিমোনা লও। পাকা গিন্নী ঘরকন্নার মজবুত, ভাঙ্গে না, মোচকায় না, এমন মেয়ে চাও, আচ্ছা তোমার জন্য ডেম কুইকলি আছে। পতিপরায়ণা পতিব্রতা যুবতী চাও পোর্সিয়া আছে; জগৎ মোহিত করিবার জন্য মায়াজাল ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, যে জালে পা দিতেছে তাহারই সর্ব্বনাশ করিতেছেন, এমন দুর্ব্বুদ্ধিশালিনী ভুবনমোহিনী চাও, ক্লিওপেট্রা আছে। দুরাকাঙ্ক্ষায় জর্জ্জরিতহৃদয়া, লোকের উপর আধিপত্য করিবার ইচ্ছায় পাষাণবৎ দৃঢ়সংকল্পা, পুরুষকে পাপে প্রেরণ করিবার জন্য শয়তানরূপিণী পাপিষ্ঠা দেখিতে চাও লেডি ম্যাকবেথ আছে। দেখিবে এ গুলি সব মানুষ; অমন যে পাষাণহৃদয়া ম্যাকবেথপত্নী; যে রাজ্যলোভে ক্রোড়স্থিত স্তন্যপায়ী আপন শিশুকে আছড়াইয়া মারিতে ক্ষুব্ধ হয় না, সেও স্ত্রীলোক। রাজার মুখ আপন পিতার মুখের মত বোধ হওয়াতে স্বহস্তে রাজহত্যা করিতে পারিল না।

কালিদাস একরূপ মনুষ্য সৃষ্টি করিতে অক্ষম, তিনি মনুষ্যহৃদয়ের সুন্দর অংশ দেখাইতে পারেন। উদাহরণ—তিনি কণ্বমুনিকে শকুন্তলার ঠিক যাত্রার সময় বাহির করিলেন। যেহেতু কন্যা প্রেরণের সময়, পিতার কান্না বড়ই সুন্দর। সেটি দেখান হইল, অমনি কণ্বমুনি ডিস্‌মিস। কালিদাস তাঁহাকে একেবারে লুকাইয়া ফেলিলেন, আর বাহির করিলেন না। শকুন্তলার চিত্রটি পরম সুন্দর, এই জন্য আগা গোড়া শকুন্তলা চরিত্র আমরা পড়িতে পাই। ওরূপ মুগ্ধ বালিকার প্রথম প্রণয় সুন্দর। সেই প্রণয়ের অনুরোধে দারুণ কষ্ট হইলেও পিতা মাতা সমদুঃখসুখসখী চিরলালিত হরিণশিশু চিরবর্দ্ধিত নবমালিকা.

লতা ত্যাগ করিয়া যাওয়া সুন্দর। রাজা প্রত্যাখ্যান করিলে তাঁহাকে হারা মেয়ের মত লুকাইবার চেষ্টা সুন্দর। সে সময়ে একটু রাগ (এ রাগে বাহানা নাই) সুন্দর। এত অপমানের পর নিশ্চয় মিলনের আশা সুন্দর, কাশ্যপ-তপোবনে দেখিবামাত্র সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া একেবারে পামর প্রণয়ীর হস্তে আত্মসমর্পণও সুন্দর। কালিদাস বড় কবি, এত সৌন্দর্য্য কে দেখাইতে পারে! আবার একটি সুন্দর মনুষ্যের চিত্র দেখিবে? বিক্রমোর্ব্বশী খোল। রাজার স্বভাবটী কেমন সুন্দর। রাজা সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিয়া সূর্য্যলোক হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, হঠাৎ অপ্সরাদিগের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। রাজা শুনিলেন দৈত্য কেশরী অপ্সরা চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি কেশরীহস্ত হইতে উর্ব্বশীর উদ্ধার করিলেন। বীরত্বে যেমন মেয়েদের চিত্ত সহসা আকর্ষণ করে, এমন আর কিছুতেই নয়। রাজার বীরত্বে উর্ব্বশীর তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মিল। ওরূপ অনুরাগ সুন্দর নয়? সুন্দরী অপ্সরা বিদ্যাধরীর অনুরাগ প্রায় নিষ্ফল হয় না। রাজারও মন কেমন হইয়া উঠিল, তিনি ক্রমে ধারিণীর প্রতি বীতভৃষ্ণ হইলেন। কিন্তু ধারিণী তাঁহাকে অপমানের শেষ করিলেও তিনি ধারিণীকে একটী উচ্চ বাক্যও বলেন নাই। শেষ ধারিণী প্রিয়প্রসাধন ব্রত করিয়া চন্দ্র সূর্য্য দেবতা সাক্ষী করিয়া বলিল যে, যে অদ্যাবধি আমার স্বামীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইবে, আমি তাহাকে ভগিনীর মত দেখিব। কেমন এটী সুন্দর নয়?

উর্ব্বশীর সহিত রাজার মিলনের কিছু দিন পরে হিমালয় পর্ব্বতের রম্য স্থান সকলে বিহার করিবার জন্য উভয়ে প্রস্থান করিলেন। সেখানে বসন্ত সময়ে পুষ্পবনমধ্যে নির্জ্জন প্রদেশে নির্ঝরিণীতটে সান্ধ্যসমীরে শিলাপট্টে পরস্পরের সহবাসে পরম সুখে কালযাপন করেন। একদিন উর্ব্বশী কার্ত্তিকের বাগানে উপস্থিত। কার্ত্তিক চিরকুমার, তাঁহার বাগানে স্ত্রীলোক গেলে পাছে দেবকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, এই জন্য শাপ ছিল স্ত্রীলোক সেখানে গেলেই লতা হইয়া যাইবে। উর্ব্বশী লতা হইয়া রহিলেন, রাজা তাঁহার বিরহে উন্মত্ত। মেঘ দেখিয়া ভাবিলেন বুঝি দৈত্য আবার উহাকে চুরি করিয়াছে। মেঘকে কতকগুলা গালাগালি দিলেন। মেঘ তাঁহার মাথার উপর জলধারা বর্ষণ করিল। রাজা বলিলেন রে পাপ দৈত্য আমারই সর্ব্বনাশ করিয়াছিস, আবার আমারই উপর বাণ বর্ষণ। সে ভয়ে থামিল। একটা গাছের উপর ময়ূর গলা বাড়াইয়া কি দেখিতেছে, রাজা বলিলেন অনেক দূর দেখিতেছ আমার প্রিয়াকে দেখিতেছ কি? ময়ূর বলিল কক্ কক্। রাজার মহারাগ, আমি মহারাজ পুরুরবা আমায় চেন না? বল কি

না "কঃ কঃ" বলিয়াই ছিল, ময়ূরও উড়িয়া যাক। রাজা অনেক কষ্টের পর গৌরীপাদভ্রষ্ট অলক্তকমণিসংযোগে উর্ব্বশীর উদ্ধারসাধন করিলেন। উর্ব্বশী বলিলেন মহারাজ, আর না। আপনি রাজধানী চলুন। রাজা বলিলেন তুমি মেঘ হও, উর্ব্বশী মেঘ হইলেন, রাজা তদুপরি আরোহণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রয়াগে উপস্থিত। ইহা অপেক্ষা চিত্তবিনোদন আর কি আছে? যে কেহ কালিদাসের গ্রন্থ পড়িয়া রাজার সহিত কার্ত্তিকের প্রমোদকাননে ভ্রমণ করে নাই তাহার সংস্কৃত পড়াই অসিদ্ধ।

আমরা এতক্ষণ নাটকের কথাই কহিতেছিলাম, আরও কিছুক্ষণ কহিব। নাটক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র লইয়াই ব্যস্ত। সে চিত্রে অনেক সৌন্দর্য্য কালিদাস দেখাইয়াছেন কিন্তু আরও অনেক বাকী আছে। সেগুলি কালিদাসে মিলিবে না তাহার জন্য সেক্ষপীয়রের শরণ লইতে হইবে। কালিদাসগ্রথিত সৌন্দর্য্য সেক্ষপীয়রেরও আছে। কালিদাসের পুরুরবা কালিদাসের শকুন্তলা অন্যত্র মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু সেক্ষপীয়রের প্রস্‌পেরো আর কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রস্‌পেরোর স্বভাব মনুষ্যহৃদয়গত সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। যে শত্রু তাঁহাকে জীর্ণ শীর্ণ ডিঙ্গি মাত্রে চড়াইয়া অগাধসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে, যাহার জন্য বার বৎসর রাজ্য হারাইয়া একাকী জনশূন্য দ্বীপে বাস করিতে হইয়াছিল তাহাদের ক্ষমা করা সামান্য ঔদার্য্যের কথা নহে। প্রসপেরোর গুণে সকলেই বাধ্য। কন্যা পিতার একান্ত বশম্বদ। নেপলসের রাজা উহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। ফর্দ্দিনান্দ উহাকে দেবতা মনে করে। প্রস্‌পেরো সংসারের কার্য্যে কেমন দক্ষ সমস্ত নাটকে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। প্রস্‌পেরো মূর্ত্তিমান্ শান্তি, পরোপকার ক্ষমা তাঁহার আভরণ। কলিবানকে শত অপরাধসত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতা দিলেন যে হেতু সে তাহাই চায়। এরিএলের সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অন্তোনিওর দোষ প্রমাণ করিয়া দিলে তাহার প্রাণ দণ্ড হয়, তিনি কেবল একবার ভয় দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন। তিনটা মাতাল তাঁহার ঘর লুঠ করিতে আসিয়াছিল তাহারাও ক্ষমা পাইল। প্রস্‌পেরো ক্ষমা করিলেন কিন্তু সকলকেই এক একবার জব্দ করিবার পর। প্রস্‌পেরোর চরিত্র পাঠ করিলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে ও ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে। এ একরকম সৌন্দর্য্য। আবার যখন ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধিতে বিবাদ হয় সে সময়ের বর্ণনা কি সুন্দর নয়? ব্রুটস এণ্টনি হ্যামলেট এমন কি ম্যাক্‌বেথ এই বিবাদহেতু কোন কাজই করিতে পারিতেছে না, একবার এদিকে একবার ও দিকে করিয়া দোলাচলচিত্তবৃত্তি হইয়া রহিয়াছে ইহা কি সুন্দর নয়? উহাদের জন্য কি আমাদের ক্ষুদ্রজীবী

মনুষোর সহানুভূতি হয় না? ওরূপ সৌন্দর্য্য কালিদাসের কোথায়।

তাহার পর আর এক কথা। শুদ্ধ সৌন্দর্য্য হইলেই কি কাব্যের চরম হইল? সৌন্দর্য্য ছাডা আরও অনেক জিনিসে কাব্য হয়। তাহার মধ্যে প্রধান দুইটি, পণ্ডিতেরা বলেন তিন পদার্থে কল্পনা-জনিত আনন্দের উৎপত্তি হয়,—প্রকাণ্ড বস্তু দেখিলে, নূতন বস্তু দেখিলে, আর সুন্দর বস্তু দেখিলে। এই কথাটী যেমন বাহ্যজগতে খাটে তেমনি অন্তর্জ্জগতে। অন্তর্জ্জগতে যখন আমরা কাহাকেও লোকাতীত ক্ষমতাশালী দেখিতে পাই, যখন দেখিতে পাই যে জিনদেব ব্যাঘ্রী জন্য স্বদেহ অর্পণ করিলেন, যখন দেখি যে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ বনগমন করিলেন, তখনই আমরা প্রকাণ্ড বস্তু দেখি। তখনই আমাদের মনে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয় এবং সেই বিস্ময়বিমিশ্রিত এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও ভক্তির উদয় হয়। কালিদাস একরূপ পুরুষপ্রকাণ্ডের চিত্র দেখাইতে পারেন নাই। রঘু রাজা যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে "মৃৎপাত্র শেষা মকরোৎ বিভূতিম্;" পার্ব্বতী যখন মদন দহনের পর কঠোর তপস্যায় তনু অঙ্গে-তাপ দিতে লাগিলেন তখন যেন এই রূপ প্রকাণ্ড চিত্র দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে বোধ হয় কিন্তু এক পার্ব্বতীর তপস্যা ভিন্ন আর কোথাও বিস্ময় উদয় করণে তিনি সমর্থ হয়েন নাই। সেক্ষপীয়রের একরূপ বিস্ময় উৎপাদক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র অসংখ্য। একরূপ উজ্জ্বল চিত্রের সংখ্যা নাই। সর্ব্বপ্রধান লেডি ম্যাক্‌বেথ, একবার অনুতাপ নাই বরং প্রতিজ্ঞা, একবার যখন নামিয়াছি দেখা যাক পাতাল কত দূর। একবার হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রকাশ নাই, কেমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! যখন সভামধ্যে ব্যাঙ্কোর প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া ম্যাক্‌বেথকে বিহ্বল করিয়া তুলিল, যখন ম্যাক্‌বেথ ভয়ে অনুতাপে জড়ীভূত হইয়া অতি গোপনীয় কথা সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন লেডি ম্যাক্‌বেথের কেমন ক্ষমতা! অন্য মেয়ে হইলে, "ওগো আমার কি হোলো" বলিয়া কাঁদিয়াই অস্থির হয়। লেডি ম্যাক্‌বেথ সভা শুদ্ধ লোককে বুঝাইয়া-দিলেন যে রাজার ঐরূপ মূর্চ্ছা মাঝে মাঝে হয়, এ সময়ে কাছে কেহ আসিলে তিনি বিরক্ত হন। এই বলিয়া নিজে ম্যাক্‌বেথের কাছে বসিয়া তাহার দুর্ব্বল মনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একরূপ চরিত্র পাঠ করিলে কাহার মনে বিস্ময়ের উদয় না হয়?

কল্পনাজনিত আনন্দের আর এক কারণ নূতনতা, অর্থাৎ আজগবি জিনিস বর্ণনা করা। আরব্য উপন্যাসে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। একরূপ নূতন জিনিস কালিদাস বা সেক্ষপীয়র কাহা-রই নাই। তবে সেক্ষপীয়রের স্পিরিট ওয়াবল্ড বা পরীস্থান; সেটী যেমন নূতন তেমনি সুন্দর। সবই মনুষ্যের মত কিন্তু কেমন পবিত্র আনন্দময়, কোনরূপ

শোক দুঃখ নাই। শোক দুঃখ যে বৃত্তি দ্বারা অনুভব হয় সে বৃত্তিও তাহাদের নাই। অথচ মানুষের কষ্ট দেখিলে মনটা কেমন কেমন হয়।

Ariel. Your charm so strongly works them
That if you now behold them your affection
Would become tender.
Pros. Dost thou think so, spirit?
Ari. Mine would sir, were I human.

যদি আরিয়াল মানুষ হইত, তবে লোকের দুঃখ দেখিয়া তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হইত। ওবেরণের অধীন দেব যোনিগণ মনুষ্যের অদৃষ্ট লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, মানুষের কাণে একপ্রকার পাতার রস ঢালিয়া দিয়া এর প্রাণটী ওর ঘাড়ে, ওর পিরাবের লোক তার ঘাড়ে দিয়া কেমন আমোদ করিতেছে; পড়িলে নূতন জগৎ, নূতন আমোদ, নূতন পরিবর্ত্ত বলিয়া বোধ হয়, পাঠক নিজেও যেন পরীগণমধ্যে বিলীন হইয়া যান। কালিদাসের চিত্রলেখা, সহজন্যা, মিশ্রকেশী, এমন কি উর্ব্বশী সেক্ষপীয়রের পরীস্থানে স্থান পান না।

সেক্ষপীয়রের হাস্যরসাকর চরিত্র বর্ণনা এক আশ্চর্য্য জিনিস। এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। ফলষ্টাফ কতবার অপ্রস্তুত হইল, কিন্তু সে অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নহে। যতবার তাহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে, ততবারই সে নূতন নূতন চালাকি বাহির করে, ঠকিবার পাত্র ফলষ্টাফ একেবারেই নহে। প্যারোলস ফলষ্টাফের সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাসের বিদূষকগুলি কোন কর্ম্মেরই নহে। জীবনশূন্য প্রভাশূন্য খোসামুদে বামুন মাত্র।

এতদূরে আমরা কালিদাস ও সেক্ষপীয়র তুলনার এক অংশ কথঞ্চিৎ শেষ করিলাম। বিষয় এত বিস্তৃত, সমালোচনায় এত আমোদ, যে, সংক্ষেপ করিতে গেলেই কষ্ট হয়। যে অংশ সমালোচিত হইল, ইহাতে হৃদয়ের প্রবৃত্তি বর্ণনায় কাহার কত বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কল্পনাজনিত সুখ তিন কারণে জন্মে, প্রকাণ্ডতা—সৌন্দর্য্য ও নূতনত্ব। প্রকাণ্ডতা—বিস্ময়কর হৃদয় ভাবের ঔজ্জ্বল্য—বর্ণনায় সেক্ষপীয়রের অনুকরণেও কেহ সমর্থ নয়। অতি নৈসর্গিক পদার্থ সৃষ্টিতে সেক্ষপীয়র অতীব মনোহর, হাস্যরসের বর্ণনায় তাঁহার বড়ই ওস্তাদি। সৌন্দর্য্য বর্ণনা ও যেখানে হৃদয়বৃত্তির জটিলতা, গভীরতা সেখানে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে অনেক ন্যূন। যে চরিত্র পাঠে মনের ঔদার্য্য জন্মে যে চরিত্র অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার গন্ধও কালিদাসের নাটকে নাই। তবে যেখানে সহজ অবিমিশ্র হৃদয়ভাবের বর্ণনা আবশ্যক, সেখানে কালিদাসের বড়ই বাহাদুরী। কালিদাসের নাটক পড়িলে গেটের সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা করে "যদি

কেহ বসন্তের কুসুম, শরতের ফল, স্বর্গ ও পৃথিবী একত্র দেখিতে চায় তবে শকুন্তলে তোমায় দেখাইয়া দিব।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা দেখা গেল তাহাতে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু কালিদাসের আর এক মূর্ত্তি আছে, সে মূর্ত্তিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহও নাই। বাইরণ জাঁক করিয়া বলিয়াছেন Discription is my forte কিন্তু সেই বাহ্য জগদ্বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়। সেক্ষপীয়র বাহ্যজগদ্বর্ণনায় হাত দেন নাই, তিনি বাহ্যজগৎ বড় গ্রাহ্যও করিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ের উপর তাঁহার আধিপত্য সর্ব্বতোমুখ। তাঁহার যেমন অন্তর্জ্জগতের উপর, কালিদাসের তেমনি বাহ্যজগতের উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। যখন স্বয়ম্বর স্থলে ইন্দুমতী উপস্থিত হন, তখন কালিদাস দুই চারি কথায় কেমন জম জমাট করিয়া দিলেন। একেবারে কল্পনানেত্র উন্মীলিত হইল। দেখিলাম প্রকাণ্ড উঠান, বহুসংখ্যক মঞ্চ, অর্থাৎ কথকঠাকুরদিগের মত বেদী, নানা কারুকার্য্যখচিত মহার্ঘ বস্ত্রাস্তরণোপপন্ন, তদুপরি পৃথিবীর রাজগণ বিচিত্র বেশভূষা করিয়া স্বীয় সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে বসিয়া আছেন।

তাসু শ্রিয়া রাজ পরম্পরাসু
প্রভাবিশেষোদয়দুর্নিরীক্ষ্যঃ।
সহস্রধাত্মা ব্যরুচদ্বিভক্তঃ
পয়োমুচাং পঙ্‌ক্তিষু বিদ্যুতেব॥

যেমন মেঘমালায় একটি বিদ্যুৎ হইলে সমস্ত মেঘ উদ্দীপ্ত হয় এবং সেই নিবিড় নীলনীরদমালার মধ্যে সেই বিদ্যুৎ যেমন গাঢ়োজ্জ্বলদীপ্তি বিকাশ করে, তেমনি রাজারা সব মঞ্চোপরি আসীন হইলে রাজসভার কেমন এক গম্ভীরতা মিশ্রিত লোকাতীত শোভা হইল। সব জম জম করিতে লাগিল। এমন সময়ে *বন্দিরা স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিল—রাজাদের বংশাবলী বর্ণনা সমাপন হইল।

অথ স্তুতে বন্দিভিরন্বয়জ্ঞৈঃ
সোমার্কবংশে নরদেবলোকে।
প্রসারিতে চাগুরুসারযোনৌ
ধূপে সমুৎসর্পতি বৈজয়ন্তীঃ॥
পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং
কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাত শঙ্খে পরিতোদিগন্তান্
তূর্য্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে॥
মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযান
মধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি
বিবেশ মঞ্চান্তর রাজমার্গং
পতিম্বরাক্লৃপ্ত বিবাহবেশা॥

কালিদাস রাজসভার কবি, তিনি

* চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজগণের বংশাবলী পাঠ হইলে পর উৎকৃষ্ট অগুরুচন্দনের ধূম চারিদিকে প্রসারিত হইল। সে ধূম ক্রমশঃ অত্যুচ্চ পতাকা আক্রমণ করিতে লাগিল। মঙ্গলসূচক তূর্য্যধ্বনি সবলে ধ্বনিত হইল। তাহার সঙ্গে শঙ্খপ্রধ্মাত হইয়া শব্দ আবর্ত্ত ঘন গাঢ় হইয়া দিগন্ত পরিপূর্ণ করিল। নগরের প্রান্ত-

নিজেও হয় ত একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি পুস্তক লিখেন সভাস্থ ওমরাহদিগের তৃপ্তির জন্য,তাঁহার নিকট আমরা রাজসভা, বিবাহসভা, দরবার প্রভৃতি বড়মানুষি জিনিসের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পাইব, ইহা এক প্রকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বভাববর্ণনায়ও তাঁহার সমান্তরাল কেহ নাই। বাহ্যজগৎ বর্ণনায় তিনি যে শুদ্ধ সৌন্দর্য্য মাত্র বর্ণন করিয়াছেন এমন নহে। হিমালয় বর্ণনস্থলে যাহাই করুন, তাঁহার অনেক বর্ণনা এত গভীর যে ভাবিতে গেলে হৃদয় কম্পিত হয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাবসৌন্দর্য্য বর্ণনাই আমরা বড় ভাল বাসি এবং তাহাই অধিক।

কালিদাসের আরও একটি নিসর্গ বর্ণনা এখানে দেখাইতে হইল। এটী কালিদাসের রঘুর ত্রয়োদশ সর্গ হইতে। রাবণবধ ও বিভীষণের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে। রাম সীতায় অনেক হাঙ্গামের পর পুনর্ম্মিলন হইয়াছে। পুষ্পক রথ প্রস্তুত। সকলে আরোহণ করিল। পুষ্পক আকাশপথে উড্ডীন হইল। রাম সীতাকে দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমেই সমুদ্র

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিল মম্বুরাশিং।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্ন
মাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥
তামো মবস্থাং প্রতিপদ্যমানং
স্থিতং দশ ব্যাপ্যদিশোমহিম্না
বিষ্ণো রিবাস্য নবধারণীয়
মীদৃক্তয়া রূপ মীয়ত্তয়া বা॥ †

সমুদ্রে প্রকাণ্ড তিমি মৎস্যসমূহ রহিয়াছে।

সসত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ
সম্মীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ
অমী শিরোভিঃ তিময়ঃ সরন্ধ্রৈঃ
ঊর্দ্ধং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্॥ ‡

বর্ত্তী যে ময়ূরেরা ছিল তাহারা মেঘগম্ভীর তূর্য্য মিশ্রিত শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এমন সময়ে স্বয়ংবরা রাজকন্যা বিবাহ বেশ ধারণ করতঃ মনুষ্যবাহ্য চতুষ্কোণ যান আরোহণ করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

† বৈদেহি আমার সেতুতে বিভক্ত অনন্ত ফেনিল নীল সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যেন শরৎকালের অগণ্য তারকা খচিত নির্ম্মেঘ গগনতল ছায়াপথে দ্বিখণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে।

ঐ দেখ অনন্ত সমুদ্র দশদিক্ ব্যাপিয়া পড়িয়া আছে। প্রতিক্ষণেই উহার আকার পরিবর্ত্তন হইতেছে। সমুদ্রের রূপ বিষ্ণুর ন্যায়, কিরূপ ও কত বড় কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারে না।

‡ তিমিমৎস্য সকল বিকট হা করিয়া নদীমুখের জল মুখে পুরিতেছে, শেষ মাথার ছিদ্র দিয়া সে জল বাহির করিয়া দিয়া নদী হইতে আগত সমস্ত জীবজন্তু ভক্ষণ করিতেছে।

প্রকাণ্ড অজগরগণ সমুদ্রতীরে জল-তরঙ্গের সঙ্গে একাকার হইয়া শয়ন করিয়া আছে।

বেলানিলায় প্রস্থতা ভুজঙ্গাঃ
মহোর্ম্মি বিস্ফূর্জ্জথুনির্ব্বিশেষাঃ
সূর্য্যাংশু সম্পর্ক সমৃদ্ধরাগৈঃ
ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ। *

দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের কূল দেখা গেল।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্দ্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।। †

রথ রামের যেমন অভিলায তেমনি চলিতেছে। মুহূর্ত্ত মাত্রে সমুদ্রতীরে উপস্থিত। রাম দেখাইলেন সীতে দেখ

এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তি
পর্য্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ
প্রাপ্তা মুহূর্ত্তেন বিমানবেগাৎ
কূলং ফলাবর্জ্জিতপূগমালম্। ‡

আকাশ নীরধির স্বৈরগামী প্রমোদ নৌকার ন্যায় রামের পুষ্পকরথ জনস্থান, মাল্যবান্, পঞ্চবটী, পম্পা, শবভঙ্গাশ্রম প্রভৃতি পার হইয়া, প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা সংগমস্থলে উপস্থিত। এখানে নির্ম্মল শ্বেতকান্তি গঙ্গাপ্রবাহ কৃষ্ণকান্তি যমুনাপ্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে।

ক্বচিৎ প্রভালেপিভি রিন্দ্রনীলৈঃ
মুক্তাময়ী যষ্টি রিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানা
মিন্দীবরৈরুৎ খচিতান্তরেব।।
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং
কাদম্ব সংসর্গবতীব পংক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তিভুর্বশ্চন্দনকল্পিতেব।।
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিঃ
ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেম্বিবা লক্ষ্যনভঃপ্রদেশা।।
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনু রীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ।। ¶

---

* বৃহৎ বৃহৎ অজগর সকল সমুদ্রতীরবায়ু সেবন করিবার জন্য লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। সমুদ্রতরঙ্গের সহিত তাহাদের ভেদ নিরূপণ অতীব কষ্টকর। যদি সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া উহাদের মাথার মনি দ্বিগুণ দীপ্তি না করিত কাহার সাধ্য চিনিয়া উঠে কোনটা সাপ আর কোনটা নয়।

† দূর হইতে সমুদ্রের বেলা দেখা যাইতেছে। বেলা কেমন? তমাল ও তালবনে নীলবর্ণ। বোধ হয় যেন একখানি প্রকাণ্ড লৌহচক্রের কানায় সরু কলঙ্কের রেখা দেখা যাইতেছে।

‡ এই ত আমরা রথবেগ হেতু মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদ্রের তীরভূমিতে উপস্থিত হইলাম। এই তীরভূমিতে অসংখ্য গুপারিবৃক্ষ ফলভরে অবনত এবং বালুকার উপরে শুক্তি বিভক্ত হওয়ায় চারিদিকে মুক্তা ছড়ান রহিয়াছে।

¶ হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! গঙ্গা যমুনা তরঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া কেমন

এত মিষ্ট, এত সুন্দর, এমন হৃদয়োন্মাদকর বর্ণনা, প্রকৃতির এত সুনিপুণ অনুকরণ, কল্পনার এমন স্নিগ্ধ দীপ্তি আর কোথায় মিলিবে? আমার ইচ্ছা ছিল আরও উৎকৃষ্ট বর্ণনা উদ্ধার করি, কিন্তু বঙ্গদর্শনের স্থান বড় অল্প, সবই যদি ভাল জিনিসে পুরাইয়া দিই ত আর সব ছাই ভস্ম কোথায় যাইবে?

যখন নাটক ছাড়িয়া মহাকাব্যে উপস্থিত হইয়াছি, তখন কালিদাসের হইয়া আর একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। নাটকে কালিদাস মনুষ্যহৃদয়ের যেমন একই রকম চিত্র দেখাইয়াছেন, মহাকাব্যে সেরূপ নহে। মহাকাব্যে মনুষ্যচরিত্র বর্ণনায় তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক কারুকরী প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মনুষ্যহৃদয়ের উদারতা, বিশালতা, জটিলতা, অহম্মুখতা, চিন্তাপ্রিয়তা প্রভৃতি বর্ণনে তিনি সেক্ষপীয়রের ছাত্রানুছাত্রবৎ। তাঁহার কেবল একটি মনুষ্যচিত্র অনুকরণের অতীত। সেটি কুমার সম্ভবের পার্ব্বতী। কেন? ভারত মহিলাপ্রস্তাবে লিখিত আছে, পাঠক মহাশয়ের ইচ্ছা হয় একবার খুলিয়া দেখিবেন আমাদের আর স্থান নাই।

সেক্ষপীয়র মহাকাব্য লিখিতে গিয়া যেরূপ বিষম শঙ্কটে পড়িয়াছেন, কালিদাসকে সেরূপ হইতে হয় নাই। প্রত্যুত তাঁহার মহাকাব্যই তাঁহার মহাকবি খ্যাতি লাভের মূল কারণ। এ সকলের উপর তাঁহার মেঘদূত। সমস্ত সাহিত্য সংসারে মেঘদূতের মত সারবান্ কাব্য অতি বিরল। আডিশন পোপের রেপ অবদিলক্‌কে "*Merum sal* or the delicious little thing" বলিয়াছেন। তিনি যদি মেঘদূত দেখিতেন তবে *Merumsal* এ নাম রেপ অব্‌দিলকের দুষ্প্রাপ্য হইত। মেঘদূতের সঙ্গে তুলনায় অন্য কাব্য আতরের তুলনায় গোলাবজলের মত। একটী উৎকৃষ্ট পদার্থের সার অংশের উৎকৃষ্ট ভাগ সংগ্রহ, আর একটি গন্ধ করা জল মাত্র।

এতক্ষণ আমরা কাব্যের বিষয় লইয়া কালিদাস ও সেক্ষপীয়রের তুলনা করিতে

শোভা হইয়াছে দেখ। কোথাও বোধ হয় মুক্তার হারের মাঝে মাঝে নীলমনি থাকিয়া আপনার প্রভা যেন মুক্তায় লেপন করিয়া দিতেছে। আর এক জায়গায় শাদা পদ্মের মালায় যেন মাঝে মাঝে নীলপদ্ম বসান রহিয়াছে। কোনস্থানে যেন হংসশ্রেণী মানস সরোবরে যাইতেছে তাহাদের মধ্যে মধ্যে কাদম্ব হংসও দুই পাঁচটা আছে। আবার কোথাও যেন পৃথিবী সার চন্দনের টিপ কাটিয়া মধ্যে মধ্যে কালাগুরু দিয়া তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও বোধ হয় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, কেবল মাঝে মাঝে ছায়ার অন্ধকার লুকাইয়া আছে। কোথাও যেন শরৎকালের নির্ম্মল মেঘ, মধ্যে মধ্যে ফাঁক দিয়া নীল আকাশ উঁকি মারিতেছে। আবার একস্থান দেখিতে হঠাৎ বিভূতিভূষিত শিবঅঙ্গে কৃষ্ণসর্প বিহার করিতেছে বোধ হইবে।

ছিলাম। তাহাতে এই দাঁড়াইল যে কালিদাসের বাহ্য জগতে যেরূপ অসীম আধিপত্য সেক্ষপীয়রের অন্তর্জ্জগতে তেমনি। অন্তর্জ্জগতেরও এক অংশে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন নহেন। যেখানে হৃদয়ের সুন্দর ও কোমল ভাব গুলি বর্ণনা করিতে হইবে সেখানে বোধ হয় কালিদাস অনেক অধিক মিষ্ট লাগে। কিন্তু অন্য সর্ব্বত্র সেক্ষপীয়র উপমা-বিরহিত।

বিষয়ের কথা শেষ হইল, এখন কাব্যের আকার লইয়া তর্ক হইতে পারে। এতর্কেও কাহার কি দাড়ায়, দেখা উচিত। কাব্য তিন প্রকার, শ্রব্য দৃশ্য আর গীতি-কাব্য। ইহার মধ্যে গীতিকাব্যে দুজনেই সমান। কেহই গীতিকাব্য লিখেন নাই, কিন্তু সেক্ষপীয়র তাঁহার নাটকমধ্যে যে সমস্ত গান দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট গীতিলেখক বলা যাইতে পারে। কালিদাসও কয়েকটী গান দিয়াছেন। বিক্রমোর্ব্বশীর পাহাড়িয়া ভাষায় গান গুলি বড় মিষ্ট। তাহার উপর কালিদাসের মেঘদূত। মেঘদূতকে দেশীয় আলঙ্কারিকেরা খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ড কাব্য বলিয়া কাব্য ভেদ করা তাঁহাদের গায়ের জোর মাত্র। মেঘদূত সার ধরিতে গেলে একখানি গীতিকাব্য, এবং উৎকৃষ্ট গীতি কাব্য। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে উহাকে গীতিকাব্যই বলিয়া থাকেন। যখন হৃদয়ে আনন্দ বা শোক ধরে না, তখন তাহাকে কাব্যাকারে বাহির করিয়া দেওয়াই গীতিকাব্য। তবে মেঘদূত গীতিকাব্য কেন না হইবে?

সেক্ষপীয়রের শ্রব্যকাব্য প্রায় লোকে পড়ে না। কালিদাসের শ্রব্য কাব্য গুলি রঘু কুমার ঋতুসংহার সকলই পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদরের বস্তু।

দৃশ্যকাব্য নানারূপ। তন্মধ্যে নাটক প্রধান। সংস্কৃত অলঙ্কারে নাটকের আকার লইয়াই বাঁধাবাঁধি—পাঁচ অঙ্ক নয় সাত অঙ্ক হইবে, রাজা নায়ক হইবে, মন্ত্রী হইলে হইবে না। নাটকের যে টুকু নহিলে নয় সে টুকুর উপর তত নজর নাই। কথাচ্ছলে বিচ্ছিত্তি পূর্ব্বক হৃদয়ের ভাব প্রকাশ ও সেই ভাব দ্বারা পরহৃদয়ের ভাব আকর্ষণ এই দুইটী নাটকের সার। নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য কোন উন্নত নীতির শিক্ষা। আমাদের কবিদের এ দুটিতে নজর বড় নাই। এমন কি যে বীজ লইয়া নাটক, অনেক সময় বাজে কথায় ৬ অঙ্ক কাটাইয়া ৭ম অঙ্কে সেই বীজের অবতারণা করা হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলায় ১ম ২য় অঙ্ক না থাকিলে নাটকের কোন হানিই ছিল না; নাটকের বীজ তৃতীয় অঙ্কে। চতুর্থ অঙ্কেও নাটকের কোন উপকার নাই। নাটকের জন্য দরকার রাজার প্রণয়, প্রত্যাখ্যান, অভিজ্ঞান ও মিলন। কিন্তু কালিদাস ত নাটক লিখিতে যান নাই, তাঁহার উদ্দেশ্য এই আদরার উপর এই কাটামতে তাঁহার কাব্য গালারি হইতে কতকগুলি

উৎকৃষ্ট চিত্র দেখান। তাহা তিনি খুব দেখাইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। শকুন্তলার মত বালিকার প্রথম প্রণয়ে আড়নয়নে চাহনি বড় সুন্দর? না? কালিদাস সেইটি দেখাইবেন। অনেক চেষ্টা হইল, এক অঙ্ক পুরিয়া গেল, সেটা আর দেখান হয় না, ক্রমে এক ঘেয়ে রকম হইয়া দাঁড়াইল। কালিদাস বিনা প্রয়োজনে একটা হাতী হাতী বলিয়া গোল (নেপথ্যে) তুলিয়া দিলেন। রাজার গল্প ভাঙ্গিবার উপায় হইল, শকুন্তলারও আড়ে আড়ে দেখিবার সুবিধা হইল, যে হাতী কালিদাসের উপকার করিল বটে, কিন্তু নাটকের কিছুই করিল না। সেক্ষপীয়র কিন্তু একটি সিন, একটি উক্তিও বিনাপ্রয়োজনে সন্নিবেশিত করেন নাই। অনেক অবুঝলোকে মনে করিত যে ম্যাক্‌বেথে ঐ যে দরজায় ঘামারা আছে ওটা কেবল সকাল হইয়াছে, জানাইবার জন্য, সুতরাং উহাতে নাটকের কোন উপকার নাই। কিন্তু ডিকুইনসি দেখাইয়া দিলেন যে ঐ দ্বারে আঘাতে অনেক উপকার হইয়াছে। পাপিষ্ঠ দম্পতী হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিয়া পাপচিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিল, তাহাদের মন তাহাদের ছিল না, তাহারা আপন পার্থিব অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছিল। দ্বারে আঘাত হইবামাত্র তাহাদের বজ্রধ্বনিবৎ বোধ হইল, তাহাদের মন আকাশভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আবার দেহপিঞ্জরে প্রবেশ করিল। অন্য কবিরা বারবার বজ্রধ্বনি করিয়া যে গাম্ভীর্য্য উৎপাদনে অক্ষম, সেক্ষপীয়র সময় মত বার কত দরজায় ঘা মারিয়া তাহার দশগুণ করিলেন। যে বুঝিল তাহার পর্য্যন্ত হৃৎকম্প হইল।

এক্ষণে কালিদাস ও সেক্ষপীয়র এই উভয়ের তুলনায় সমালোচনা শেষ হইল। সেক্ষপীয়র Prince of the Dramatists এ কথা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু কালিদাস সকল প্রকার কাব্যই লিখিয়াছেন এবং বোধ হয় নাটক ভিন্ন সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মহাকাব্যে তিনি বাল্মীকির সমান নহেন সত্য, কিন্তু তিনি ফেলা যান না। নাটকেও তিনি যে ভারতবর্ষের কোন কবি অপেক্ষা হীন, এমত বলিতে পারি না। কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণনাময় কাব্য ঋতুসংহার লিখিয়াছেন এ কথা বলিলে "ভারতের কালিদাস জগতের তুমি" এই যে অতি অন্যায় সমালোচনা প্রচলিত আছে, তাহারই সপক্ষতা করা হয়। সেক্ষপীয়রও যেমন জগতের কালিদাসও তেমনি জগতের। জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহার কবিতার সমান সমাদর। তবে তিনি ভারত ছাড়া কোন কথা লিখেন নাই। ভারতের কথাই তাঁহার কাব্য।

আমাদের উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, সেক্ষপীয়র মেনকা হইতে পারেন— বাল্মীকি উর্ব্বশী হইতে পারেন, হোমার

বক্তা হইতে পারেন কিন্তু কালিদাস সর্ব্বলোকদুর্লভা তিলোত্তমা। সকলেরই উৎকৃষ্টাংশ তাহাতে আছে—কিন্তু অল্প-পরিমাণে প্রবন্ধ শেষ করিবার সময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—

কালিদাস কবিতা নবং বয়ঃ মাহিষং
দধি শশর্করং পয়ঃ।
এনমাংস মবলাচ কোমলা সম্ভবন্তু 'মম'
জন্মজন্মনি।।*

সেই সঙ্গে পাঠকমহাশয়দেরও যেন ফাঁক না যায়।

তর্ক সংগ্রহ।

পঞ্চম তর্ক—কারণ কি?

আমরা এই জগৎ কার্য্যের প্রতি যে তিনটী প্রসিদ্ধ কারণ, তাহাদের ক্রমশঃ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে কারণ কাহাকে বলে? তাহার স্বরূপ কি? তাহা কত প্রকার হইতে পারে এবং কার্য্যের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা বিধেয় বোধ করিতেছি।

কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন—

"অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং ভবেৎ।" কারিকাবলী।

অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হইয়া কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে বর্ত্তমান হয় তাহার নাম কারণ।

অন্যথা সিদ্ধি যাহাতে থাকে তাহার নাম অন্যথাসিদ্ধ।. এই অন্যথাসিদ্ধের ঠিক্ বাঙ্গালা অর্থ দুর্ল্লভ, তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে কার্য্যোৎপত্তির প্রতি যাহার কোন সাক্ষাৎ বা ক্লিপ্ত সম্বন্ধ নাই তাহার নাম অন্যথাসিদ্ধ। প্রাচীনদিগের মতে এই অন্যথাসিদ্ধ পাঁচ প্রকার। যথা—

"যেন সহ পূর্ব্ব ভাবঃ, কারণ মাদায়
বা যস্য।
অন্যং প্রতি পূর্ব্বভাবে জ্ঞাতে যৎ
পূর্ব্বভাব বিজ্ঞানম্।।
জনকং প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতা মপবিজ্ঞায়
ন যস্য গৃহ্যতে।
অতিরিক্তমথাপি যদ্ভবেন্নিয়তাবশ্যক
পূর্ব্বভাবিনঃ।।

প্রথম "যেন সহ পূর্ব্বভাবঃ" অর্থাৎ যে ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, সেই ধর্ম্ম; কারণের ধর্ম্ম কার্য্যের কারণ নয় কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ। যেমন

* কালিদাসের কবিতা, যৌবন বয়স, মহিষের দধি, দুগ্ধে চিনি, হরিণের মাংস, কোমলা অবলা এই কয়টি যেন আমার জন্ম জন্ম হয়।

ঘটের প্রতি দণ্ড* কারণ। অতএব দণ্ডের ধর্ম্ম দণ্ডত্ব ঘটের কারণ নয় কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ। কারণ দণ্ডত্ব দণ্ড সমুদয়ের একটী সাধারণ ধর্ম্ম, যাহা দ্বারা সমুদয় দণ্ডের একবারে বোধ হয়। এদিকে ঘটোৎপত্তির প্রতি একটি মাত্র দণ্ড কারণ, সমুদয় দণ্ড নহে। সুতরাং দণ্ডত্ব ঘটের কারণ নয়, দণ্ডত্ব থাকিলেই ঘট হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই অর্থাৎ দণ্ডত্বের সহিত ঘটোৎপত্তির কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

দ্বিতীয়। "কারণ মাদায় বা যস্যঃ"—যাহাদের সহিত কার্য্যের পৃথক্‌রূপে এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই যে তাহারা থাকিলে কার্য্য অবশ্যই হইবে এবং তাহারা না থাকিলে কার্য্য একবারে হইবে না, অথচ যাহারা কারণে বর্ত্তমান হইয়া কার্য্যের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করে। যেমন ঘটের প্রতি দণ্ডের বর্ণ (পরিমাণাদি।) যে, দণ্ডের পরিমাণাদি পৃথক্‌রূপে ঘটের উৎপত্তির বা অনুৎপত্তির কারণ নহে, কারণ এ কথা বলা যাইতে পারে না যে এই রূপ পরিমাণাদি থাকিলে ঘট হইবে এইরূপ পরিমাণাদি না থাকিলে ঘট হইবে না। কিন্তু কোন পরিমাণাদি বিশিষ্ট দণ্ড থাকিলেই ঘটের উৎপত্তি হইবে এবং তাহার অভাবে ঘট হইবে না। অতএব দণ্ডের পরিমাণাদির সহিত ঘটোৎপত্তির কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় তাহারা ঘটের কারণ নহে, কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ।

তৃতীয়। "অন্যং প্রতি পূর্ব্বভাবে জ্ঞাতে যৎ পূর্ব্বভাব বিজ্ঞানম্" যাহাকে প্রথমে অপর কার্য্যের কারণ বোধ করিয়া পরে অভিলষিত কার্য্যের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, উহা অভিলষিত কার্য্যের কারণ নহে কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ। ঘটের প্রতি আকাশ। নৈয়ায়িকগণ শব্দের সমবায়িকারণের নাম আকাশ রাখিয়াছেন—(শব্দ সমবায়ি কারণত্বং আকাশত্বং) অর্থাৎ আকাশকে প্রথমে শব্দের সমবায়ি কারণ রূপে বুঝিয়া পরে ঘটের কারণ রূপে বুঝিতে হয়, অর্থাৎ শব্দের কারণ ঘটের কারণ এই রূপ জ্ঞান করিতে হয়। কিন্তু বিবেচনা কর যে সময় আকাশকে শব্দের কারণ বলিয়া বুঝা যাইতেছে সেই সময় তাহাকে ঘটের কারণ বলিয়া কখনই বুঝা যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত আকাশ শব্দ ভিন্ন আর কোন বস্তুর কারণ নহে কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ।

কেহ কেহ বলেন "অন্যং প্রতি" ইত্যাদি তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ লক্ষণের যদি যথাশ্রুত অর্থ করা যায় (আমরা উপরে যেরূপ অর্থ করিলাম এইরূপ অর্থ করা যায়) তাহা হইলে অপূর্ব্বেরা প্রতি যাগের

---

* দণ্ড শব্দে কুম্ভকারের চক্র ঘুরাইবার লাঠী যথা "কলসে নিজ হেতু দণ্ডজঃ কিমু চক্র ভ্রমিকারিতা গুণঃ?" নৈষধ।

† অপূর্ব্ব কাহাকে বলে তাহা এক প্রকার "অদৃষ্ট" বিষয়ক প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে।

যে সর্ব্ববাদিসম্মত কারণতা আছে তাহার অন্যথা হয়, যাগ অপূর্ব্বের কারণ না হইয়া অন্যথাসিদ্ধ হয়, কারণ যাগ "স্বর্গের কারণ"* প্রথমে এইরূপ বোধ করিয়া পরে অপূর্ব্বের কারণ বলিয়া বোধ করিতে হয়, কিন্তু যে সময় "স্বর্গের কারণ" বলিয়া যাগের বোধ হইতেছে সে সময়ই অপূর্ব্বের কারণ বলিয়া বোধ হইতে পারে না। এই দোষ নিবারণের জন্য তাঁহারা ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, "পূর্ব্ববৃত্তিত্ব ঘটিত রূপেণ যস্য যজ্জনকত্বং তস্য তেন রূপেণ তং প্রত্যন্যথাসিদ্ধত্বম্" "যে পূর্ব্ববৃত্তিত্ব ঘটিত রূপে কোন বস্তুকে এক বস্তুর কারণ বুঝাইবে সেই পূর্ব্ববৃত্তিত্ব ঘটিতরূপে সেই বস্তু অন্য এক বস্তুর কারণ হইতে পারে না কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ হয়।" "স্বর্গের পূর্ব্ববৃত্তি" ("স্বর্গের কারণ") এই রূপে যাগ অপূর্ব্বের কারণ নহে, অন্যথাসিদ্ধ, কিন্তু যাগত্বরূপে অপূর্ব্বের কারণ হইবে তাহাতে বাধা কি? অর্থাৎ যাগ, যে সময় "স্বর্গের কারণ" বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সেই সময় অপূর্ব্বের কারণ বলিয়া প্রতীত না হউক কিন্তু "স্বর্গের কারণ" বলিয়া যাগ যে একবারে অপূর্ব্বের কারণ হইবে না একথা কোন কাজের নহে। এইরূপ আকাশ "শব্দের কারণ" রূপে অন্য বস্তুর কারণ নাই হউক কিন্তু শব্দাশ্রয়রূপে† অন্য বস্তুর কারণ হইতে পারে। আমাদেরও এই রূপ অর্থ অভিপ্রেত। আমরা একথা অবশ্য স্বীকার করি যে কোন বস্তুকে যখন এক বস্তুর কারণ রূপে বোধ করা যায় তখন তাহাকে অবশ্যই অন্য এক বস্তুর কারণ রূপে জানা যাইতে পারে না কিন্তু উহা যে একবারে দ্বিতীয় বস্তুর কারণ হইবে না ইহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নয়। বাস্তবিকও দেখ যে দণ্ড দ্বারা একটি ঘট হইয়াছে তাহা দ্বারা যদি আর ঘট বা হাঁড়ী না গড়া যায় তাহা হইলে কুম্ভকারের আর ব্যবসায় চালাইতে হয় না, সর্ব্বদা দণ্ডের অন্বেষণেই দা হাতে করে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়।

চতুর্থ। "জনকং প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতা অপরিজ্ঞায় ন যস্য গৃহ্যতে" যাহাকে প্রথমে কোন কার্য্যোৎপাদকের কারণ বলে না জানিলে সেই কার্য্যের কারণ রূপে জানা যায় না তাহাও অন্যথাসিদ্ধ। যেমন ঘটের প্রতি "কুম্ভকারের পিতা।" ঘটের কারণ কুম্ভকার, কুম্ভকারের কারণ কুম্ভকারের পিতা। এক্ষণে দেখ কুম্ভকারের পিতা বলিলে প্রথমে তাহাকে

---

* "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যাগের স্বর্গকারিতা (স্বর্গের অভিলাষে যাগ করিবে) সিদ্ধ হইতেছে।

† "শব্দো দ্রব্যাশ্রিতো গুণত্বাৎ" গুণমাত্রেই দ্রব্যে আশ্রিত। শব্দ গুণ অতএব শব্দও দ্রব্যে আশ্রিত, এই অনুমান দ্বারা নৈয়ায়িকেরা আকাশকে শব্দাশ্রয় সিদ্ধ করিয়াছেন। নৈয়ায়িকদিগের মতে আকাশ, দ্রব্য, শব্দ, গুণ।

কুম্ভকারের কারণ বলিয়া বোধ হয় তাহার পর সে কুম্ভকারের কারণ বলিয়া কুম্ভকারকৃত ঘটেরও কারণ এইরূপ বোধ করিয়া, কুম্ভকারের পিতাকে কখনই ঘটের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত নয়। কারণ কুম্ভকারের পিতার সহিত আর কুম্ভকারকৃত ঘটের সহিত কোন এরূপ সম্বন্ধ নাই যে তাহার অবর্ত্তমানে তাহার পুত্রের ঘট গড়িতে কোন ব্যাঘাত হয়, বরং আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে পিতার পরলোক হইলে শ্রাদ্ধে কিছু ঘটা করিবার জন্য কুম্ভকারেরা দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ঘটাদি নির্ম্মাণ করিতে থাকে। এই নিমিত্ত কুম্ভকারের পিতা ঘটের প্রতি কারণ নয় কিন্তু অন্যথা সিদ্ধ।

পঞ্চম। "অতিরিক্ত মথাপি যদ্ভবেন্নিয়তাবশ্যক পূর্ব্বভাবিনঃ" একটী কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে যত গুলি পদার্থের থাকা আবশ্যক তদতিরিক্ত সমুদয়ই অন্যথাসিদ্ধ। যেমন কুম্ভকার যেস্থানে বসিয়া ঘট নির্ম্মাণ করে যদি একটা গর্দ্দভ তাহার এক পার্শ্বে বসিয়া থাকে তাহা হইলে কুম্ভকার যতগুলি ঘট গড়িবে গাধা সে সকলের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি হইলেও কারণ নয় কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ। কারণ গাধা সেস্থলে না থাকিলেও ঘটোৎপত্তির কোন ব্যাঘাত হয় না।

প্রাচীন আচার্য্যেরা এই পাঁচ প্রকার অন্যথা সিদ্ধ বলেন। তাহার পর মণিকার প্রভৃতি কতকগুলি নৈয়ায়িকেরা বলেন অন্যথা সিদ্ধ পাঁচ প্রকার নহে তিন প্রকার। কারণ পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকারের মধ্যে প্রথম আর দ্বিতীয়টীর মধ্যে তাদৃশ প্রভেদ না থাকায় ঐ দুইটি এক বলিলে চলে। এইরূপ তৃতীয়ের সহিত চতুর্থের বিশেষ প্রভেদ না থাকায় তাহাদিগকেও এক বলিলে চলে। নব্যগণ বলেন এই শেষোক্তই অন্যথা সিদ্ধের চুড়ান্ত লক্ষণ, অপর সকল গুলিকে ইহার অন্তর্গত করা যাইতে পারে, অন্যথা সিদ্ধের এই এক মাত্র লক্ষণ করিলে সকল চরিতার্থ হয় অধিক করা বাহুল্য মাত্র। তবে তাঁহারা পঞ্চম লক্ষণের একটু পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল নিয়তাবশ্যক পূর্ব্ববর্ত্তীর অতিরিক্তকে অন্যথাসিদ্ধ না বলিয়া এইরূপ বলেন যে, লঘু অথচ নিয়তাবশ্যক পূর্ব্ববর্ত্তী যে, তাহার অতিরিক্তের নাম অন্যথা সিদ্ধ। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে অবশ্য ক্লিপ্ত অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীর মধ্যে যাহাদের অবচ্ছেদক (বিশেষণতাবচ্ছেদক?) ধর্ম্ম লঘু হইবে তাহারাই কারণ তদতিরিক্ত অন্যথা সিদ্ধ। যেমন প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্বই কারণ অনেক দ্রব্য সমবেতত্ব অন্যথাসিদ্ধ।* কারণ অনেক দ্রব্য সমবেতত্ব অপেক্ষা মহত্ত্ব লঘু।

যাহাহউক "অন্যথাসিদ্ধ" কাহাকে বলে বোধ হয় পাঠকগণ এক প্রকার বুঝিতে পারিলেন। এই অন্যথাসিদ্ধ

* অনেক দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান ধর্ম্মের নাম অনেক দ্রব্য সমবেতত্ব।

ভিন্ন হইয়া কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যে হইবে তাহার নামই কারণ। সংক্ষেপে বলিতে হইলে এই বলিতে হইবে যে যাহা পূর্ব্বে না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না তাহার নাম কারণ। যদি কেবল কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তীকে কারণ বলা যাইত তাহা হইলে কুম্ভকারের গৃহের পার্শ্বস্থিত গর্দ্দভ ঘটের কারণ হইতে পারিত, দিন রাত্রির কারণ হইত, রাত্রি দিনের কারণ হইত,অধিক কি সামান্যতঃ প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত চিকিৎসাকারী মহানুভব ডাক্তরদিগের চিকিৎসাও মৃত্যুর কারণ হইতে পারিত এবং হিন্দুমহিলার* সূতিকা গৃহের পার্শ্বস্থিত ঢেঁকি বা গোগণ সন্তানের জনক (কারণ) বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত।

যাহাহউক পাঠকগণ এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন "অন্যথা সিদ্ধি" শূন্য হইয়া কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে বর্ত্তমান হইবে তাহাকে কারণ বলিয়া আমাদিগের প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ কিরূপ বিশুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ কারণের লক্ষণ করিয়াছেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

হেলেনা কাব্য। সটীক। আনন্দ চন্দ্র মিত্র প্রণীত। ময়মন সিংহ ভারত মিহির যন্ত্রে শ্রীযদুনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১৭৯৮ শক।

বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র কাব্য লিখিয়াছেন—আর বাবু শ্রীনাথ চন্দ তাহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। গ্রন্থ সমালোচনার জন্য আমাদিগের যে একটু প্রবৃত্তি ছিল, শ্রীনাথ বাবুর ভূমিকা পড়িয়া তাহা তিরোহিত হইল। ভূমিকার যে অংশ, আমাদিগের এই অপ্রবৃত্তির কারণ, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"গ্রন্থকারের জীবনী লিখিবার সময় হয় নাই। ইনি একজন বিলক্ষণ মনস্বী এবং প্রতিভাসম্পন্ন লোক। দারিদ্র্যবশতঃ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অগ্নি কখনও ভস্মাচ্ছাদিত থাকে না। সহস্র বাধা সত্ত্বেও ইহার প্রকৃতিদত্ত গুণনিচয় ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সম্প্রতি ইনি শিক্ষালাভার্থ ইউরোপে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। জন্সন যেমন মাতৃপ্রেতকৃত্য নির্ব্বাহের জন্য সপ্তাহমধ্যে রাসেলাস উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ উল্লিখিত বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া এবং দুইখানি উৎকৃষ্ট মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের প্রধান লেখকতার

* ভক্ত হিন্দুগণ প্রায় ঢেঁকিশালা বা গোশালার একপার্শ্বে স্ববংশধরের প্রসব ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া রাখেন।

কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াও তিন মাস মধ্যে এই কাব্য লিখিয়াছেন, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এমন কি গ্রন্থ কলেবরের তিন চতুর্থাংশ লিখিত হইলেই মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি গ্রন্থকারের মনোরথ সংসিদ্ধ হইবে।"

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে লেখক তরুণবয়স্ক—এখনও শিক্ষার্থী—এবং সম্পন্ন ব্যক্তি নহেন—অর্থাভাবে সুশিক্ষায় বঞ্চিত। কাব্য পাঠেও আমরা এ দুইটী কথার পরিচয় পাইয়াছি। তিনি বিলাত যাইবার ইচ্ছুক হইয়াছেন, এবং পাথেয় সংগ্রহের জন্য হেলেনা কাব্যকে বঙ্গসমাজে প্রেরণ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় গ্রন্থের সমুচিত সমালোচনা করিয়া, আমরা তাঁহার মনোরথ ভঙ্গ করিতে অনিচ্ছুক। বিলাত গেলেই বাঙ্গালির ছেলে একটা কিছু হইয়া আইসে—আর কাহারও কিছু হউক না হউক দরজিদিগের কিছু উপকার হয়—অতএব এরূপ মহৎ উদ্দেশ্যের বিঘ্ন করা আমাদের ইচ্ছা নহে। হেলেনা মনুষ্যাকারে গ্রীক্‌দিগকে আসিয়ায় আনিয়াছিল; ভরসা করি তিনি কাব্যাকারে আনন্দ বাবুকে ময়মন সিংহ হইতে ইউরোপে লইয়া ফেলিবেন।

পরন্তু, আমাদিগের দ্বারা এ গ্রন্থ সমালোচিত হইবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই। কেন না, বাবু শ্রীনাথচন্দ্র ময়মনসিংহের জেলা স্কুল হইতে ইহার সমালোচনা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকা হইতে আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"কবিকেশরী মধুসূদন অমিত্রচ্ছন্দে মেঘনাদবধ প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষা যে কেবল আবেশময়ী ললিত পদাবলীর উপযোগী নহে, ইহাতে যে ভেরী তূরী দুন্দুভিধ্বনির সহিত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের চিত্তবিস্ময়কর অপূর্ব্ব চিত্র চিত্রিত হইতে পারে, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালির ভাগ্যে সে সুখ অধিক দিন সহ্য হইল না! অকালে মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে। বাঙ্গালা কাব্য পুনশ্চ আপন পথ চিনিয়া তাহাতেই প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্গীয় কবিগণ আবার যেন মৃদুল মৃদুল মোহন স্বরে বীণাধ্বনি করিতেছেন। বাঙ্গালির হৃদয় আবেশে নৃত্য করিতেছে। আর গীতি কবিতা ভাল লাগে না। অবিরত বীণাধ্বনিতে শ্রবণ তৃপ্ত হয় না, দুই একবার শঙ্খধ্বনি শুনিলে মনে একটুকু সজীবতা জন্মে। মেঘনাদবধের পর এ প্রকৃতির কাব্য বাঙ্গালায় জন্মিল না, বলিতে কি বৃত্রসংহার এবং পলাশির যুদ্ধও গীতি কবিতারই প্রাধান্য ঘটিয়াছে। হেলেনা কাব্য কোন্ শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য, বঙ্গকবিদিগের মধ্যে আনন্দ চন্দ্র কোন্ আসন লাভ করিবেন, তাহা বলিবার সময় হয় নাই; কিন্তু অনেক দিন পরে আমাদের কর্ণে একটি বহুদূরসমানীত শঙ্খধ্বনি প্রবেশ করিল, শ্রবণ পরিতৃপ্ত হইল। অন্যেরও হইবে কি?"

হায়! হেমচন্দ্র! তোমার দশা কি হইবে! তুমি অপূর্ব্ব মহাকাব্য সৃজন করিয়া পায়ের উপর পা দিয়া মনে মনে ভাবিতেছ, তোমার যশ পুরুষানুক্রমে বঙ্গ দেশে ঘোষিবে! কিন্তু হায়! ময়মন সিংহের স্কুলের ছেলে মহলে শাঁক বাজিয়াছে। যেমন শাঁক বাজিয়াছে অমনি তোমার যশঃপক্ষী ডানা বাহির করিয়া ফড়্‌ক্ করিয়া উড়িয়া পলাইয়াছে। তুমি আর বৃথায় কলম ধর।

ফলতঃ শ্রীনাথ বাবুর মত নির্লজ্জ সমালোচক আমরা দেখি নাই—অথবা কেবল বাঙ্গালা সম্বাদপত্রেই দেখিতে পাই। বাস্তবিক এই হেলেনা কাব্য কিছুই নহে—কেবল অপক্ববুদ্ধি অশিক্ষিত ব্যক্তি-রচিত মধুসূদন দত্তের অসার অনুকরণ। লেখকের অনুকরণেও বিশেষ ক্ষমতা নাই—গুণ গুলির অনুকরণ হয় নাই—কিন্তু দোষ গুলির ট্রু কাপি। সেই অনুকরণ-প্রবৃত্তি এত বলবৎ যে ট্রয়ের যুদ্ধে ইন্দিরা ও রাজলক্ষ্মীর শ্রাদ্ধ! কেবল ইহাতে কবি ও সমালোচক সন্তুষ্ট নহেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ত হইল—দালিল, ভানিল, প্রাণিল প্রভৃতি অশ্রুতপূর্ব্ব ক্রিয়াপদও হইল, ফণীন্দ্র করীন্দ্র দেবেন্দ্র ইন্দিরা দম্ভোলি প্রভৃতি শব্দে মাইকেলি শব্দ ঘটাও জুটিয়া গেল—মেঘনাদ বধ হইতে নামিয়া রাজলক্ষ্মী হেলেনা কাব্যে প্রবেশ করিলেন—তবু ট্রু কাপির একটা বাকি রহিল—টীকা কই? হেমবাবু মেঘনাদ বধের টীকা করিয়াছেন—হেলেনারও টীকা চাই। সুতরাং যেমন শুকদেব একেবারে দাড়ি গোঁপ সহিত মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, হেলেনা কাব্যও তেমনি একেবারে সটীক মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইয়াছে। বাবু শ্রীনাথ চন্দ এই টীকার প্রণেতা। কাব্য যেমন হৌক আমরা এই টীকাতেই অধিক আমোদ পাইয়াছি। পাঠকগণকে সে রসে আমরা বঞ্চিত করিব না। কয়েকটি টীকা উদ্ধৃত করিতেছি;—

ডমরুধ্বনি—বীররস পূর্ণ কবিতা।
অস্ত্রের ঝলকে—অস্ত্রের ঝকমকিতে।
গিরিজা গিরিশে হেরি—(কঠিন পদ্য!)
দুর্গা শিবকে দেখিয়া।
বীচিমালা—তরঙ্গমালা
গঙ্গ মহাবলী—মহাবলী গঙ্গা
জলেশের পুরী—বরুণালয়
সৃষ্টিস্থিতি হেতু—সৃষ্টি রক্ষার মূল
উলিসিস্—Ulysses!
কুমার হেন—কার্ত্তিক সদৃশ
আর চাই?

বীণা। (নানা বিষয়িনী কবিতা প্রকাশিনী মাসিক পত্রিকা।) শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত। প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা। আলবার্ট প্রেস—কলিকাতা। ১২৮৫।

পত্রিকাখানি এত ক্ষুদ্রাকার যে আমাদিগের প্রথমে বোধ হইয়াছিল যে এখানি খেলা ঘরের মেগেজিন—অথবা লিলিপট হইতে প্রেরিত হইয়াছে। তার

পর ভাবিলাম যে যখন পত্রিকা খানি কেবল কবিতাময়ী, তখন ইহা যত ছোট হয় ততই ভাল।—আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতার নিন্দা করি না। তিনি উত্তম পদ্য লিখিয়া থাকেন এবং বীণার প্রথম সংখ্যায় যে কবিতা গুলি বাহির হইয়াছে, তাহা সুমিষ্ট। উদাহরণ—

১

প্রণমি' বাণীর পদে, এ ভাঙ্গা বীণায়
এই ত বাঁধিনু তার, কিন্তু কে বাজায়?
চারিদিকে চেয়ে আজ,
সভয়ে বীণায় সাজ
চড়া'য়ে মিলানু সুর অঙ্গুলির ঘায়;
যা'জানি—করিনু তাই;—কিন্তু কে বাজায়?

২

সে দিনের কথা মনে জাগিয়া উঠিল;
কি সে 'কথা'?—'মহাবজ্র মস্তকে পড়িল!'
এ বজ্র ইন্দ্রের নয়,
এ বজ্র লৌহের নয়,
এ বজ্র বিষম বজ্র!—হায়, কে গড়িল?
অই যা,—বীণার তার আবার ছিঁড়িল!

৩

ছি ছি রে, এ কা'র কাজ,
কি করি' সে ভুলি' লাজ,
গড়িল এ ভীম বাজ,
সে কি দয়াহীন?
তা'রি এ বজ্রের ঘায়,
কি ক'ব রে, হায় হায়!
ভেঙ্গেছে সাধের মোর
আদরের বীণ!

৪

নিতান্ত বিষণ্ণ হ'য়ে,
ভাঙ্গা বীণা করে ল'য়ে,
যোড়েতাড়ে সাজাইনু
বাজা'তে আবার;
মনে আশা,—বাজা'বার,
কিন্তু কি বাজা'ব আর,
সভয়ে অঙ্গুলি-ঘায়
ছিঁড়ে যায় তার!

৫

ছিঁড়ুক যতই বার,
আমিও ততই বার
যতনে বাঁধি না তার?—
দেখি না কি হয়?
ফুরা'লে ধাতুর তার,
উপাড়িয়া কেশভার
বাঁধিব বীণায় ফের,
দেখি কি না রয়?

৬

তাও যদি ছিঁড়ে যায়,
শিরা ছিঁড়ে পুনরায়
বাঁধিব বীণায়, মোর
যতক্ষণ প্রাণ;
তথাপি ক্ষণেক তরে
ফেলিব না ভূমি'পরে
বীণারে;—হৃদয়ে ধ'রে
গা'ব আজি গান।

কবিতা সুমিষ্ট—কিন্তু পদ্যময়ী পত্রিকার আমরা বড় গোঁড়া হইতে পারিলাম না।

বঙ্গদর্শন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

রাজসিংহ।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাণা অনন্ত মিশ্রকে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন অনন্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল না। অশ্বারোহীর যোদ্ধৃবেশ এবং তীব্র দৃষ্টিতে তিনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। একবার ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইয়া, ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন—কিন্তু আর সব হারাইয়াছেন—চঞ্চলকুমারীর আশা ভরসা হারাইয়াছেন—আর কি বলিয়া তাহার কাছে মুখ দেখাইবেন? ব্রাহ্মণ এই রূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন পর্ব্বতের উপরে দুই তিন জন লোক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন; মনে করিলেন, আবার নূতন দস্যুসম্প্রদায় আসিয়া উপস্থিত হইল না কি? সেবার—নিকটে যাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দস্যুরা তাঁহার প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল—এবার যদি ইহারা তাঁহাকে ধরে তবে কি দিয়া প্রাণ রাখিব? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, যে পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তিরা হস্তপ্রসারণ করিয়া তাহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র, ব্রাহ্মণের যে কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল—ব্রাহ্মণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে পর্ব্বতবিহারীদিগের মধ্যে একজন পর্ব্বত অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল—দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন ধর ধর করিয়া তিন চারি জন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। ব্রাহ্মণও ছুটিল—অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে পলাইল। যাহারা

তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ছিল, তাহারা তাহাকে শেষে আর না দেখিতে পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

তাঁহারা অপর কেহই নহে—মহারাণার ভৃত্যবর্গ। মহারাণার সহিত এস্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে। রাজপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ, অদ্য মহারাণা শত অশ্বারোহী এবং ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা শিকারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ, সর্ব্বদা প্রহরিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন না। কখন কখন অনুচরবর্গকে দূরে রাখিয়া একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছদ্মবেশে প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল; স্বচক্ষে সকল দেখিতেন, স্বহস্তে সকল দুঃখ নিবারণ করিতেন।

অদ্য মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি অনুচরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, বিজয়নামা দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনন্ত মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে। রাজা দস্যুর কৃত অত্যাচার শুনিয়া স্বহস্তে ব্রহ্মস্ব উদ্ধারের জন্য ছুটিয়াছিলেন। যাহা দুঃসাধ্য এবং বিপদ্‌পূর্ণ তাহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল।

এদিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া কতিপয় রাজভৃত্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিল। নীচে অবতরণকালে দেখিল রাণার অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ইহাতে তাহারা বিস্মিত এবং চিন্তিত হইল। আশঙ্কা করিল যে রাণার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। নিম্নে শিলাখণ্ডোপরি অনন্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু জানিবে। সেই জন্য তাহারা হস্তপ্রসারণ করিয়া সে দিকে দেখাইয়া দিতেছিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা বাদ করিবার জন্য তাহারা নামিতেছিল, এমত সময়ে ঠাকুরজি নারায়ণ স্মরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন তাহারা ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী। এই ভাবিয়া তাহারা পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ এক গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

এদিকে মহারাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া অনন্ত মিশ্রের তল্লাসে গেলেন। দেখিলেন সেখানে ব্রাহ্মণ নাই—তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ভৃত্যবর্গ, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহিগণ আসিয়া অধিত্যকার তলদেশ ব্যাপিত করিয়াছে। রাণাকে দেখিতে পাইয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিজয়, প্রভুকে দেখিতে পাইয়া, তিন লম্ফে অবতরণ করিয়া তাঁ-

ন্নর কাছে দাড়াইল। রাণা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বস্ত্র রুধিরাক্ত দেখিয়া সকলেই বুঝিল, যে একটা কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজপুতগণের ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

রাণা কহিলেন, "এইখানে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল; সে কোথায় গেল—কেহ দেখিয়াছ?"

যাহারা উহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল তাহারা বলিল; "মহারাজ সে ব্যক্তি পলাইয়াছে।"

রাণা। শীঘ্র তাহার সন্ধান করিয়া লইয়া আইস।

ভৃত্যগণ তখন সবিশেষ কথা বুঝাইয়া নিবেদন করিল, যে আমরা অনেক সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই।

অশ্বারোহিগণ মধ্যে রাণার পুত্রদ্বয়, তাঁহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি ছিল। রাজা পুত্রদ্বয় ও অমাত্যবর্গকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আর সকলকে বলিলেন,

"প্রিয়জনবর্গ! আজি অধিক বেলা হইয়াছে; তোমাদিগের সকলের ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করা, আমাদিগের অদৃষ্টে নাই। এই পার্ব্বত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। একটু ক্ষুদ্র লড়াই জুটিয়াছে—লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে আমার সঙ্গে আইস—আমি এই পর্ব্বত পুনরারোহণ করিব। যাহার সাধ না থাকে, উদয়পুরে ফিরিয়া যাও।"

এই বলিয়া রাণা পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন; অমনি "জয় মহারাণা কি জয়! জয় মাতা জী কি জয়!" বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাতে পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপরে উঠিয়া হর! হর! হর! শব্দে, রূপনগরের পথে ধাবিত হইল। অশ্বক্ষুরের আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

এদিকে অনন্ত মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার তিন চারি দিন পরে রূপনগরে মহাধূম পড়িয়াছিল। মোগল বাদশাহের দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা রূপনগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে।

নির্ম্মলের মুখ শুকাইল; দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে সখি?"

চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসের কি হইবে?"

নির্ম্মল। তোমাকে ত লইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই ত সে দিন ঠাকুরজি উদয়পুর গিয়াছেন—এখনও তিনি পৌঁছিতে পারেন নাই। রাজসিংহের উত্তর

আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে—কি হইবে সখি ?

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই—কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ—সে বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। সুতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই।" একবার কেবল আমি পিতাকে অনুরোধ করিব —যদি মোগল সেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন।

চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন, যে "আমি জন্মের মত রূপনগর হইতে চলিলাম। আমি আর কখন যে আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব, আর কখন যে বাল্য সখীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব এমত সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাত দিনের অবসর ভিক্ষা করি—সাতদিন মোগল সেনা এইখানে অবস্থিতি করুক। আর সাত দিন আমি আপনাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হইব।"

রাজা একটু কাঁদিলেন। বলিলেন, "দেখি সেনাপতিকে অনুরোধ করিব কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না বলিতে পারি না।"

রাজা অঙ্গীকার মত মোগল সেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন। সেনাপতি ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন সময় নিরূপিত করিয়া দেন নাই —বলিয়া দেন নাই যে এতদ্দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সাত দিন বিলম্ব করিতে তাঁহার সাহস হইল না; ভবিষ্যৎ বেগমের অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করিতেও পারিলেন না। আর তিন দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন। চঞ্চলকুমারীর বড় একটা ভরসা জন্মিল না।

নিশীথকালে, নিদ্রার ঘোরে, চঞ্চলকুমারী স্বপ্ন দেখিলেন, যে রজতগিরিসন্নিভ মহাকায়, বৃষভারূঢ়, স্নিগ্ধমূর্ত্তি, জটাজূটসমন্বিত, দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সম্মুখে মূর্ত্তিমান্। তিনি আজ্ঞা-করিতেছেন, "তুমি কালি হইতে ভক্তি ভাবে আমার পূজা করিবে। বৎসর কাল প্রত্যহ তুমি আমার পূজা করিবে। সেই বৎসর মধ্যে তোমার বিবাহ হইবে না। তাহার পর, উপযুক্ত সময়ে তোমার বিবাহ হইবে। যদি একবৎসর ভক্তিভাবে পূজা কর, তবে অভীপ্সিত স্বামী পাইবে, ভক্তির ত্রুটি হইলে অনভিমত স্বামীর হস্তে পড়িবে।" এই বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন।

প্রভাতে উঠিয়া, স্নান করিয়া চঞ্চলকুমারী যত্নসঞ্চিত গঙ্গাজল লইয়া, মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এবং প্রণাম করত ভক্তিভাবে দেবাদিদেবের পূজা করিলেন। স্বপ্নের কথা কাহাকে বলিলেন না।

যে তিনদিন রাজকুমারী রূপনগরে অবস্থিতি করিলেন, সে তিন দিন, তিনি ঐরূপে শিবপূজা করিলেন। কিন্তু

উদয়পুর হইতে কোন সম্বাদ আসিল না—মিশ্রঠাকুর ফিরিলেন না। তখন চঞ্চলকুমারী ঊর্দ্ধমুখে, যুক্ত করে বলিল, "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে কি প্রবঞ্চনা করিলে?"

তৃতীয় রজনীতে নির্ম্মল আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুই জনে দুইজনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইল। নির্ম্মল বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" কয়দিন ধরিয়া সে এই কথাই বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে? আমি মরিতে যাইতেছি।" নির্ম্মল বলিল "আমিও মরিব। তুমি আমায় ফেলিয়া গেলেই কি আমি বাঁচিব?" চঞ্চল বলিল, "ছি! অমন কথা বলিও না—আমার দুঃখের উপর কেন দুঃখ বাড়াও?" নির্ম্মল বলিল, "তুমি আমাকে লইয়া যাও বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব—কেহ রাখিতে পারিবে না।" দুইজনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল।

এদিকে, সৈয়দ হাসান আলি খাঁ, মনসবদার মোগল সৈন্যের সেনাপতি, রাত্রি প্রভাতে রাজকুমারীকে লইয়া যাইবার সকল উদ্যোগ করিয়া রাখিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে, একবার মাণিকলালের কথা পাড়িতে হইল।

মাণিকলাল রাণার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, প্রথমে আবার সেই পর্ব্বতগুহায় ফিরিয়া গেল। আর সে দস্যুতা করিবে, এমত বাসনা ছিল না, কিন্তু পূর্ব্ববন্ধুগণ মরিল কি বাঁচিল তাহা দেখিবে না কেন? যদি কেহ একেবারে না মরিয়া থাকে তবে তাহার শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল গুহাপ্রবেশ করিল।

দেখিল, দুইজন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সে সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মাণিকলাল তখন বিষণ্ণচিত্তে বন হইতে একরাশি কাট ভাঙ্গিয়া আনিল—তদ্দ্বারা দুইটি চিতা রচনা করিয়া দুইটি মৃতদেহ তদুপরি স্থাপন করিল। গুহাহইতে প্রস্তর ও লৌহ বাহির করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন পূর্ব্বক চিতায় আগুন দিল। এইরূপ সঙ্গীদিগের অন্তিম কার্য্য করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। পরে মনে করিল যে, যে ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আসি। যেখানে অনন্ত মিশ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই। দেখিল স্বচ্ছসলিলা পার্ব্বত্য নদীর জল একটু ময়লা হইয়াছে—এবং অনেক স্থানে বৃক্ষশাখা, লতা গুল্ম তৃণাদি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। এই সকল চিহ্নে মাণিকলাল মনে করিল যে, এখানে বোধ হয় অনেক লোক আসিয়াছিল। তার পর দেখিল,

পাহাড়ের প্রস্তরময় অঙ্গেও কতকগুলি অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়—বিশেষ অশ্বের ক্ষুরে যেখানে লতা গুল্ম কাটিয়া গিয়াছে, সেখানে অর্দ্ধ গোলাকৃত চিহ্ন সকল স্পষ্ট। মাণিকলাল মনোযোগ পূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল যে এখানে অনেক গুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল।

চতুর মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল অশ্বারোহিগণ কোন্‌দিক্ হইতে আসিয়াছে—কোন্‌দিকে গিয়াছে। দেখিল কতকগুলি চিহ্নের সম্মুখ দক্ষিণে —কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে। কতক দূর মাত্র দক্ষিণ গিয়া চিহ্ন সকল আবার উত্তরমুখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিল অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্য্যন্ত আসিয়া আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল। সে স্থান হইতে মাণিকলালের গৃহ দুই তিন ক্রোশ। তথায় রন্ধন করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে, কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইল। তখন মাণিকলাল ঘরে চাবি দিয়া কন্যা ক্রোড়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসীর ননদের যায়ের খুল্যতাত পুত্রী ছিল। সম্বন্ধ বড় নিকট—"সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বনপো বউয়ের বনঝি জামাই" প্রায়। সৌজন্যবশতই হউক আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিতেন।

মাণিকলাল কন্যা লইয়া সেই পিসীর বাড়ী গেল। ডাকিল,

"পিসি গা?"

পিসী বলিল, "কি বাছা মাণিকলাল! কি মনে করিয়া?"

মাণিকলাল বলিল, "আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার পিসি?"

পিসী। কতক্ষণের জন্য?

মাণিক। এই দুমাস ছয়মাসের জন্য?

পিসী। সে কি বাছা! আমি গরীব মানুষ—মেয়েকে খাওয়াব কোথা হইতে?

মাণি। কেন পিসী মা, তুমি কিসের গরীব? তুমি কি নাতিনীকে দুমাস খাওয়াতে পার না?

পিসী। সে কি কথা? দুমাস একটা মেয়ে পোষিতে যে এক মোহর পড়ে।

মাণিক। আচ্ছা আমি সে এক মোহর দিতেছি—তুমি মেয়েটিকে দুমাস রাখ। আমি উদয়পুরে যাইব—সেখানে আমি রাজসরকারে বড় চাকরি পাইয়াছি। এই বলিয়া মাণিকলাল, রাণার প্রদত্ত আশরাফির মধ্যে একটা পিসীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল; এবং কন্যাকে তাহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "যা! তোর দিদির কোলে গিয়া বস্।"

পিসীঠাকুরাণী কিছু লোভে পড়িলেন। মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেন যে এক মোহরে ঐ শিশুর একবৎসর

গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে—মাণিকলাল কেবল দুই মাসের করার করিতেছে। অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা। তার পর মাণিক রাজদরবারে চাকরি স্বীকার করিয়াছে—চাহি কি বড়মানুষ হইতে পারে—তা হইলে কি পিসীকে কখন কিছু দিবে না? মানুষটা হাতে থাকা ভাল।

পিসী তখন মোহরটী কুড়াইয়া লইয়া বলিল "তার আশ্চর্য্য কি বাছা—তোমার মেয়ে মানুষ করিব সে কি বড় ভারি কাজ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আয় রে জান্ আয়!" বলিয়া পিসী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল।

কন্যা সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিন্ত চিত্তে গ্রাম হইতে নির্গত হইল। কাহাকে কিছু না বলিয়া রূপনগরে যাইবার পার্ব্বত্যপথে আরোহণ করিল।

মাণিকলাল, এইরূপ বিচার করিতেছিল। ঐ অধিত্যকায় অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল কেন? ঐখানে রাণাও একাকী ভ্রমিতে ছিলেন—কিন্তু উদয়পুর হইতে এতদূর রাণা একাকী আসিবার সম্ভাবনা নাই। অতএবউহারা রাণার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী। তার পর,দেখা গেল উহারা উত্তর হইতে আসিয়াছে—উদয়পুর অভিমুখে যাইতেছিল—বোধ হয় রাণা মৃগয়া বা বনবিহারে গিয়া থাকিবেন—উদয়পুর ফিরিয়া যাইতেছিলেন। তার পর দেখিলাম, উহারা উদয়পুর যায় নাই। উত্তরমুখেই ফিরিয়াছে—কেন? উত্তরে ত রূপনগর বটে। বোধ হয় চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন তবে তাঁহার রাজপুতপতি নাম মিথ্যা। আমি তাঁহার ভৃত্য—আমি তাঁহার কাছে যাইব।

কিন্তু তাঁহারা অশ্বারোহণে গিয়াছেন—আমার পদব্রজে যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তবে এক ভরসা পার্ব্বত্যপথে অশ্ব তত দ্রুত যায় না। এবং মাণিকলাল পদব্রজে বড় দ্রুতগামী। মাণিকলাল দিবা রাত্রি পথ চলিতে লাগিল। যথাকালে সে রূপনগরে পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল যে রূপনগরে দুই সহস্র মোগল অশ্বারোহী আসিয়া শিবির করিয়াছে কিন্তু রাজপুত সেনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আরও শুনিল পরদিন প্রভাতে মোগলেরা রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে।

মাণিকলাল বুদ্ধিতে একটি ক্ষুদ্রতর সেনাপতি। রাজপুতগণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই দুঃখিত হইল না। মনে মনে বলিল, মোগল পারিবে না—কিন্তু আমি প্রভুর সন্ধান করিয়া লইব।

একব্যক্তি নাগরিককে বলিল, আমাকে দিল্লী যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পার? আমি কিছু বখশিস দিব। নাগরিক সম্মত হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া

তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিল, পরে দিল্লীর পথে, চারিদিক্ ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়া ছিল, যে রাজপুত অশ্বারোহিগণ অবশ্য দিল্লীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছুদূর পর্য্যন্ত মাণিকলাল রাজপুত সেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে একস্থানে দেখিল, পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। দুই পার্শ্বে দুইটী পাহাড় উঠিয়া, প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ সমান্তরালে হইয়া চলিয়াছে—মধ্যে কেবল সঙ্কীর্ণ পথ। দক্ষিণদিকে পর্ব্বত অতি উচ্চ—এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখর দেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বামদিকে পর্ব্বত, অতি ধীরে২ উঠিয়াছে। আরোহণের সুবিধা, এবং পর্ব্বতও অনুচ্চ। একস্থানে ঐ বামদিকে, একটি রন্ধ্র বাহির হইয়াছে তাহা দিয়া একটু সূক্ষ্ম পথ আছে।

নাপোলেয়ন্ প্রভৃতি অনেক দস্যু সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাজা হইলে লোকে আর দস্যু বলে না। মাণিকলাল রাজা নহে—সুতরাং আমরা তাহাকে দস্যু বলিতে বাধ্য, কিন্তু রাজদস্যুদিগের ন্যায় এই ক্ষুদ্র দস্যুরও সেনাপতির চক্ষু ছিল। পর্ব্বতনিরুদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়া সে মনে করিল, রাণা যদি আসিয়া থাকেন তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগল সৈন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইবে—এই পর্ব্বতশিখর হইতে রাজপুত অশ্ব বাজের ন্যায় তাহাদিগের মস্তকে পড়িতে পারিবে। দক্ষিণদিকের পর্ব্বত দুরারোহণীয়, অশ্বারোহিগণের আরোহণ ও অবতরণের অনুপযুক্ত, অতএব সেখানে রাজপুতসেনা থাকিবে না—কিন্তু বামের পর্ব্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় সুখ। মাণিকলাল তদুপরি আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

উঠিয়া কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইল না। মনে করিল, খুঁজিয়া দেখি, কিন্তু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আর কোন রাজপুত আমাকে চিনে না; আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য রাজপুত আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেইস্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাণার জয় হউক!"

এই শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র চারি পাঁচজন শস্ত্রধারী রাজপুত অদৃশ্য স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইল, এবং তরবারি হস্তে মাণিকলালকে কাটিতে আসিতে উদ্যত হইল।

একজন বলিল, "মারিও না।" মাণিকলাল দেখিল, স্বয়ং রাণা।

রাণা বলিল, "মারিও না। এ আমাদিগের স্বজন।" যোদ্ধৃগণ তখনই আবার লুক্কায়িত হইল।

রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল। এক নিভৃত স্থলে তাহাকে বসিতে বলিয়া, স্বয়ং সেই

খানে বসিলেন। রাণা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

মাণিকলাল বলিল, "প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে। বিশেষ যখন আপনি এরূপ বিপদজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোনও কার্য্যে লাগে, এই ভরসায় আসিয়াছি। মোগলেরা দুই সহস্র—মহারাজের সঙ্গে এক শত। আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন—একদিনেই কি তাহা ভুলিব?"

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে এখানে আসিযাছি তুমি কি প্রকারে জানিলে?"

মাণিকলাল তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। শুনিয়া রাণা সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "আসিয়াছ ভালই করিয়াছ—আমি তোমার মত সুচতুর লোক একজন খুঁজিতেছিলাম। আমি যাহা বলি পারিবে?"

মাণিকলাল বলিল, "মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহা করিব।"

রাজা বলিলেন, "আমরা একশত যোদ্ধামাত্র; মোগলের সঙ্গে দুই হাজার—আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না। যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। রাজকন্যাকে আগে বাঁচাইয়া পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে

থ

পারেন। তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি ক্ষুদ্রজীব, আমি সে সকল কি প্রকারে বুঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে তাহাই আজ্ঞা করুন।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগল সেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে। এবং যাহা যাহা বলিতেছি তাহা করিতে হইবে।" রাণা তাহাকে সবিস্তারিত উপদেশ দিলেন। মাণিকলাল শুনিয়া বলিলেন,

"মহারাজের জয় হউক! আমি কার্য্য সিদ্ধ করিব। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া একটী ঘোড়া বক্সিস করুন।"

রাণা। আমরা একশত যোদ্ধা এক শত ঘোড়া। আর ঘোড়া নাই যে তোমায় দিই। অন্য কাহারও ঘোড়া দিতে পারিব না—আমার ঘোড়া লইতে পার।

মাণিক। তাহা প্রাণ থাকিতে লইব না। আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাণা। কোথা পাইব? যাহা আছে তাহাতে আমাদের নিকট কুলায় না। কাহাকে নিরস্ত্র করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব? আমার হাতিয়ার লইতে পার।

মাণিক। তাহা হইতে পারে না। আমাকে পোষাক দিতে আজ্ঞা হউক।

রাণা। এখানে যাহা পরিয়া আসি-

যাচি, তাহা ভিন্ন আর পোষাক নাই। আমি কিছুই দিব না।

মাণিক। মহারাজ! তবে অনুমতি দিউন আমি যে প্রকারে হউক এসকল সংগ্রহ করিয়া লই।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "চুরি করিবে?"

মাণিকলাল জিহ্বা কাটিল। "আমি শপথ করিয়াছি, যে আর সে কার্য্য করিব না।"

রাণা। তবে কি করিবে?

মাণিক। ঠকাইয়া লইব।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন,

"যুদ্ধ কালে সকলেই চোর—সকলেই বঞ্চক। দেখ আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি—চোরের মত লুকাইয়া আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ করিও।"

মাণিকলাল প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

তর্কসংগ্রহ।

পঞ্চম তর্ক—কারণ কি?

রিড প্রভৃতি ইউরোপীয় নবদর্শনবিদ্‌দিগের মত এই যে বস্তুর উৎপাদক বা মূল কারণ কিছুই নাই, তবে একটি বস্তু পূর্ব্বে থাকিলে আর একটি বস্তু পরে হয়। আমরা ইহাই দেখিতে দেখিতে পরিশেষে ইহাও স্থির করিতে পারি যে, অমুক বস্তু পূর্ব্বে থাকিলে অমুক বস্তু উৎপন্ন হয়, কার্য্যকারণ সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কিছুই জানিতে পারি না। হিউম বলিয়াছেন যে, কারণ শব্দের অর্থই কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এতদ্ভিন্ন আর কিছুই কারণ নাই।*

কোমৎ বলেন জগতীয় কার্য্যসম্বন্ধে আমরা কেবল কতকগুলি নিয়ম অবগত আছি, অমুক ঘটনা হইলে অমুক ঘটনা হয় ইত্যাদি। কিন্তু সেই কার্য্যকলাপের নৈসর্গিকভাব কিম্বা তাহাদের মূল বা উৎপাদক কারণের বিষয় আমরা কিছুই জানি না এবং সে সকল জানিবার আমাদের অধিকারও নাই।

"The laws of phœnomena are all we know respeetiong them, their essential nature and their ultimate causes, either efficent or final are unknown and inscrutable to us."—*Mill.*

ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে কারণের বিশুদ্ধ লক্ষণের অভাব থাকায়

* Cause, as be interprets *it* meores the invoriable *antecedent.*

একটি বিশুদ্ধ কারণের লক্ষণ প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক তর্ক এবং পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইলেও একখানি বৃহদ্গ্রন্থে স্থান পায় না। আর আমাদের সংস্কৃত ন্যায় শাস্ত্রে যখন বিশুদ্ধ কারণের লক্ষণ রহিয়াছে, তখন আর ইহা লইয়া পুস্তক বাড়াইবার প্রয়োজন কি ?

ডাক্তার ব্যালান্টাইন সাহেব তাঁহার " Method of Induction" নামক পুস্তকে কারণ নির্ণয় স্থলে বলিয়াছেন এক একটী কার্য্যের পূর্ব্বে যে এক একটী বস্তু থাকিবে তাহার কোন নিয়ম নাই। সর্ব্বত্রই অনেকগুলি বস্তু পূর্ব্বে মিলিত হইয়া একটী কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। তবে আমরা যে অনেক স্থানে এক একটীকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি তাহার প্রতি হেতু এই যে, একটী কার্য্য উৎপন্ন হইতে যে সকল ঘটনার পূর্ব্বে থাকা আবশ্যক তাহারা সকলেই যে ঠিক্ অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে সংঘটিত হয়, তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অনেক পূর্ব্বকাল হইতে সঞ্চিত হইতে থাকে। এইরূপ সঞ্চিত হইতে হইতে উহাদিগের মধ্যে যেটী কার্য্যের ঠিক্ অব্যবহিত পূর্ব্বে সংঘটিত হয় তাহাকেই আমরা কারণ বলিয়া গণনা করি। যেমন কোন ব্যক্তিকে দুর্গোৎসব বা আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া আমরা তাহার সেই ভোজনকে তাদৃশ কার্য্যের কারণ মনে করিয়া এই বলিয়া খেদ করি "আহা! ব্রাহ্মণ পেটের দায়ে প্রাণটা হারালে গা।" কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে কেবল ভোজনই যে মৃত্যুর কারণ তাহা কখনই হইতে পারে না। ইহার পূর্ব্বে অবশ্যই ঐ ব্যক্তির শরীরে এরূপ কোন ব্যাধির সঞ্চার হইয়া থাকিবে যাহার সহিত ঐ ভোজন মিলিত হইয়া একবারে মৃত্যুর উৎপাদক হইল।

এখানে এ কথা বলা আবশ্যক হইতেছে যে, যেমন বিশেষ বিশেষ বস্তু পূর্ব্বে থাকিলে বিশেষ বিশেষ কার্য্য উৎপন্ন হয় সেইরূপ বিশেষ বিশেষ বস্তু পূর্ব্বে থাকিলে আবার কোন কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না, উহাদিগকে কার্য্যের প্রতিবন্ধক বলা যায়। এই প্রতিবন্ধক যখন কারণের অপেক্ষা অধিক বলশালী হয় তখনকার ত কথাই নাই, উহা কারণের সহিত তুল্য বল হইলেও কার্য্যোৎপত্তি হয় না। যেমন কোন বস্তুর উপর যে দিকে বল প্রয়োগ করা যায় বস্তু তদভিমুখেই গমন করে, কিন্তু বস্তুর দুই বিপরীত দিকে তুল্য বল প্রয়োগ করিলে বস্তু কোন দিকেই গমন করে না এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা এই স্থির হইতেছে যে একটী কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যেমন কোন কোন বস্তুর থাকা আবশ্যক করে সেইরূপ একটী কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কোন বস্তুর না থাকাও আবশ্যক করে। দেখ পূর্ব্বোক্ত স্থির অবস্থাপ্রাপ্ত বস্তু হইতে যদি

একতর দিকের বল উদ্ঘাটন করা হয়, তাহা হইলে বস্তুর অন্যতর দিকে গতি হয়। অতএব পূর্ব্বভাবের (থাকার) ন্যায় পূর্ব্বাভাবও (পূর্ব্বে না থাকাও) কার্য্যের কারণ হইতে পারে এই নিমিত্ত বৈশেষিক সূত্রের উপস্কারকার শঙ্কর মিশ্র দুই প্রকার কারণ লক্ষণ করিয়াছেন যথা—

"অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তি জাতীয়ত্বং সহকারী বৈকল্য প্রযুক্ত কার্য্যাভাববত্বং বা কারণত্বম্।"

অভাবের কারণতা দেখাইবার জন্য আমরা আর দুই একটি উদাহরণ দেখাইতে বাধ্য হইলাম। যেমন দুঃখের অভাব হইলে সুখ হয়, শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের অভাব হইলে পীড়া হয় এবং সম্পদের অভাব হইলে এই চতুর্দ্দিকে আত্মীয় পূর্ণ সুখময় সংসারও একবারে মহাকাশের ন্যায় শূন্যময় হইয়া উঠে।

যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে সকল কারণই যে কার্য্যের পূর্ব্বে থাকে তাহা নয়, অনেক কারণকে কার্য্যের সহিত একত্র উৎপন্ন, এবং এক সময় অবস্থিত হইতে দেখা যায়। যেমন গাত্রোত্তাপের কারণ জ্বর ও গাত্রোত্তাপ একসঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং যতক্ষণ গাত্রোত্তাপ থাকে ততক্ষণই জ্বর থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাস আগত হইবামাত্র বাঙ্গালাদেশে অম্র পাকিতে থাকে, যতকাল জ্যৈষ্ঠ মাস ততকালই পাকা অম্র। আবার যেমন জ্যৈষ্ঠমাস ফুরায় অমনি বাঙ্গালাদেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতার আনন্দের সহিত পাকা আমও অন্তর্হিত হয়। অতএব কারণ যে কেবল কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে ইহা কিরূপে নিয়ম করা যাইতে পারে?

ইহার উত্তরে আমরা বলিব জ্বর গাত্রোত্তাপের কারণ নয়; জ্যৈষ্ঠ মাসও আম পাকিবার কারণ নয়। তবে যে কারণে জ্বর হয় সেই কারণেই গাত্রোত্তাপ হয় এবং বাঙ্গালা দেশে জ্যৈষ্ঠ মাস হইলে আম পাকিবার কারণ উপস্থিত হয়। গাত্রোত্তাপ জ্বরের কার্য্য নয় কিন্তু তদ্ব্যাঞ্জক চিহ্ন। গাত্রোত্তাপ এবং আম পাকিবার যাহাই কারণ হউক তাহাদের কার্য্যের সহিত সমকালাবস্থিতির বিষয়ে অনেকে অনেকরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যখন আমরা দেখি একটি কার্য্য অনেকক্ষণ স্থিতি করে, তখন যে কারণে উহা প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছে সেই কারণও তাহার সহিত বরাবর অবস্থিতি করে। যেমন যে কারণে আকাশস্থিত গ্রহনক্ষত্রগণ একবার সঞ্চালিত হইয়াছে সেই কারণ বরাবর আছে বলিয়াই উহাদিগের একরূপে গতি হইতেছে। যেরূপ বায়ুমণ্ডলীর ভারে তাপমান যন্ত্রস্থিত পারদ যে অংশে উপস্থিত হয় যতক্ষণ সেইরূপ ভার থাকে ততক্ষণ পারদও সেই অংশে থাকে, ভারের ব্যত্যয় হইলে পারদের স্থিতিরও ব্যত্যয় হয়, এইরূপ যতক্ষণ বন্ধন থাকে

বন্ধন জন্য ক্লেশও ততক্ষণ, বন্ধন মোচন হইলে তজ্জন্য ক্লেশও নির্গত হয়। ইহার উপর কেহ কেহ বলিয়াছেন "কার্য্যের অনেকক্ষণের স্থিতির নিমিত্ত তদীয় কারণও যে তাহার সহিত থাকা আবশ্যক করে এরূপ অনুমান ঠিক্ নহে। ইহাতে সম্প্রতিপক্ষতা দোষ লক্ষিত হইতেছে। দেখ পড়ন্ত রৌদ্রে বেড়াইলে শিরঃপীড়া হয়; শিরঃপীড়া সমস্ত রাত্রি থাকিতে পারে কিন্তু পড়ন্ত রৌদ্র তৎক্ষণাৎই অস্তগত হয়। কর্ম্মকারের যেরূপ যন্ত্রে একখানি অস্ত্র প্রস্তুত হয় সেই অস্ত্র খানিকে কিছুকাল রাখিবার জন্য কিছু সেইরূপ অগ্নির সেক বা সেইরূপ মুদ্গরের আঘাত করিতে হয় না। অপরে বলিয়াছেন যে সকল কার্য্যের কারণ অভাব ধর্ম্মী তদ্ভিন্ন প্রায় কোন কার্য্যেরই অবস্থিতির সহিত তাহার কারণের অবস্থিতির আবশ্যক করে না। একটী কার্য্য একবার উৎপন্ন হইয়া ততক্ষণ অবধি অবস্থান করিতে সক্ষম হয়, যতক্ষণ অবধি তাহার নাশ বা পরিবর্ত্তনের কারণ উপস্থিত না হয়।

আমাদিগের নৈয়ায়িকেরা বলেন ঘটাদি কার্য্যের অবস্থিতির জন্য কেবল তাহাদের অসমবায়িকারণের অবস্থিতি আবশ্যক করে। অনেকে আবার বলিয়াছেন যেখানে কার্য্যকারণকে এক সময় অবস্থিতি করিতে দেখা যায়, সে স্থলে একটী কার্য্যকে একটি কারণের সহিত একত্র অবস্থিত এরূপ ভাবা উচিত নহে। সে স্থলে এইরূপ বিবেচনা করা উচিত যে ঐ সময়ের প্রতিক্ষণে এরূপ কারণের সংঘটন হওয়াতে একরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন ভাল, এ সকল স্থলে তুমি কোনমতে যেন কারণের কার্য্যপূর্ব্ববর্ত্তিতা রক্ষা করিলে কিন্তু "বাঙ্গালিরা কোন সাহেবের চাকরী করিবার কারণ ইংরেজীবিদ্যা অধ্যয়ন করেন" "অমুক ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনের কারণ কলিকাতায় যাইতেছে" ইত্যাদি বাক্যে চাকরী করার কারণ ইংরেজী পড়া, এবং অর্থোপার্জ্জনের কারণ কলিকাতায় যাওয়া সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে। কিন্তু ঐ সকল কারণ কার্য্যের পূর্ব্বে ত কখনই ঘটে না পরে সংঘটিত হয় কি না তদ্বিষয়েও সম্পূর্ণ সন্দেহ; অতএব এ স্থলে তুমি কিরূপে লক্ষণ সমন্বয় করিবে?

ইহার উত্তরে আমরা বলিব উহারা কারণশব্দে ব্যবহার হয় এই মাত্র, বাস্তবিক উহারা কারণ নয়। ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গৌতম উহাদিগকে প্রয়োজন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যথা

"যমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্"

২৪ সূ ১ পা ১ অ।

"যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং অধ্যবসায তদাপ্তিহানোপায় মনুতিষ্ঠতি প্রয়োজনন্তদ্বেদিতব্যম্।" ভাষ্যম্।

যাহা পাইবার বা ত্যাগ করিবার উদ্দেশ করিয়া কোন উপায় অনুষ্ঠান করা যায় তাহার নাম প্রয়োজন। প্রয়োজন

পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নাদি-কার্য্যের কারণ নহে, কিন্তু তাহাদের ফলস্বরূপ। তবে ঐ প্রযোজন সাধন করিতে যে প্রবৃত্তি হয় তাহাই অধ্যয়নাদি কার্য্যের কারণ।

গঙ্গাধর শর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

নবম পরিচ্ছেদ।

ইংরেজি পাঠের উন্নতি।

জটাধারীর প্রভুত্বে কেহ গর গর করিতেন না—আমার ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া অনেক বালকই ইংরেজি পাঠে যত্নবান্ হইল। আশুতোষ বাবুর আদেশানুসারে ভীম চাঁদ নামা একটি সুশিক্ষিত "গুডবেড" স্কুল মাষ্টর কলিকাতা হইতে ইণ্ডেণ্ট হইয়া আসিলেন। তাঁহার বেতন মাসিক ১২ টাকা ধার্য্য হইল কিন্তু তাঁহার মেজাজ ওজনে ১২ হাজার টাকা অপেক্ষা গুরুবোধ হইত। ভীমচাঁদ দেখিতে মন্দ ছিলেন না; শ্যাম মুখের উপর কেশ বিন্যাসের বিশেষ পারিপাট্য প্রদর্শন করিতেন, রুমালে সুগন্ধ লেভেণ্ডর ছড়াইতেন, ইংরেজি জুতায় চরণের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেন, ইংরেজি রকম বাহ্যিক পরিচ্ছদের ইনিই আমাদের দেশের পথপ্রদর্শক বা পাইওনিয়র হইলেন। কিন্তু তাঁহার বামপদ অপর পদাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব থাকায় তাঁহার খঞ্জ ভীম নাম খ্যাত হইল। খঞ্জ ভীম, তর্কালঙ্কার মহাশয়, লাউসেন দত্ত ও আখঞ্জির ছাত্র মণ্ডলে এক প্রধান শরিক হইয়া উঠিলেন। মাষ্টর বাবুর চাল চলন দৃষ্টে আমাদেরও মসমসে বিনামা ও কেশবিভাগের অর্থাৎ টেরি কাটিবার অভ্যাস হইল, কিন্তু এককারণে তাঁহার উপর আমাদের বিশেষ ভক্তি ও ইংরেজি পড়িতে আস্থা বৃদ্ধি হইল। তিনি লাউসেন দত্তের ন্যায় প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেত দেখাইতেন না, আখঞ্জির মত কেবল রাঙ্গা চক্ষু ও মেহেদি রঞ্জিত শ্মশ্রুদল হেলাইয়া ভয় প্রদর্শন করিতেন না, "বড়ি কাফ" বা "আসরাফ" উচ্চারণ উদ্যমে ফুৎকারে আমাদের গাত্র সিক্তিত করিতেন না, সময়ে সময়ে মিষ্ট কথা ও নগরের নানাবিধ গল্পে মন হরণ করিতেন। দিবা রজনীমধ্যে ৫। ৬ ঘণ্টায় পাঠাভ্যাস করাইয়া বিদায় দিতেন; যে বিদ্যা শিখিতে প্রাতে খেলিতে সময় হয়, সন্ধ্যার পর ঠাকরুণদিদির নিকট উপকথা শুনিতে অবকাশ হয় তাহা কেন

প্রীতিকর না হইবে ? বিশেষ চাণক্যের শ্লোক অভ্যাস, শুভঙ্করের অঙ্কপাত, পিতামহের নাম, গাঁই, গোত্রাদি শিক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কেহ তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে "আমরা ইংরেজি পড়ি" কহিলেই প্রকারান্তরে তাহাকে বিলক্ষণ অপ্রতিভ করা হইত। ক্রমে বাপ পিতামহের নাম না জানা একটী গৌরবের কারণ হইয়া উঠিল ! বাপ পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করাও একটী অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইল। অধিকন্তু আর আমাদের বাটীতে বসিতে হইতনা, স্কুল ঘর মেজ চৌকিতে সজ্জিত হইল, বেঞ্চে বসিয়া বাঙ্গা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সকাল সকাল "স্কুলের ভাত" প্রস্তুত হইতে লাগিল, প্রতিদিন পরিষ্কার বস্ত্রে ও জুতার বাহারে বাহিক পরিচ্ছন্ন সাধন হইতে লাগিল। দিনে দিনে বালকগণের বোল, মেজাজ, বাঙ্গালার বায়ু পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সকলের মুখেই ইংরেজি কথা ! বেনেদের রাজকুমারী "কিংস্ ডটার—" রাঙ্গাঠাকুরুণ "রেড গডেস্" খুড়া "অঙ্কল" তরকারী "করি" হইয়া গেল। স্কুলের মালি গোপীনাথ সর্দ্দার জল ছাড়িয়া "ওয়াটর" কহিতে লাগিল ও দুই এক ছিলিম গঞ্জিকায় মত্ত হইয়া শুভ্রবর্ণ গোফ যুগল হেলাইয়া "ইয়াস" "নো" করিতে আরম্ভ করিল, সেই "ইয়াস" "নো" ক্রমে বিপুল পৃথিবী ব্যাপী হইয়া উঠিল, ঘরে ঘরে মুখে মুখে বেড়াইয়া সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যালঙ্কার ন্যায়রত্ন প্রভৃতির ওষ্ঠে পর্য্যন্ত আরোহণ করিল। কিন্তু বৃদ্ধ তর্কালঙ্কার মহাশয় শুদ্ধাচারী ম্লেচ্ছবর্ন ব্যবহার দূরে থাকুক অপরের মুখে শুনিলেও বিমর্শ হইতেন, ও কহিতেন "শাস্ত্রধর্ম্ম দূরে গত ম্লেচ্ছকৃত বিপ্লব কাল আগত।" এ দিকে আখঞ্জি সাহেবও মাষ্টর বাবুর প্রাদুর্ভাবে বিরক্ত। মনে করিতেন "বাদশাহী তক্তের সহিত বাদশাহী যবানও লোপ হইল।" এক্ষণে মাষ্টরের প্রতি উভয়ের বিরক্তি হেতু পরস্পরের মধ্যে আনুরক্তির কারণ জন্মিল —মহিষের বাঁকা সিং যুদ্ধকালে একা হইয়া উঠিল। সনাতন ধর্ম্মবাদী তর্কালঙ্কার মহাশয় ও চিরদ্বেষী মোসলেম অনুচর আখঞ্জি বাহাদুর স্বার্থাশয়ে ঐক্য হইলেন ও ইংরেজি পড়া ও ইংরেজি পাঠ গ্রাম হইতে উত্যক্ত করিবার জন্য একটী গভীর প্রস্তাবনা সৃজন করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর বিন্ধ সায়েরের উত্তরতীরে শিবমন্দির সম্মুখে চাঁদনির সোপানে বসিয়া গঙ্গাধর কয়েকটী সমবয়স্ক বালকসহ আপন আপন পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন। বঙ্গ ইতিবৃত্ত হইতে কালা পাহাড় কর্ত্তৃক হিন্দুদেবগণের উপর অত্যাচার সকল একটি বালক গল্পচ্ছলে কহিতেছিল এই সময় সম্মুখস্থ গঙ্গাধর মহাদেবের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি কহিলাম "দেব দেবীদের যেরূপ নিস্তেজ ব্যবহার পুরাবৃত্তে পড়া যায় তাহাতে বিশ্বাস

প্রীতিকর না হইবে? বিশেষ চাণক্যের শ্লোক অভ্যাস, শুভঙ্করের অঙ্কপাত, পিতামহের নাম, গাঁই, গোত্রাদি শিক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইলাম। যেই তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করে "আমরা ইংরেজি পড়ি" বলিলেই প্রকারান্তরে তাহাকে বিলক্ষণ অপ্রতিভ করা হইত। ক্রমে বাপ পিতামহের নাম না জানা একটী গৌরবের কারণ হইয়া উঠিল। বাপ পিতামহের নাম মনে করাও একটি অসভ্যতার লক্ষণ [illegible] নির্দিষ্ট [illegible]। অধিকন্তু আর আমাদের [illegible] হইতেন, স্কুল [illegible] হইল, [illegible] বসিয়া [illegible] হইতে লাগিল, সকল সময় [illegible]" প্রশ্ন হইতে লাগিল। [illegible] ও [illegible] বাহ্যিক পরিচ্ছন্ন সাধন [illegible]। দিনে দিনে বালক [illegible] আজ, বাড় লাব বাবু পর্য্যন্ত [illegible] হইতে লাগিল। সকলের মুখে ইংরেজি কথা। মেয়েদের বাল্য [illegible] "[illegible] ডিয়ার—" রাঙ্গাঠাকুরুণ "[illegible] ডম" খুড়া "অঙ্কল" তরকারী "করি" হইয়া গেল। স্কুলের মালি [illegible] দীননাথ সর্দার জল ছাড়িয়া "ওয়াটর" কহিতে লাগিল ও দুই এক ছিলিম গঞ্জিকায় মত্ত হইয়া শুভ্রবর্ণ গোঁফ যুগল হেলাইয়া "ইয়াস" "নো" করিতে আরম্ভ করিল, সেই "ইয়াস", "নো" ক্রমে বিপুল পৃথিবী ব্যাপী হইয়া উঠিল, ঘরে ঘরে মুখে মুখে বেড়াইয়া সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যালঙ্কার ন্যায়রত্ন প্রভৃতির ওষ্ঠে পর্য্যন্ত আরোহণ করিল। বিশ্ব বৃদ্ধ তর্কালঙ্কার মহাশয় শুদ্ধাচারী ম্লেচ্ছবর্ণ ব্যবহার দূরে থাকুক অপরের মুখে শুনিলেও বিমর্ষ হইতেন, ও কহিতেন "[illegible] ম্লেচ্ছ [illegible] আগত।" এ দিকে আখড়ি সাহেব [illegible] পাড়ভাবে বিরক্ত। মনে করিতেন 'বাদশাহী [illegible] সহিত বাদশাহী [illegible] লোপ হইল।" এক্ষণে [illegible] প্রতি উভয়ের বিরক্তি হেতু [illegible] মধ্যে আন্তরিকের কারণ জন্মিল [illegible] হিন্দু [illegible] সনাতন ধর্ম্মবাদী তর্কালঙ্কার মহাশয় ও চিরদ্বেষী মোসলেম অনুচর [illegible] বাহাদুর স্ব স্বাংশে ঐক্য হইলেন ও ইংরেজি পড়া ও ইংরেজি পাঠ গ্রাম হইতে উত্তাক্ত করিবার জন্য একটী [illegible] প্রস্তাবনা সৃজন করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর বিদ্ধ সাহেবের [illegible] শিবমন্দির সম্মুখে চাঁদনির সোপানে বসিয়া গঙ্গাধর কয়েকটী সম বয়স্ক বালকসহ আপন আপন পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন। বঙ্গ ইতিবৃত্ত হইতে কালা পাহাড় কর্ত্তৃক হিন্দুদেবগণের উপর অত্যাচার সকল একটি বালক ধরচ্ছলে কহিতেছিল এই সময় সম্মুখস্থ গঙ্গাধর মহাদেবের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি কহিলাম "দেব দেবীদের যেরূপ নিস্তেজ ব্যবহার পুরাবৃত্তে পড়া যায় তাহাতে বিশ্বাস

হওয়া দুষ্কর, সে সকল কথা যদি সত্য হয় তবে এই রূপ অচল দেবতার উপর ভক্তি সচল হইয়া পড়ে।” কথা কহিবার সময় আমার মনে ছিল না যে ঐ গঙ্গাধর দেবের প্রসাদেই আমার নাম. গঙ্গাধর প্রসাদ হইয়াছিল। আমার কথা শেষ না হইতেই মন্দিরের পার্শ্বে “কি সর্ব্বনাশ!” এক গর্জ্জন শুনিলাম, পরক্ষণেই দেখিলাম তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ গর্জ্জন প্রয়োগ করিয়া দ্রুতগতি আশুতোষ বাবুর বৈঠকখানার দিকে ধাবমান হইতেছেন। গঙ্গাধরও দৌড়িতে অপটু ছিলেন না—সত্বর বৈঠকখানায় পৌঁছিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় আমাদের নামে একটী অনর্থক অপবাদ দিতে আসিতেছেন, অদৃশ্য থাকিয়া এই কথাটী আকাশ বাণীর ন্যায় বাবু মহাশয়ের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া প্রস্থান করিলাম। ক্ষণকাল পরেই তর্কালঙ্কার মহাশয় পৌঁছিলেন ও কহিলেন “মুণ্ডপাত উচ্ছন্ন! সকলে এককালে পাষণ্ড হইল—মহাশয় স্কুল স্থাপন করিলেন, না নাস্তিকতার নিশান তুলিলেন?” তর্কালঙ্কার মহাশয় স্কুলের ছাত্রদের নাস্তিকতার সালঙ্কার পরিচয় দিলেন। আথক্কি সাহেব কোথা হইতে আসিয়া সেই কথার অনুমোদন করিলেন। ইংরেজি পাঠের পক্ষে একটি মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল, গ্রাম সমস্ত ঐ কথায় আন্দোলিত হইল। জটাধারী নাস্তিকতায় তিলকধারী হইলেন—ক্ষীণ প্রাণী স্কুলটি যায় যায় হইল; শঙ্কভীমের পা গর্ত্তে পড়িবার সম্ভাবনা হইল—আশার মধ্যে দিব্য নক্ষত্র স্বরূপ আশুতোষ বাবুর দূরদর্শিতা জাজ্বল্যমান রহিল।

এই সময়ে আর একটী সুঘটনা উপস্থিত। নিকটস্থ আলমনগরে একটী নূতন মোকর্দ্দমা সৃষ্টি হইল। এক দিন প্রাতে দুই জন অশ্বারোহী অর্থাৎ জেলার কালেক্‌টর সাহেব নূতন মোকর্দ্দমার কর্ম্মচারী নূতন হাকিম মৌলবি খাঁ বাহাদুর সহিত আমাদের গ্রামে হঠাৎ পৌঁছিলেন। গ্রামে একটি স্কুল হইয়াছে শুনিয়া ছাত্রদের দেখিতে চাহিলেন, নিমেষ মধ্যে আমাদের রাখাল বেশ ছাড়িয়া বাবু সাজিয়া সভীত মনে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরীক্ষা আরম্ভ হইল—পরীক্ষার সেই প্রথম ঢেউ দেখিলাম। সেই ঢেউয়ে ভাসিতে ভাসিতে হাবুডুবু করিতে করিতে সংসার সাগরে উপনীত হইয়াছি—পরীক্ষার শেষ তবু দেখিতেছি না! যাহা হউক সেই যাত্রা ইসফের একটী ফেবল পাঠ করিয়া সাহেবের নিকট উত্তমরূপে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াদিলাম। কালেক্‌টর সাহেব সহস্তে একখানি হোলি বাইবেল পুরস্কার দিলেন। তাহাতে জটাধারীর নামে নিকটস্থ গ্রাম সকলে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। আরও সুখের বিষয় হইল, সাহেব মহোদয় আপন সন্তুষ্টির নিদর্শন স্বরূপ লর্ড হারডিঙ্গের মণ্ড পনর মুদ্রার

হিসাবে মাসিক সাহায্য আমাদের স্কুলে দান করিতে স্বীকার করিলেন—তাহাতে স্কুলের জড় নামিল খঞ্জভীমের পদে বর্দ্ধি হইল—তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অভিসন্ধি বিফল হইল।

কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় নিষ্ফল হইয়াও নিরুৎসাহ হইলেন না—যাহাতে সাহেবী চাল চলিত না হয়, সাহেবী সাজে কেহ না সাজে, ইংরেজদের পাপানুকরণ ইংরেজী পাঠ পদ্ধতি প্লাবন দ্বারা হিন্দুসমাজের রীতিনীতি গ্রাসিত না হয় তাহাই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনিবার চেষ্টা রহিল, যেখানে দশজন যুবাকে একত্রিত দেখিতেন অধ্যাপক মহাশয় অমনি একটি সমাজসম্বন্ধে অভ্যাসগত বক্তৃতা করিয়া সকলের হৃদয় আর্দ্র করিতেন—এই বক্তৃতার একটি পরিশিষ্ট আমার রোজনামচার অন্তর্গত ছিল।

"ওহে! তোমরা বালক, আমার কথায় বিরক্ত হতে পার কিন্তু আমার অভিপ্রায় তোমরা যেরূপ মনে কর তদ্রূপ নিন্দনীয় নহে—ইহার নিগূঢ় মর্ম্মভেদ শিশুর পক্ষে দুঃসাধ্য। নিজ নিজ হৃদয়গত ধর্ম্ম ও চিরআদরণীয় দেশীয় প্রথা রক্ষার অনেক গুণ আছে। আমাদের সামাজে কি সুখ ছিল না? আমোদ ছিল না? সে সুখ সে আমোদ যদি কোন অংশে বিশুদ্ধ না হয় তাহার দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণভাগের উন্নতি করিবার চেষ্টা কর—জাতীয় উন্নতিফল লাভ হইবে। যদি তা না করিয়া পরজাতির যাহা দেখিবে তাহাই অনুকরণ কর, তাহাতে তোমাদের কি উপকার হইবে একবার দূরে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখ। আপনাদের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজমন্দির যদি কেবল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিদেশীয় ছাঁচে বা আদর্শে প্রস্তুত করিতে চাহ বঙ্গসমাজের যাহা ভাল আছে তাহা বিলয় হইবেক—উভয় জাতিতে প্রভেদ না থাকিলেও না থাকিতে পারে কিন্তু ক্রমে ক্রমে অপর জাতির দলে মিশিয়া বঙ্গদেশ হইতে বাঙ্গালির নাম লোপ হইয়া একটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ জীব মাত্র সৃজন হইবে।

আত্মধর্ম্ম পরিত্যজ্য পরধর্ম্মেষু যোরতঃ।
স তিরস্কার মাপ্নোতি নীলবর্ণ শৃগালবৎ॥

এইখানে আমার একটী গল্প মনে পড়িল—একবার নবদ্বীপ হইতে বাটী গমন কালীন গঙ্গাতীরস্থ কোন গণ্ডপল্লীর ঘাটে স্নানান্তে পূজা আরম্ভ করিয়াছি ও শিব গড়িতেছি—গড়িতে গড়িতে শিবটি মনের মত না হওয়ায় দুই একবার ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। দুই একটী গ্রাম্যলোক ব্যঙ্গ করিয়া কহিল ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে বিহ্বল হইয়াছে—আবার একজন কহিল একেই "বাহাত্তরে" বলে—আমি উত্তর করিলাম 'একেই মাটীর গুণ বলে তোমার গ্রামের মাটীর একটী বিস্ময়কর শক্তি দেখিতেছি যত শিব গড়িতেছি বানর হইয়া উঠিতেছে'—সাবধান বঙ্গদেশের মাটীর প্রতি দৃষ্টি রেখ এই মাটীতে বিলাতি সাহেব

গঠন হইবার নহে দেখ যেন শিব গড়িতে বানর না গড়িয়া ফেল।"

দশম পরিচ্ছেদ।

রাঙ্গা ঠাকুরুণ।

অতি অল্পদিন হইল, আমি কোন বুদ্ধিমতী মহিলার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত ছিলাম। বোধ হইল, জটাধারীর রোজনামচার কিয়দংশ সুমতি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন—ইহাও জটাধারীর সৌভাগ্য। কারণ স্ত্রীলোকে ত নিন্দাবাদ জানেন না। যাহা হউক সন্তুষ্টি প্রকাশের বিশেষ কারণ মহিলা এই বলিয়া নির্দ্দেশ করেন যে "এখন পর্য্যন্ত জটাধারী আমাদের অঙ্গস্পর্শ করেন নাই—যাঁহারা চিত্রপট লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা প্রথমতঃ স্ত্রীজাতির চিত্ত ভ্রম অঙ্কিত করিয়া আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করেন, আবার দেখি সংসারপটে দুই একটি কোমলাঙ্গীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত না হইলেও ছবিটি শোভাহীন ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে।" মহিলার এ কথাগুলি শুনিয়া অবধি আমি ভাবিতে ছিলাম, "স্ত্রী-নিন্দা কি গুরুনিন্দা অপেক্ষা অধোগতির মূল, যে সেই সম্বন্ধে কোন কথা সত্য হইলেও আলোচনা করিতে কাতর হইব?" আমি ত বিনাকারণে কাহারও সুন্দর অঙ্গের ক্ষুদ্র তিলটি পর্য্যন্ত দেখাইতে ইচ্ছুক নহি; যদি দেখাইয়া দিই, তখন মনে করি, যে ছুরি লইয়া চাঁচিয়া ফেল না ফেল, ঔষধ দিয়া আরাম করিতে পার, কর—গৌরাঙ্গীর গা আরও গোরা দেখাইবে। সুন্দরীদের আরো সতত মনে করা উচিত যে জটাধারী তাঁহাদের নিতান্ত বন্ধু, যখন কটু কথাও কহিয়া থাকি, তখন কেবল তাঁহাদের কোমল মন ও কোমল অঙ্গ নির্ম্মল দেখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু বিনা দলনে মলা উঠিবার নহে,এ কথাও মনে করা উচিত।

এ দিকে যেমন তিলটী পর্য্যন্ত দেখি, অপর দিকে আবার সুন্দরীগণের স্নেহ, দয়া, প্রীতি-সুধা-সার-সুনির্ম্মিত হৃদয়ের গুণ সকলের বলিহারী দিয়া থাকি। বাল্যকাল হইতে এই স্নেহের অনেক পরিচয় পাইয়াছি—এই স্নেহ কলুষিত বিপদ্ জলের নির্ম্মলী বলিয়া থাকি; দরিদ্র, ভিক্ষুক পীড়া-প্রপীড়িত শয্যাগত ব্যক্তির অন্তঃকরণে সেই স্নেহ, শুষ্ক মরুভূমে অমৃতবিন্দুর ন্যায় পতিত হইয়া থাকে, সুন্দরীর মনে সুন্দরগুণ থাকিলে আরও সুন্দর দেখি, সেই জন্যই অতি অল্প বয়স হইতে আমি সুন্দরী সুধার্ম্মিকাগণের বিশেষ প্রশংসাবাদক হইয়াছি—যখন বালক ছিলাম, গ্রামের সমবয়স্ক সমস্ত বালিকার আমি "জটা দাদা" ছিলাম। কামিনীর 'পিঠে' নগা একটি কিল মারিয়া মুড়ির পালিটি লইয়া পলাইল, প্রফুল্লের চুলের-দাঁড়টি গোপলা লইয়া কাঠের ঘোড়ার লাগাম করিল—মোহিনীর ক্ষুদ্র ধুতিখানি দেবা পরিয়া বাজনা শুনিতে দৌড়িল, এইরূপ অনেক-

গুলি নালিশ আমাকে প্রতিদিন নিস্পত্তি করিতে হইত, আমি বালিকাগণের বিচারক ও রক্ষক ছিলাম; রাঙ্গা ঠাকুরণ আমাকে সেই জন্য পাড়ার মেজেষ্টর বলিয়া আদর করিতেন। এই জন্যই স্ত্রীগণের দোষ গুণ বিচারের জটাধারী অনেক দিন পর্য্যন্ত অধিকারী ও আপাততঃ রাঙ্গা ঠাকুরাণীর চিত্র লিখনেও লেখনী-ধারী।

রাঙ্গা ঠাকুরুণ বহুগুণসম্পন্না হইয়াও দাম্পত্যসুখে চির-বঞ্চিত। তিনি যে কবে বিধবা হইয়াছিলেন, তাহা আমার মনে নাই—জ্ঞানাবস্থ হইতে তাঁহাকে শুভ্র, পবিত্র, বেশহীনা বিধবাই দেখিতাম। যে বৃহৎ পরগণার উপসত্ত্বে আশুতোষ বাবু এতদ্রূপ সমৃদ্ধিশালী, তাঁহার অনেক অংশ রাঙ্গা ঠাকুরুণের স্ত্রীধন। কিন্তু ভাশুরের হস্তে সমস্ত বিষয়ই গচ্ছিত করিয়া তিনি কেবল ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিতেন, দরিদ্রের দুঃখমোচনই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি যখন শুভ্র পট্ট বস্ত্র পরিধানে আলু থালু কাল কেশরাশি কপালের উপরভাগে এল বন্ধনে, রাঙ্গা হস্তে দর্ব্বী ভরিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে শত শত বালক বালিকাকে স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেন, সকলে কাণাকাণি করিত যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা হইয়াছেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ক্রিয়াকলাপে সমস্ত গৃহস্থ কার্য্য নির্ব্বাহকারিণী—রাঙ্গা ঠাকুরাণীই প্রধান ভাণ্ডারিণী ছিলেন; তিনি নিজ হস্তে যাহাকে যাহা দিতেন তাহাই তৃপ্তিকর—তাহার দ্বিগুণ অপরের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইলেও কেহ সুখী হইত না, এজন্য জটাধারী ব্যঙ্গ করিয়া কহিতেন, "রাঙ্গা দিদির বড় হাত-যশ" হাঁড়ি হাঁড়ি মণ্ডা হউক, থাল থাল মেওয়া হউক, বড়দিঘীর বড় রুহি হউক, বা উদ্যানের সামান্য সামান্য ফল হউক,—আম হউক বা কুল হউক—রাঙ্গা ঠাকুরুণ বাঁটিয়া না দিলে কাহারও মঞ্জুর নাই। আজ অন্নমেরু, কাল তুলা, পরশ্ব সাবিত্রী ব্রতদানের আনন্দেই রাঙ্গা দিদির রাঙ্গা তবু নিয়ত ম্লান মুখভঙ্গিটি কখন কখন প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হইত। স্বয়ং নিঃসন্তান কিন্তু দেশের ছেলে তাঁহার সন্তান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তখন জুত মোজার চালও ছিল না, সাধও ছিল না, কিন্তু কাহার ছেলে রাঙ্গা ঠাকুরাণীর প্রদত্ত রাঙ্গা ধুতি চাদরে সজ্জিত না হইত? তাঁহার কল্যাণে গুরুমহাশয়ের শিধার অভাব ছিল না, ছাত্রদের পুস্তক কিনিবার বা পুস্তক ছিঁড়িবার কষ্ট ছিল না; বিশেষতঃ ক্রিয়াকাণ্ডের ভোজের দিনে কমলমুখীর কোমলাঙ্গ যেন ধর্ম্মবলে দৃঢ় হইত, সূর্য্যোদয় না হইতেই প্রাতঃস্নান করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অনাহারে দেখ রাঙ্গা দিদি শশব্যস্ত—আমি আবার ব্যঙ্গ করিয়া কহিতাম "বেশ রাঙ্গা দিদি, আজ নাটাই হইয়া ঘুরিতেছ"—তাঁহার কেবল হাসিতে অবসর থাকিত, কখন কেবলমাত্র কহিতেন, "ক্ষীরের ছাঁচ কেমন হয়েছে দেখে-

য'ও''—জটাধারী চাকিতে তৎপর। প্রকৃতার্থ বাঙ্গা ঠাক্‌রুণ অতি প্রসিদ্ধ পাচিকা ছিলেন, নিমন্ত্রিত প্রবীণগণ আহারকালে কখন কখন কহিতেন এই লক্ষ্মীর হস্তেই যথার্থই অমৃত নিবেশিত হইয়াছে।

এখন কৃতবিদ্যা ব্রাহ্মিকা, এ-বি-পড়া বিবিসজ্জিতা বালিকা, দোজবরের যুবতী বসুনী, ঘোষাণী, ব্রহ্মণী, সহধর্ম্মিণী ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ''পাক করা ত পাচিকা বা বাবুর্চ্চির কার্য্য—তাহার প্রশংসা কি?'' আমি এইমাত্র উত্তর দিতে পারি যে পাকনিপুণতার প্রশংসা তোমাদের উচ্চ শিক্ষার সহিত লুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে পরিচয় দিবার স্থল কোথায়? কিন্তু উৎকৃষ্ট উদাহরণ অভাব বলিয়া আপনারা মনে করিবেন না, যে সুমিষ্ট পাকনৈপুণ্য রমণীগণের প্রশংসা বা শিক্ষার ভাগ নহে। আমাদের গ্রামের বিচক্ষণ ভট্টাচার্য্য সেতার কিম্বা অন্যান্য বাদ্যের রসগ্রহণে অক্ষম হইয়া কহিতেন ''সর্ব্ব বাদ্যময়ো ঘণ্টা।'' আমি ঘণ্টা বাজাইতে পারি—ঘণ্টার মত কি আর বাদ্য আছে? সেইরূপ হে কুলকামিনীগণ। গাহস্থ্য শিক্ষার প্রধান রসবিবর্জ্জিতা হইয়া আর বৃথা গৌরব করিও না—দেশের লজ্জা বৃদ্ধি করিও না আর কহিও না আমরা কার্পেট বুননের ফাঁসি দিতে শিখিয়াছি, সেই ফাঁসের উপর কি আর শিল্পনিপুণতা আছে? কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া মনে করুন সেই ফাঁসিতে অনেক গরীবের গলায় ফাঁসি পড়িতেছে। আপনারা বহুরূপিণী হইয়া ব্রাহ্মিকা সাজিয়া একদিকে ''গাউন'' ও ''পাউডার-পট'' আর একদিকে দোলযাত্রার নাম না শুনিতে বাসন্তী রঙ্গের ধুতি ও আঙ্গিয়ার জন্য ব্যস্ত কর। বাঙ্গা ঠাক্‌রুণের সহিত তোমাদের তুলনা করিতে আমার মনে হয়—

''পিতল-কাটারি, কামে নাহি আইনু
উপরহি ঝকমকি সার''

কুন্দনন্দিনী ।*

বিষবৃক্ষের চিত্রভূমিতে দৃষ্টিপাত হইলেই কতিপয় সুন্দর চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। একদিকে দেবেন্দ্র হীরার সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছেন, অন্যদিকে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর জন্য জাগরণে নিশাবসান করিতেছেন, এমত সময়ে সূর্য্যমুখী সহসা উদিতা হইয়া তদীয় মুখকমল প্রফুল্লিত করিলেন, অপর দিকে ঐ দেখ কমলমণি সূর্য্যমুখীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার মনোদুঃখ শ্রবণ করিতেছেন, আবার ঐ হরিদাসী বৈষ্ণবী কেমন গান গাইতে গাইতে, নৃত্য করিতে করিতে নগেন্দ্রের পৌরজনের চিত্তহরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। দেবেন্দ্র, হীরা, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র ও কমলমণি ইহারা সকলেই বর্ণগৌরবে চিত্রভূমি উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের পার্শ্বে ঐ যে অবগুণ্ঠনবতী—মৃদুরঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া অবনতমুখী অশ্রুপাতে মনোদুঃখ বিগলিত করিতেছেন, উহাকে কি তুমি চিনিতে পারিবে—উনি কুন্দনন্দিনী। উহার চিত্র তত বিভাসিত নহে, অতি কোমলবর্ণে, মৃদুরঞ্জিত, কিন্তু উহার চিত্রে এমন মাধুর্য্য, এমন সৌন্দর্য্য আছে, যাহা তাহার পার্শ্বস্থ কোন উজ্জ্বল চিত্রে নাই। সূর্য্যমুখী উজ্জ্বলতরগুণে এবং কমলমণি তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতরগুণে পরিভূষিতা বটে, কিন্তু কুন্দনন্দিনীতে যে ধীর আবরিত সৌন্দর্য্য, যে কোমল রমণীয়তা, যে অসামান্য সলজ্জ সরলতা আছে, তাহা সূর্য্যমুখী ও কমলমণিতে নাই। বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষের বর্ণোদ্ভাসিত চিত্রভূমি আঁকিতে আঁকিতে কোথা দিয়া যে এই

* এ পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাদির কোন সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে প্রথম চারি বৎসর বঙ্কিম বাবু স্বয়ং বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন—নিজ গ্রন্থসম্বন্ধে কোন সমালোচনা পত্রস্থ করিতেন না। একণে তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক নহেন, অধিকারীও নহেন। অন্যান্য লেখকদিগের ন্যায় তিনি বঙ্গদর্শনের একজন লেখক মাত্র। যদি হেমবাবু প্রভৃতি অন্যান্য লেখকদিগের গ্রন্থ সকল বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইতে পারে, তবে বঙ্কিমবাবুরও গ্রন্থ সমালোচিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সম্পাদক বঙ্কিমবাবুর সহিত নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট—এজন্য তাঁহার ইচ্ছা নহে যে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাদির কোন সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তবে এই প্রবন্ধটি পত্রস্থ করিবার কারণ এই যে পূর্ণবাবু স্বয়ং একজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক, তিনি যখন প্রবন্ধে স্বাক্ষর করিয়াছেন তখন এই প্রবন্ধোক্ত মতামতসম্বন্ধে সাধারণসমীপে তিনি একাই দায়ী—সম্পাদকের কোন জবাবদিহি নাই। এরূপ অবস্থা ভিন্ন বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থসম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ আমরা পত্রস্থ করিব না। পক্ষান্তরে, কোন সুপরিচিত লেখক, স্বাক্ষরিত করিয়া ইহার প্রতিবাদ পাঠাইলে তাহাও আমরা আদরে গ্রহণ করিব। বং সং।

রমণীরত্নের চিত্র সুস্পষ্ট অথচ মৃদুবর্ণে আঁকিয়া গিয়াছেন, পাঠক তাহা শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারেন না। অপরাপর চিত্রের উজ্জ্বল অঙ্কপাতে তাঁহার চিত্ত এত আকৃষ্ট থাকে যে অশপূর্ণা বিমলিনা কুন্দনন্দিনীর দিকে তাঁহার সহজে দৃষ্টি-পাত হয় না। কেহ না দেখাইয়া দিলে তিনি যেন দেখিতে পান না। এইজন্য বিষবৃক্ষের সমালোচনার আবশ্যক, নহিলে বিষবৃক্ষের সৌন্দর্য্য এবং গুণাবলী গ্রন্থকার নিজ অক্ষরেই এমন সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, যে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সমালোচকের জন্য আর কিছুই রাখিয়া যান নাই।

বঙ্গের অন্ধ অন্তঃপুরীমধ্যে যে সকল কুলকামিনী রমণীরত্ন জন্মে, পৃথিবীর আর কোনখানে সেরূপ জন্মে কি না সন্দেহ। অনেক কারণে এখানে অনেক রমণী পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। ততদূর পাতিব্রত্য অন্যদেশের কুলকামিনী সতীতে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। সূর্য্যমুখী এদেশে তত দুর্ল্লভ নহে, কিন্তু সূর্য্যমুখী অন্যদেশে নিশ্চয় সুদুর্ল্লভা; তদপেক্ষা কমলমণি, এবং কমলমণি অপেক্ষা কুন্দনন্দিনী। সূর্য্যমুখীর পাতিব্রত্য কায়মনোবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, কমলমণি একদিন সূর্য্যমুখীকেও পাতিব্রত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। কুন্দনন্দিনীর পাতিব্রত্য কায়মনোবাক্যে প্রকাশিত নহে বটে, কিন্তু তজ্জন্য কিছুতেই ন্যূন নহে, বরং তজ্জন্যই অধিকতর উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এবং পবিত্র বলিয়া প্রতীত হয়। সূর্য্যমুখী অন্যদেশে দুর্ল্লভ, কিন্তু কুন্দনন্দিনী বঙ্গদেশেও দুর্ল্লভ। এখানে যদি দুই শতের মধ্যে একজন সূর্য্যমুখী থাকে, পঞ্চশতের মধ্যে একজন কমলমণি থাকে, তবে সহস্র বঙ্গগৃহবধূর মধ্যে একজন কুন্দনন্দিনী আছে কি না সন্দেহ। বঙ্গগৃহবধূর ভীরুতা, নম্রতা, সরলতা, অনভিজ্ঞতা ও কোমলতা যতদূর অনুমান করা যাইতে পারে কুন্দনন্দিনীর ততদূর ছিল। বাস্তবিক কুন্দনন্দিনী মৃদুপ্রকৃতি বঙ্গগৃহবধূর অবয়বী কল্পনা। এইজন্য কুন্দনন্দিনী এদেশেও দুর্ল্লভ। অপর দেশীয় কবি কুন্দনন্দিনীকে কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না। কিন্তু বিরল বলিয়াই, সূর্য্যমুখী অপেক্ষা কুন্দনন্দিনী শ্রেষ্ঠতরা নহেন। সূর্য্যমুখী বঙ্গগৃহের শোভা, কমলমণি গৃহধাম গুণে আলোকিত করেন, এবং কুন্দনন্দিনী সেই অন্ধধামের অভ্রদেশে মাণিক্যের ন্যায় গোপনে উজ্জ্বলিত রহেন। যিনি এরূপ রত্ন চিনিতে পারেন, তিনি তুলিয়া হৃদয়ে ধারণ করেন; যিনি না চিনিতে পারেন, তাহার মাণিক্য কুন্দনন্দিনীর ন্যায় অবশেষে সর্পের বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া যায়।

ঐ যে সরোজিনী জলাশয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া, রূপে ঢল ঢল করিয়া, চারিদিক সৌরভে আমোদিত করিয়া, মলয়বায়ু-হিল্লোলে জলতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া প্রফুল্লমুখবিকাশে উদ্যানরাজি প্রফুল্লিত

করিয়াছে উহা একদিন কমলমণির সহিত তুলনীয় হইতে পারে। আর ঐ যে পূর্ণবিকসিত, শতদলশোভিত, পরিমল-সুগন্ধিত, রূপে আনন্দিত গোলাবকুসুম উদ্যানের মধ্যস্থিত গর্ব্বস্বরূপ হইয়া তো-মার নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতেছে, উহা সূর্য্যমুখীর সদৃশ চতুর্দ্দিক সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যদি কুন্দনন্দিনীর সাদৃশ্য দেখিতে চাও, তবে ঐ গোলা-বেরই নিকটস্থ আর এক তরুশিরে গিয়া দেখ, একদল অর্দ্ধমুকুলিত গোলাবগুচ্ছ বৃন্তশিরে সুশোভিত রহিয়াছে; তাহার মধ্যকুসুম প্রস্ফুটিতপ্রায়, অথচ দলগুচ্ছে সম্যক্ প্রস্ফুটিতে পারে নাই। আর উহা ফুটিতে পারিবে না। তুমি অনু-মানে উহাকে ফুটাইয়া লও, এবং বল দেখি, উহা সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইলে, ঐ পূর্ণবিকসিত গোলাবের শোভা পরাজয় করিত কি না? কুন্দনন্দিনী ঐরূপ অর্দ্ধ-বিকসিত অথচ সুপ্রস্ফুটিত গোলাবস্ব-রূপ। অনুমানে তাহাকে ফুটাইয়া লইতে হয়। তাহা নিজে সম্যক্‌শোভা বিকসিত করিতে পারে না। রূপে যেন গর্ব্বিত থাকে। পরিমলে হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, যিনি আদরে তাহাকে দেখিতে আসেন, তাহাকে আপনার হৃদয়ধন কথঞ্চিৎ বিতরণ করিয়া আমো-দিত করেন। তাহার হৃদয়ে যে সম্পত্তি রাশি সঞ্চিত আছে, তাহা অন্যকুসুমে নাই; সেই জন্যই বুঝি সাহসভরে সম্যক্ প্রস্ফুটিতে পারে নাই।

কুন্দনন্দিনীর হৃদয়, এইরূপ, ভাবে পরিপূর্ণ। সে ভাব অবাতবিক্ষোভিত জলধির ন্যায় গভীর,অচঞ্চল, এবং স্থির। সে জলধি মথিত করিলে অমৃত উঠে। ঘটনা বায়ু তাহাতে ক্রীড়া করিয়া বে-ড়ায়। যদি আলোড়িত ও তরঙ্গে আ-ন্দোলিত করে, জলধি নিজ হৃদয়েই সে আন্দোলন ধারণ করিয়া রাখেন। চন্দ্র হাসিলে তাহা আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু সে বক্ষস্ফীতি কেহ দেখিতে পায় না। চন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুখ-হিল্লোলে নাচিতে থাকে। চন্দ্র সরসীর কুমুদিনীর শোভাতেই মোহিত, তিনি এ জলধির আনন্দভাস দেখিতে পান না। চন্দ্র একবার এই জলধিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; আবার মেঘের উচ্চ সিং-হাসনে উঠিয়া বসিলেন; বসিয়া সেই দূর পশ্চিম সরসীর কুমুদিনীর প্রতি হাসিতে লাগিলেন। মেঘে প্রবল বাত্যা বহিল। জলধি তমসাচ্ছন্ন ও আন্দোলিত হইল। আন্দোলন শেষ হইলে পর যখন শশী আবার প্রকাশিত হইলেন, তখন দেখা গেল তিনি সেই পশ্চিম সরসীর দিকে ঢলিয়া পড়িয়া-ছেন। শশী, জলধি পার হইয়া অস্ত-মিত প্রায়। তখন অর্দ্ধরাত্রের ঘন তিমির আসিয়া জলধিকে অন্ধকারে পরিপূর্ণ করিল। জলধি, রজনীর বিশ্বব্যাপী ঘন তমিরে ডুবিয়া গেলেন।

বাঙ্গালির মত ভীরুজাতি পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। কুন্দনন্দিনী এই

ভীরুতার ফল। বাঙ্গালিনী রমণী কত দূর ভীরুস্বভাব হইতে পারে কুন্দনন্দিনী তাহা প্রকাশিত করে। সংসারের সাহসিকতা কিরূপ কুন্দনন্দিনীর ন্যায় রমণী তাহা জানে না, ভাবিতেও পারে না: সে সাহসিকতার উপন্যাস বলিলে শিহরিয়া উঠে। যে অল্প বীর্য্য ও তেজ বাঙ্গালির আছে, তজ্জন্য সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকে। কেহ উচ্চরবে কথা কহিলেও ভীত হয়। পুষ্পের আঘাতেও মূর্চ্ছা যায়। জননীর নিতান্ত অঙ্কপ্রিয় হয়। কিছু করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে ভয় পায়। উচ্চরবে কথা কহিতে জানে না। অন্যে উচ্চরবে কথা কহিলে থমকিয়া কাঁদিয়া পড়ে। কেহ কিছু বলিলে কুটীর মধ্যে একাকিনী বসিয়া নীরবে কাঁদিতে থাকে। তাহার অবগুণ্ঠনবিমুক্ত মুখচন্দ্রিমা অল্পলোকেই দেখিতে পায়। একাকিনী থাকিতে ভাল বাসে। অন্যান্য রমণীর সহিত মিশিতে সাহস হয় না। মিশিলে তাহাদিগের সহিত দুই একটি কথা মাত্র কয়। তাহাদিগের সহিত অগ্রসারিণী হইয়া কার্য্য করিতে যায় না, হয় ত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। অবগুণ্ঠন টানিয়া পরের সাহস ও কার্য্য দেখিতে থাকে। পরের প্রতি দুই চক্ষে চাহিতেও ভয় পায়। চক্ষে চক্ষে মিলিলে অমনি নয়নপল্লব ফেলিয়া মুখ অবনত করে। মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারে না; ইচ্ছা হইলে মনে মনেই বিলীন হয়। কোন ইচ্ছা প্রকাশিত করিতে নিতান্ত অনুরোধ করিলে তাহা আপনি সাহস ভরে বলিতে পারে না; সঙ্গিনীর সহিত চুপি চুপি কানে কানে কহিয়া দেয়। সে ইচ্ছা, দেখা যায়, অন্য রমণীর ইচ্ছার সহিত কিছু স্বতন্ত্র। অন্যের সহিত সে ইচ্ছার কিছু বিশেষ হইবেই হইবে। সে ইচ্ছাতে হয় ত ধীরতা আছে, নম্রতা আছে, উচ্চাশা নাই, সাহস নাই। হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিলে কুন্দনন্দিনী এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। অনুরুদ্ধ না হইলে, যাহা হইত ও ঘটিত, তিনি নীরবে ও নিঃশব্দে তাহা শুনিয়া ও দেখিয়া যাইতেন। সহিষ্ণুতা, ভীরুতার ফল। সুতরাং কুন্দের ন্যায় রমণীর সহিষ্ণুতা থাকা অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্ম। আবার প্রকৃত সোহাগ কি, তাহা ইহারাই জানে, ইহাদিগেরই থাকে। ইহাদিগেরই প্রকৃতিতে ভীরুতা কোমলতার সহিত মিশিয়া যায়। কোমলতার সহিত না মিশিলে ইহাদিগের ভীরুতা অন্যবিধ কামিনীর স্বাভাবিক ভীরুতার সহিত সমান হইত, তাহার বিশেষ ভাব লক্ষিত হইত না। হৃদয়ের কোমলতার সহিত ভীরুতা মিশিয়া প্রকৃতি যে সুকোমলভাব ধারণ করে তাহা বাঙ্গালির প্রকৃতিতে আছে। তাহা বাঙ্গালিনী রমণীতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালিনীতে তাহা এক সুন্দর অভূতপূর্ব্ব রমণীয়ভাব ধারণ করিয়াছে। কুন্দনন্দিনী সেই অভূত পূর্ব্ব সুকোমলতার অবয়বী কল্পনা

ও সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই সুকোমলতা প্রকৃত জীবনে এতদূর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে মাত্রায় কুন্দনন্দিনী প্রকৃত জীবনের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, সেই মাত্রা, কবির চিত্রবিন্যাস, তাহাই কাব্য-সৃষ্টি। প্রকৃত জীবনে বঙ্গগৃহলক্ষ্মী তাহার অনেকদূর নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারেন, কিন্তু ঠিক্ সেই উচ্চতায় উঠিতে পারেন না। প্রকৃত জীবনের উপর এই অত্যল্প মাত্রায় উচ্চতা দেওয়া কবির কার্য্য, এই উচ্চতা কেবল উপন্যাসে ও কাব্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি কবি নহেন,যিনি সামান্য লেখক, তিনি এই বর্ণগৌরব, প্রকৃত চিত্রে এই বর্ণ বিভাস দিতে সমর্থ হয়েন না। এই ঈষৎ চিত্র-রঞ্জন সূর্য্যমুখী ও কমলমণিতেও আছে,তবে তাহাদিগের চিত্রের সহিত কুন্দনন্দিনীর চিত্রের প্রভেদ এই, কোমলবর্ণ বঙ্গগৃহবধূ কুন্দনন্দিনীতে কোমলতর বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সূর্য্যমুখী ও কমলমণি উজ্জ্বলবর্ণে উজ্জ্বলতরা হইয়াছেন। প্রকৃত জীবনের চিত্র বঙ্কিমবাবু অল্পই লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিষবৃক্ষ সমুদায় প্রকৃত জীবনের চিত্র। অথচ প্রকৃত জীবনের চিত্র ধরিলে, বঙ্কিম বাবুর ন্যায় ভাবচিত্রকর সেই চিত্রে কেমন কাব্য-সৃষ্টি দেখাইতে পারেন তাহা বিষবৃক্ষের চিত্রাবলীতে স্পষ্টবর্ণে প্রতীত হয়।

ভাবময়ী কুন্দনন্দিনী কোমলতায় পরিপূর্ণ। কুন্দনন্দিনীর যদি কিছু গুণ ও সম্পত্তি থাকে তাহা তাহার হৃদয়, প্রেম, সহৃদয়তা ও কোমলতা। শেলির লজ্জাবতী লতা এতদূর কোমলপ্রকৃতি নহে। তাহার হৃদয় ভাবে সর্ব্বদাই উদ্বেলিত হইত। তিনি স্বভাবগুণে কোমলভাবকে কোমলতর করিতেন। তাহার ভাবোদ্বেগ হৃদয়কে স্তম্ভিত করিয়া রাখিত। কখন অশ্রুধারায় বিগলিত হইত। অশ্রুধারাই সে হৃদয়পূর্ণতার বাহ্যবিকাশ। সূর্য্যমুখী হৃদয়ভাবকে সুন্দর প্রকাশিত করিতে জানিতেন। এমত কি অনেক সময় তাহার ভাবব্যক্তি হৃদয়স্থ ভাবকে সুন্দরতর করিয়া দেখাইত। কুন্দনন্দিনী ভাব প্রকাশ করিতে জানিতেন না। তাহার ভাব নিজেই প্রকাশিত হইয়া পড়িত, ভাবপূর্ণতা উথলিয়া পড়িত। কিন্তু তাহার এই নিগূঢ় ভাববিকাশ কি সূর্য্যমুখীর সহিত সমান অর্থপূর্ণ ছিল না? যিনি তাহা পড়িতে জানিতেন, অশ্রুধারা ও অস্ফুট বাক্স্ফূর্ত্তি তাঁহার নিকট অধিকতর অর্থপূর্ণ বোধ হইত। কমলমণি তাহার নিগূঢ় অর্থ তন্ন তন্ন বুঝিতেন। নগেন্দ্র তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কুন্দনন্দিনীর অগাধভাবপূর্ণতা কখন নীরবতায় কখন অশ্রুধারায়, কখন একটি মাত্র ক্ষুদ্র কথায় অর্থপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইত। সে বিকাশ সূর্য্যমুখীর বাক্পূর্ণতা অপেক্ষাও অধিকতর অর্থপূর্ণ। সূর্য্যমুখীর বাক্পূর্ণতা হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট প্রকাশিত করিত। কুন্দনন্দিনীর অবাক্স্ফূর্ত্তি হৃদয়ের আভাস মাত্র দিত।

সে হৃদয় কত গভীর, কত পূর্ণ সম্যক্ প্রকাশিত করিত না। যাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িত তাহা হৃদয়ের অস্ফুটভাব ব্যক্তি। সে ক্ষুদ্র আলোকে তাহার হৃদয়ের পূর্ণতা মাত্র দেখাইত, গভীরতার আভাস মাত্র দিত। দেখাইত, কুন্দনন্দিনীর যাহা কিছু সৌন্দর্য্য তাহা তাহার ভাবপূর্ণ সরলতাময় সুন্দর হৃদয়। সেই হৃদয়ের গভীরতা কত, সে আলোকে দেখা যাইত না। বোধ হইত সেই হৃদয়-গভীরে অনেক রত্ন নিহিত আছে।

এই পূর্ণ হৃদয়ের কি বাহ্যবিকাশ হয়? হৃদয় ফাটিয়া ইহার কিঞ্চিন্মাত্রা সময়ে সময়ে বাহিরে বহিয়া পড়ে। নীরবতা ইহার স্তম্ভিতভাব দেখায়, অশ্রুধারা ইহার কোমলতা দেখায়, এবং দুই একটি মৃদু কথা মাত্র ইহার গাম্ভীর্য্য ও সুন্দরতা দেখায়। অবাক্‌স্ফূর্ত্তি কুন্দনন্দিনীর প্রকৃতি-বিশেষ নহে, কিন্তু ইহা তাহার প্রকৃতি বিশেষের ফল। যে বাপীকূলে প্রদোষকালে একদা কুন্দনন্দিনী বসিয়া নীলপ্রভ জলরাশিতে প্রতিবিম্বিত আকাশচিত্রে জলের গাম্ভীর্য্য দেখিতেছিলেন, কুন্দনন্দিনী জানিতেন না যে, সেই স্থির নীলবর্ণ, কাল জলরাশি তাঁহার হৃদয়ের সদৃশ বলিয়াই সেখানে বসিয়া তিনি হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, হৃদয় একবার অধ্যয়ন করিলেন, সে জলে তিনি নিজে নিমজ্জিতা হইতে পারিলেন না; তাহা অপরকে নিমজ্জিতা করিতে পারিত। কুন্দনন্দিনীর হৃদয় তেমতি তরল, তেমতি পূর্ণ, তেমতি নীল, তেমতি কালিমায় সুগভীর। যে হৃদয়াকাশ ইহার উপর আসিয়া পড়িত, তাহার সুন্দর তারকাবলি ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিত, ইহার গাম্ভীর্য্য দেখাইত, ইহার কালিমা এবং তরলতা প্রকাশিত করিত। সূর্য্যমুখী সেই হৃদয়াকাশ, নগেন্দ্র সেই হৃদয়াকাশ এবং কমলমণি সেই অশেষ তারারাজিত হৃদয়াকাশ। কুন্দনন্দিনী কেবল নগেন্দ্রকেই প্রতিবিম্বিত করিয়াছিলেন এমত নহে, সূর্য্যমুখীরও বিরহে কাতরা, এবং কমলমণির সমক্ষে হৃদয় খুলিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে কমল হৃদয়ের তারারাজি ফুটিয়া ছিল বটে, কিন্তু সে আলোকে কুন্দনন্দিনীর হৃদয় আলোকিত হয় নাই, তাহার নীলিমা, গভীরতা ও তরলতাই প্রকাশ করিয়াছিল।

বঙ্গগৃহবধূ যখন অবগুণ্ঠনে নিজ মুখমণ্ডল আবরিত করিয়া রাখেন, তখন কেহই জানিতে পারেন না সেই অবগুণ্ঠন মধ্যে কি রূপরাশি লুক্কায়িত আছে। সেই অবগুণ্ঠন বিমুক্ত হইলে যখন অচিরাৎ এক অপূর্ব্ব মোহিনীমূর্ত্তি তোমার নিকট প্রকাশিত হয়; তখন দেখিয়া চমকিত হও, সে কি রূপ?—না কমলকান্তি, সেই কমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত সুন্দর, নবীন, মধুর, প্রফুল্ল অথচ সুকুমার; সেকি রূপ?—না চন্দ্রবিম্ব, সেই চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, কোমল অথচ আলোকময়; নয়ন মুদ্রিত আছে, মরিলে

সে নয়নকটাক্ষে তোমার হৃদয় এখনি অস্থির হইত, কুসুমশর কোমল কি তীক্ষ্ণ এখনি জানিতে পারিতে; অধরে বর্ণরাগ ফুটিয়াছে, যেন চুম্বনের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছে। অবগুণ্ঠনবিমুক্ত সেই রূপ-মাধুরী দেখিয়া যেমন মোহিত ও আশ্চর্য্য হইতে হয়, কুন্দনন্দিনীর হৃদয় নীরবতাব আববণ বিমুক্ত হইয়া যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আমরা তদ্রূপ মোহিত ও আশ্চর্য্য হই। আমরা এই আববণ ভেদ কবিয়া তাহার হৃদয় দেখিবাব জন্য ববাবব তাহাকে অনুসরণ করিযাছি। সেই ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা যখন মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসিয়া ছল ছল করিয়া চাহিয়া আছেন, ভাবিতেও পাবেন না যে তাহার পিতাব মৃত্যু সন্নিকট, কেন না তাহা হইলে তিনি একেবাবে নিবাশ্রযা হইবেন, মৃত্যু অঙ্কে তাহাকে শায়িত দেখিয়া ভাবিতেছেন, তিনি বুঝি আবাব নিদ্রাভিভূত হইলেন; পৃথিবীব ভাব গতিক কিছুই জানেন না। তখনকার এই সবলতা দেখিয়া ভাবিলাম, ইহা বুঝি তাহার বালস্বভাবের অনভিজ্ঞতা মাত্র। কাবণ, এই তাহাব প্রথম পরিচয়। তৎপরে যখন চাঁপা কুন্দকে সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্রের দিকে লইয়া যাইতেছেন, "আসিতে আসিতে দূর হইতে তখন নগেন্দ্রকে দেখিয়া, কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বিমূঢার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।" "দেখিল যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, নগেন্দ্র ঠিক্ সেই মূর্ত্তি। তখন তাহাকে ভয়বিহ্বলা ও সঙ্কুচিতা দেখিয়া নগেন্দ্র কুন্দকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না; কেবল বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে নগেন্দ্রেব প্রতি চাহিয়া রহিলেন।" তৎপবে তাহার অনুগমনে কলিকাতায় যাইলেন। এই নিরীহ, অশক্ত, সরল বালিকা যখন স্নেহময়ী কমলেব নিকট লেখা পড়া শিখেন তখন তিনি লেখা পড়া সুন্দর শিখিতে পারেন, "কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝেন না। বলিলে, বৃহৎ, নীল, দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের পদ্মেব মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটী চক্ষু নগেন্দ্রের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে কিছুই বলে না—নগেন্দ্র সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হন।" সে চক্ষের প্রভাব নগেন্দ্র কেন, অন্য লোককেও বিলক্ষণ অনুভব করিত। সে দৃষ্টির সরলতা, অর্থপূর্ণতা, নিরাশ্রয়ের ভাবব্যঞ্জকতা, সূর্য্যমুখীও সহস্রবাক্যে তত সুন্দর প্রকাশ কবিতে পারিতেন না। তাবাচরণ যখন এই কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আনিয়া দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। "কুন্দ তখন দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিলেন? ক্ষণকাল ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন।" তাহার

এই ব্যবহার সকলই নীরব, অথচ কত দূর ভাবব্যঞ্জক। প্রথমে তিনি থতমত খাইয়া অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় ঘোমটা দিলেন, অনন্তর কি করিবেন কিছুই জানেন না বলিয়া ক্ষণিক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। অবশেষে একদা লজ্জায়,অপমানে,আত্মতিরস্কারে হৃদয় উদ্বেলিত হইল; তখন তিনি কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। আর কোন রমণী দেবেন্দ্রের নিকট আনীত হইতে হয়তো সম্মতা হইত না। কিন্তু সরলা কুন্দ কিছুই জানেন না, তিনি জড়ের মত আনীত হইলেন, আনীত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়া পলাইয়া গেলেন। সরলা, ভাবময়ী কুন্দকে লইয়া কি কোন ক্রীড়া চলে? তাহার ভাবপূর্ণ জড়প্রায় ব্যবহার ক্রীড়ার অতীত।

ইহার পর হরিদাসী বৈষ্ণবীর অভিনয়। নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে হরিদাসী গাইতে আসিলে, শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস্ আরম্ভ করিলেন। বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিল:—

"হাঁ গা তুমি কিছু ফরমাশ করিলে না?"

"কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল,কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কানে কানে কহিল, কীর্ত্তন গায়িতে বল না?" এতক্ষণ সবাই নানাবিধ ফরমাস্ করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ চুপ করিয়াছিল। বিশেষ রূপে অনুরুদ্ধ হইলে কুন্দ আনন্দে একটু হাসিল, কিন্তু তা বলিয়া ধৃষ্টতা দেখাইয়া উত্তর করিবার লোক তিনি নহেন। তিনি এখন পূর্ণযৌবনা, বয়স ষোড়শেরও অধিক। যুবতীর কি এই ব্যবহার? যৌবনের সে চঞ্চলতা ও অধীরতা কোথায়? কুন্দের ইচ্ছা মনে মনেই বিলীন হইতেছিল। অপরে সে ইচ্ছা জানিতে চাহিলে তিনি সাহস ভরে তাহা উচ্চরবে প্রকাশ করিতেও পারেন নাই। একজন বয়স্যার কানে কানে বলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। বঙ্কিম বাবুর এই চিত্রটি কেমন স্বভাবানুরূপ, কেমন সংক্ষেপে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ। ইহা কুন্দনন্দিনী যথাযথই চিত্র বটে। কুন্দনন্দিনীর এই প্রকৃতি বিশেষ সুস্পষ্ট দেখাইবার জন্যই তিনি নানাবিধ রমণীমণ্ডলে তাহাকে আনিলেন, পরে বহুবিধ রমণীগণের সহিত তাহার প্রভেদ কি, তাহা রবির একটি মাত্র সুন্দর চিত্রলেখায় সমুদায় প্রকাশিত করিয়া দিলেন।

এতক্ষণ আমরা কুন্দনন্দিনীর প্রকৃতি বিশেষেরই পর্য্যালোচনা করিতেছি। দেখিলাম সরলতা ও বালিকাদুর্ল্লভ অচঞ্চলতা, ভীরুতা ও মৃদুতা হেতু নিশ্চেষ্টতা, বিচিত্রভাবে তাহার রমণীপ্রকৃতিতে মিশিয়াছে। মিশিয়া এক অসামান্য বিচিত্র রমণীকে প্রদর্শন করিল। এ প্রকৃতির রমণী কেবল বঙ্গধামেই পাওয়া যায়। বঙ্গরমণীর এই প্রকৃতিবিশেষের

ব্যবধানে কিরূপ কোমল হৃদয় লুক্কায়িত থাকে, তাহা বঙ্কিম বাবু এখনও প্রকাশিত করেন নাই। তিনি প্রথমে বাহ্যরেখায় এই বিচিত্র রমণীর ছায়াপাত মাত্র করিলেন; এই ছায়াপাতেই চেনা গেল কুন্দনন্দিনী কোন্ প্রকৃতির বঙ্গগৃহবধূ। তৎপরে বঙ্কিম বাবু সহসা অথচ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় আবরণ খুলিতে লাগিলেন। তখন পাঠক কুন্দের হৃদয়লাবণ্য দেখিয়া আরও চমকিত হয়েন। চমকিত হইয়া বলেন, এমন অগৌরবিণী মৃদু প্রকৃতির ভিতরে যে এমন হৃদয়মাধুরী ও সৌকুমার্য্য লুক্কায়িত থাকিবে তাহা বিচিত্র নহে। এইরূপ প্রকৃতির এইরূপ হৃদয় হওয়াই উচিত, এবং এইরূপ হৃদয়ের এইরূপ প্রকৃতিই উপযোগিনী হইয়া থাকে। আমরা পরবারে কুন্দনন্দিনীর বাহ্য ব্যবধান বিমুক্ত করিয়া তদীয় হৃদয়সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য বঙ্কিম বাবুর সহিত তাহাকে অনুসরণ করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

বাঙ্গালা ভাষা।

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালি ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লণ্ডনী ককনী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও, সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষার যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা; অপরটীর নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক্ বা

না বুঝুক আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য* গ্রন্থাদিতে সাধু ভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তক প্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল, যে যে সংস্কৃত না জানে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং সেখানে কেবল অনুস্বর বাদীদিগের এক চেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালি স্ত্রীলোক মনে করে, যে শোভা বাড়ুক না বাড়ুক ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃত প্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু, বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্য গ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা, তাঁহাদিগের বড় ঘৃণা। মদ্য, মুরগী, এবং টেকচাঁদি বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীকে আকুল

* পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইত—এখনও হইতেছে। বোধ হয় আজি কালি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে; চণ্ডীদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য, অথবা কীর্ত্তিবাসি রামায়ণ এবং বৃত্রসংহার তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এ প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহা কেবল বাঙ্গালা গদ্যসম্বন্ধেই বর্ত্তে। যাঁহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্য্যকারী। অতএব পদ্যের রীতি ভিন্ন হইলেও এই প্রবন্ধের প্রয়োজন ঘুচিল না।

করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল খাটি সংস্কৃতবাদী—যে গ্রন্থে সংস্কৃত মূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালিতে বুঝে তাহাই বাঙ্গালা ভাষা; তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায় ভুক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ে এক এক মুখ পাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্থূল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্বরূপ গ্রহণ করিলাম ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি কিছু অবিচার হয় ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত কিন্তু ইংরেজি জানেন না—পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন।* আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই সুফলে বঞ্চিত, বিচার্য্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইবে এমত বোধ হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদিগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত, স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মত গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্বরূপ ধরিতে হইল।

* যে যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে। যিনি একছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন নাই—তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বীয় প্রবন্ধ উজ্জ্বল করিতে চাহেন; যিনি এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিচার লইয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দেন। যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন নাই—তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্যন করিয়া হাড় জ্বালান। এ সকল নিতান্ত কুরুচির ফল।

তিনি আলালের ঘরের দুলাল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে "এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধগ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে কি না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয়বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়। পাঠকগণ। যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালীভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি?—বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কি না?—আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমুড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।"

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে পিতা পুত্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্ত্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয় ইহার পর শুনিব যে শিশু মাতার কাছে খাবার চাইবার সময় বলিবে, হে মাতঃ খাদ্যং দেহি মে এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে- ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া। ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না ইহা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ হয় তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জা বশতঃ দেড়গজী সমাসপরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের

মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিকবিদ্যা উপার্জ্জন করে এমত বোধ হয় না। কেন না আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে যাহা বুঝিতে না পারা যায় তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধহয় বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই, সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন যে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসংকুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অত টুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয় তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিককাল হরণ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমরা এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন যে তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটী উৎকৃষ্ট। তাঁহার মত গুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি জনৈক লিখিতে দিবেন না। ত্ব প্রত্যয়ান্ত এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ যথা একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কন্যা, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক অশ্ব ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায়

ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভাই, কাল, কান, সোণা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেক গুলিন সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন ইহা আমাদের ইচ্ছা।

শ্যামাচরণ বাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে,বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃত মূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয় যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথম শ্রেণীর শব্দসম্বন্ধে তিনি বলেন যে রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্ত্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, যথা মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, বামনের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা বলি যে এক্ষণে বামনও যেরূপ প্রচলিত ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত। পাতাও যেরূপ প্রচলিত পত্র ততদূর না হউক, প্রায় সেই রূপ প্রচলিত। ভাই যেরূপ প্রচলিত ভ্রাতা ততদূর না হউক প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তাম্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালাভাষা হইতে বহিস্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিস্কৃত করিযাই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন চাষা আছে যে ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ, বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দ গুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্যা করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাততঃ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে "খেউরি" কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে এই সেই খেউরি শব্দ। এস্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ আছে যে তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধ গম্য নহে তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিমরূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে।

যদিও আমরা এমন বলি না যে "ঘর"

প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহশব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র এবং তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেন না ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা, আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। "হে ভ্রাতঃ" বলিয়া যে ডাকে বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে, "ভাই রে" বলিয়া যে ডাকে তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দই ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই তাহার কারণ এই যে সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। "ভ্রাতৃভাব" এবং "ভাই ভাব" "ভ্রাতৃত্ব" এবং "ভাই গিরি" এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে, যে কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ অনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবু বিশেষ কিছু বলেন নাই, বলিবার প্রয়োজনও ছিল না, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। যদি কোন ধনবান্ ইংরজের অর্থ ভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া ফার্সি লেখা মোহর গুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এই পণ্ডিতেরা সেই মত মূর্খ। এই সম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবু লিখিয়াছেন,

"Purism is radically unsound, and has its origin in a spirit of narrowness. In the free com-

mingling of nations, there must be borrowing and giving. Can any thing be more absurd than to think of keeping language pure, when blood itself cannot be kept pure? No human language has ever been perfectly pure, any more than any human race has been pure. Infusion of foreign elements do, in the long run, enrich languages, just as infusion of foreign blood improves races. Seeing then that languages, as men speak them, must be mixed, impure, heterogeneous, to reject words like garib (*Ar. garib*) and dag (Ar. dag) &. from books, on account of their foreign lineage would be most unreasonable. Current words of Persian or Arabic origin connect us Hindus of Bengal with Moosalman Bengalis, with the entire Hindustani speaking population of India, and even with Persians and Arabs. Is it wise to seek to diminish points of contact with a large section of our fellow countrymen, and with kindred and neighbouring races, with whom we must have intercourse, in order that we may draw closer to our Sanskrit-speaking ancestors?

Human happiness would seem to be better promoted by increased points of contact with *living* men than by increased points of contact with remote ancestors. But men are very often swayed in these matters by sentiment more than by reason. The feeling that impels Bengali Hindus towards Sanskrit is perfectly intelligible. With Sanskrit are associated the days of India's greatest glory, with Persian and Arabic the days of her defeat, humiliation, and bondage. The budding patriotism of Hindus everywhere would therefore naturally eschew Persian and Arabic words as badges of slavery. In the long run, however, considerations of utility are sure to over-ride mere sentimental predilections.

It should be understood that I do not advocate any fresh introduction of Arabic and Persian words, but insist only on the desirability of giving their full rights to such words, as have already been naturalised in the

language and are in every body's mouth. Persian and Arabic words, those connected with law especially, used by Bengalis ignorant of those languages ought to be accepted as right good Bengali. As a matter of fact, many such words are employed in writing, but the purist spirit is still very active and a disinclination to admit such words into writing is yet but too common."

তাহার পবে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত কবাব ঔচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায় লেখকেবা ভূবি ভূবি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রেবোজনে বা নিষ্প্রযোজনে ব্যবহাব কবিযা থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহাব অভাব পূবণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ্জ কবিতে হইবে। কর্জ্জ করিতে হইলে চিবকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডাব হইতে যাহা চাও তাহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পাবে, ইংরেজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? মাধ্যাকর্ষণ বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। গ্রাবিটেশ্যন বলিলে ইংবেজী যাহারা না বুঝে, তাহাবা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ কবিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রযোজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহাব যাঁহাবা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি তাহা আমবা বুঝিতে পাবি না। এ বিষয়ে শ্যামাচবণ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

No limit is set in fact to the extent to which words are to be borrowed from Sanskrit, so that every Sanskrit word is considered to have a rightful claim to be incorporated into Bengali. Is this to enrich the language or to over burden it? This indeed is carrying us back into the past with a vengence. In the early flexible stage of Sanskrit, when its fomative powers were active, whole hosts of words were formed to express the same thing. Those words were then, as philologists hold, transparent attributive terms, and not the arbitrary symbols that they afterwards became.

Men could not, indeed, be so irrational as to invent more than one arbitrary symbol for one and the same thing. Among the many significant symbols expressive of the same idea, there was a struggle for existence and a survival, in the long run, of the fittest. More terms than one have, in many cases, survived; but on *a priori* grounds it is quite impossible that more than one could survive at the same spot, and among the same class of people. Distance of place, or peculiarities of social organization, by limiting intercourse, could alone cause a selection of different names for the same thing. There has further been a differentiation of meaning between words that originally meant exactly the same thing. Our Sanskrit school of writers would, however, undo all this. They would bring back the dead to life. They would restore to Bengali, which is one of the modern developments of Sanskrit, all the imperfections of the mother-tongue that have been cast off for good. What a terrible legacy would a wholesale appropriation of the Sanskrit vacabulary leave to posterity? Men of capacity little think of the labor that the acquisition of a language costs; and of this labor the heaviest part is that required in mastering the vocabulary, which, consisting as it does for the most part, of arbitrary symbols, is dull, dreary matter to learn. Where arbitrary symbols furnish a key to valuable knowledge, the symbols ought surely to be learnt. In the present case, however, the labors spent on the acquisition of words would be vain meaningless labor. What is the good of learning a new word where one does not learn a corresponding new idea with it? Perfection of language requires that no two words should express exactly the same idea, and that no two ideas should have the same name. No human language is indeed perfect like this it is true. But this is no reason why we should work the other way, and go on sanctioning and accumulating defects.

স্থূল কথা, সাহিত্য কিজন্য? এই

কিজন্য? যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য, অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য, তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে, যে আমার গ্রন্থ দুই চারি শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকার-কাতর-খল-স্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞান-বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই, অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে, মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ, যে কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না, যে বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমিভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমিভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমিভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমিভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয় সেখানে পবিত্রতা শূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদিভাষা, হুতোমিভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ্ কবি বর্ণস্ হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ

ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল, এবং অপরিমার্জ্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে, যে বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত, কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয় তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবুপ্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আর ও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই। নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথা গুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না, তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে। লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা, এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

রাগ নির্ণয়।

আমরা স্বরবিজ্ঞান প্রস্তাবে সঙ্গীত-শাস্ত্র অনুসারে স্বরসাধন প্রণালী সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে রাগরাগিণী সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গীত, বাদ্য, নৃত্য, এই তিনের নাম সংগীত। তন্মধ্যে গীত প্রধান। প্রথমোল্লিখিত গীত বলিতে হইলে তাহার মূল কারণ যে নাদ, তাহা না বলিলে বা না বুঝিলে গীতের ভাব ও শরীর কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই জন্য প্রথমতঃ নাদ কাহাকে বলে, সংগীত নারায়ণ তাহার নিরূপণ করিতেছেন—

তত্র প্রথমোদ্দিষ্টস্য গীতস্য বক্ষ্যমাণ স্বানাদং বিনা তদনুপপত্তেঃ প্রথমং তমেবাহ তদুক্তং—

আত্মা বিবক্ষমাণোঽয়ং মনঃ প্রেরয়তে-
মনঃ।
দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতং॥
ইত্যাদি।

শরীরসংস্থান ও শারীরিক পদার্থ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে আত্মা একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। সেই আত্মার ইচ্ছা নামক এক গুণ আছে। আত্মার সে গুণের উদ্ভব হইলে মনুষ্যের চেষ্টা জন্মে। আত্মার তাদৃশ ইচ্ছা যখন কিছু বলিবার নিমিত্ত উদ্ভব হয়, তখন, সেই ইচ্ছা প্রথমতঃ মনকে সঞ্চালিত করে, (মনের চেষ্টা হয়) মন দেহস্থ তেজকে সঞ্চালিত করে, তেজ দৈহিক বায়ুকে প্রেরণ করে। সুতরাং নাভিস্থানের আকাশে অর্থাৎ অবকাশময়স্থানে প্রাণ বায়ু ও জাঠরাগ্নির সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তত্রত্য নাড়ীকলাপ কম্পিত হইয়া কোনও না কোনও শব্দের উৎপত্তি করে। সেই উৎপন্ন শব্দটিকে নাদ বলে। ঐ নাদ কতকগুলি সূক্ষ্ম ধ্বনির সমষ্টি মাত্র। তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্ম ধ্বনি গুলির নাম শ্রুতি। শ্রুতি ২২টির অতিরিক্ত নহে।

সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, এই স্বরের উৎপত্তি, পরিমাণ, কাল প্রভৃতির জ্ঞান জন্মান শ্রুতির ফল, অর্থাৎ কার্য্য। শ্রুতি ৭টি স্বরের উপাদান কারণ যথা—

"ষড্‌জাদিক পরিজ্ঞানং শ্রুতীনাং ফল-
মেবতৎ॥"

শ্রুতি গুলি শরীরের স্থানবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই স্থান তিনটি। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু। ২২টি শ্রুতি ক্রমেই উত্তরোত্তর দ্বিগুণ করিয়া উচ্চ ভাবাপন্ন অর্থাৎ প্রথম শ্রুতি যে পরিমাণে উচ্চ, দ্বিতীয় শ্রুতি তদপেক্ষা দ্বিগুণ যথা—

শ্রুতয়ঃ স্থানসম্ভূতাঃ স্থানানি ত্রীণি ত-
ন্নহি।
হৃৎ কণ্ঠঃ শির ইত্যাসাং দ্বিগুণাদুত্তরো-
ত্তরং॥

হৃদয়, মূর্দ্ধা, ও নাভিসংলগ্ন প্রধানতঃ ২২ নাড়ী আছে। ঐ নাড়ী গুলি

কতক বক্র কতক ঊর্দ্ধভাবে আছে। এই নাড়ী গুলিই দেহযন্ত্রের তার স্বরূপ, দৈহিক বায়ুর আঘাত লাগিবামাত্র ঐ সকল নাড়ী কম্পিত হয়, তাহাতেই অতিরূপ সূক্ষ্ম স্বরাংশের উৎপত্তি হয়, তাহাই ক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া স্বররূপে নির্গত হয়। উদরকন্দর, নাড়ীপথ প্রভৃতি যে অবকাশময় স্থান শরীরাভ্যন্তরে আছে, আর পিত্ত নামক তৈজস পদার্থ শরীরে আছে, এবং শ্বাস প্রশ্বাসাদি ব্যাপার যদ্দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, সেই বায়ু, আর ঐ পদার্থত্রয়ের বশেই প্রথমতঃ নাদ (সূক্ষ্ম অবিকৃত ধ্বনি) জন্মে। পশ্চাৎ সেই নাদ ক্রমশঃ নাভির ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত হইয়া ক্রমে হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ ও গলগহ্বর দিয়া বহির্গত হয়, তখন তাহা নানাপ্রকার বিস্পষ্ট আকারে প্রকাশ পায়, যথা—

ঊর্দ্ধনাভিবালগ্না নাড্যো দ্বাবিংশতিঃ
শুভাঃ।
তাশ্চবক্রাস্তথোর্দ্ধস্থা ধ্বনিতো মরুতা-
হতাঃ॥
আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধং সমু-
চ্চরন্।
ইত্যাদি।

"যোঽয়ং ধ্বনি বিশেষস্তু স্বর বর্ণ বিভূষিতঃ। রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ
কথিতো বুধৈঃ।"

স্বর, বর্ণ ও মূর্চ্ছনাদি ভূষিত করিয়া যে ধ্বনিবিশেষ উচ্চারিত হয়, সেই ধ্বনিবিশেষ জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করে বলিয়া তাহার নাম রাগ।

এই রাগের অঙ্গ অর্থাৎ কতকগুলি প্রতিপোষক ক্রিয়া ও বস্তু আছে তাহা রাগাঙ্গ নামে বিখ্যাত। রাগাঙ্গের ন্যায় ভাষাঙ্গ, ক্রিযাঙ্গ ও উপাঙ্গ নামে আরও কতকগুলি বিষয় আছে, তাহার লক্ষণ এই—

রাগচ্ছায়ানুকারিত্বাদ্রাগাঙ্গ মিতি
কথ্যতে।

যাহা রাগের ছায়ানুযায়ী তাহাকে রাগাঙ্গ বলে।

ভাষাচ্ছায়াশ্রিতা যেন ভাষাঙ্গ স্তেন
কথ্যতে।

যেহেতু ভাষার ছায়ার আশ্রিত সেই হেতু তাহা ভাষাঙ্গ নামে কথিত হয়।

করণোৎসাহ সংযুক্তং ক্রিযাঙ্গং তেন
হেতুনা।

করণ ও উৎসাহাদি ক্রিযা গুলি যাহাতে সংযুক্ত থাকে তাহাই ক্রিয়াঙ্গ।

কিঞ্চিচ্ছায়ানুকারিত্বা দুপাঙ্গ মিতি
কথ্যতে।

কিঞ্চিৎ অর্থাৎ কোন অংশে ছায়া লাগিলে তাহা উপাঙ্গ।

এতদ্ভিন্ন কাণ্ডারণা নামক আর একটি ব্যাপার আছে সংস্কৃতে ইহার লক্ষণ এই রূপ—

কাণ্ডারণাতু কথিতা তারস্থানেষু শীঘ্রতা।
গমকৈর্ব্বিবিধৈর্য্যুক্তা কৌশলেন
বিভূষিতা॥

তারস্থানেতে শীঘ্রতা নানাবিধ গমক-

যুক্ততা, সুকৌশলস্থাপিতা হইলে তাহাকে কাওারণা বলা যায়।*

মতঙ্গমতে বাগ ৩ প্রকাব। শুদ্ধ, সালঙ্ক, এবং সঙ্কীর্ণ যথা—

শুদ্ধাশ্ছাযালগাঃ প্রোক্তা সঙ্কীর্ণাশ্চ তথৈ
বচ।

কল্লিনাথ ইহাব ব্যাখ্যা কবিযাছেন যে, শাস্ত্রোক্ত নিযমে উচ্চাবিত স্বব বক্তি-জনক হয়, এজন্য তাহা শুদ্ধ বাগ। অন্যেব ছায়াগামী হইয়াও বক্তি জন্মায সুতবাং তাহা ছায়ালগ বাগ। উভয়েব প্রাধান্যেও আনুবক্তি জন্মায সুতবাং তাহা সঙ্কীর্ণ রাগ যথা—

"তত্র শুদ্ধবাগত্বং নাম শাস্ত্রোক্ত নিযমাৎ বঞ্জকং ভবতি। ছাযালগত্বং নাম অনাচ্ছায়ালগত্বেন বক্তি হেতুত্বং ভবতি। সঙ্কীর্ণ বাগত্বং নাম শুদ্ধচ্ছাযালগমুখ্যত্বেন বক্তি-হেতুত্বং ভবতি।

বস্তুতঃ ওডব, ষাডব (খাডব) ও সম্পূর্ণ এই ত্রিবিধ নাম এক্ষণে প্রচাবিত। ৫ স্ববেব রাগ ওডব। ৬ স্ববেব রাগ ষাড়ব। ৭ স্ববেব বাগ সম্পূর্ণ। যথা—

"ওডবঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্ববৈঃ ষড্‌ভিশ্চ
ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভি জ্ঞেয এবং বাগা স্ত্রিধা
মতাঃ ॥"

অতএব ৫ স্ববের ন্যূনে বাগ নাই।

মতবিশেষে সাধাবণতঃ ২০টি বাগ প্রধান বা আদিম। শ্রী, নট্ট, বঙ্গাল, ভাস, মধ্যম, ষাডব, বক্ত হংস, কোহ্লাস প্রভব, ভৈবব, মেঘ, সোম, কামোদ, আম, পঞ্চম, কন্দর্প, দেশ, ককুভা, কৌশিক, নট্ট নাবায়ণ। যথা—

"শ্রীবাগনট্টৌ বঙ্গালৌ ভাষ মধ্যম
ষাডবৌ।
বক্তহংসশ্চ কোহ্লাসঃ প্রভবোভৈববো
ধ্বনিঃ।
মেঘবাগঃ সোমরাগ কামোদৌচাম্র পঞ্চমঃ।
স্যাতাং কন্দর্প দেশাখ্যৌ বাকুভাস্তশ্চ
কৌশিকঃ।
নট্টনাবাযণশ্চেতি বাগা বিংশতি রী
বিতাঃ ॥"

প্রাচীনমতেব প্রধান ছয বাগ। শ্রী-বাগ (১) বসন্ত (২) ভৈবব (৩) পঞ্চম (৪) মেঘবাগ (৫) বৃহন্নট (৬। পুরুষ জাতীয বলিয়া বর্ণিত আছে, যথা—

শ্রীবাগোহথ বসন্তশ্চ ভৈববঃ পঞ্চম স্তথা।
মেঘবাগো বৃহন্নটঃ যডেতে পুরুষাহ্বয়ঃ।

রাগিণী অর্থাৎ বাগভার্যা। বাগেব অনুগত, স্ত্রীভাবান্বিত ও স্ত্রীজাতিব ন্যায কোমলা বলিযাই বাগভার্যা বা রাগিণী নাম দেওয়া হইযাছে। তদ্ভিন্ন রাগ না-

* এই কাওাবণা নামক গানাঙ্গটি অতি পুবাতন কালে ছিলনা বলিযাই বোধ হয়। কেন না সংগীতেব অংশবোধক যত শব্দ (প্রাচীন) পাওয়া যায় তন্মধ্যে এই শব্দ বা এতদর্থের অন্য কোন শব্দ পাওযা যাযনা। ইহাতে বোধহয় ইহা সংগীতরত্নাকরাদি গ্রন্থোৎপত্তিব কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। মুসলমানেরা এই কাওারণাকে বড় ভাল বাসেন।

মক কোন প্রাণী নাই সুতরাং তাহার পত্নীও নাই।

" মালশ্রী ত্রিবলী গৌরী কেদারী মধু
মাধবী।
ততঃ পাহাড়িকা জ্ঞেয়া শ্রীরাগস্য বরা-
ঙ্গণা ॥"

মালশ্রী, ত্রিবেণী বা ত্রিবনী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পাহাড়িকা,—ইহারা শ্রীরাগের ভার্য্যা।

" দেশী দেবগিরী চৈব বরাটী তোড়িকা
তথা।
ললিতা চাহথ হিন্দোলী বসন্তস্য বরা-
ঙ্গণা ॥"

দেশী, দেবগিরী, বরাটী, তোড়ী, ললিতা, হিন্দোলী,—ইহারা বসন্তরাগের ভার্য্যা।

ভৈরবী গুর্জ্জরী রামকিরী গুণকিরী তথা।
বাঙ্গালী সৈন্ধবী চৈব ভৈরবস্য
বরাঙ্গণা ॥"

ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামকিরী, গুণকিরী, বাঙ্গালী, সৈন্ধবী,—ইহারা ভৈরব রাগের স্ত্রী।

"বিভাষীচাথ ভূপালী কর্ণাটী বড় হং-
সিকা।
ভালবী (বা মালবী) পটমঞ্জর্য্যা সহৈতাঃ
পঞ্চমাঙ্গনাঃ ॥"

বিভাষী, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, (বড়ারী) ভালবী, (বা মালবী) পটমঞ্জরী, ইহারা পঞ্চম রাগের স্ত্রী।

" মল্লারী সৌরটী চৈব সাবেরী কৌশিকী
তথা।
গান্ধারী হরশৃঙ্গারী মেঘরাগস্য যো-
ষিতঃ ॥"

মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারী, ইহারা মেঘের ভার্য্যা।

"কামোদা চৈব কল্যাণী আভীরী নাটিকা
তথা।
সারঙ্গী নট্টহম্বীরা নট্টনারায়ণাঙ্গনা ॥"

কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী, নট্টহম্বীরা,—ইহারা—নট্টনারায়ণের স্ত্রী।

এই ৩৬ রাগিণী।*

শ্রীরামদাস সেন।

---

* ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহা এই। মতবিশেষে ইহার অন্যথাও দৃষ্ট হয়। ফল, প্রথমে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীই নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু পরভাবী সঙ্গীতাচার্য্যেরা অনেক বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে অসংখ্য রাগ রাগিণী হইয়াছে।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সুশিক্ষিত চরিত। কলিকাতা ১২৮৫।

আজি কালি বাঙ্গালা দেশে শিরোরোগ কিছু প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পীড়িতেরা পূর্ব্বে আঁচড়াইত, কামড়াইত, নাচিত, গায়িত। আধুনিক বাঙ্গালাসাহিত্য দেখিয়া বোধ হয় অনেক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির সে সকল লক্ষণের পরিবর্ত্তে পুস্তক প্রণয়নই রোগের লক্ষণ দাঁড়াইয়াছে। আমরা সুশিক্ষিতচরিত পড়িয়া, কি বলিব ভাবিয়াই স্থির করিতে পারি নাই। প্রথম, টাইটেল পেজে দেখিলাম "পাবনান্তর্গত মালঞ্চীনিবাসীনাম্ শ্রীমধুসূদন সরকারস্য প্রণীত প্রকাশিতঞ্চ।" পড়িয়া আমরা কিছুক্ষণ ভাবিলাম যে শ্রীমধুসূদন সরকার মহাশয় একব্যক্তি না বহুব্যক্তি? "নিবাসীনাম্" দেখিয়া স্থির করিলাম যে তিনি একব্যক্তি নয়—বহুব্যক্তি। তার পর দেখি—"সরকারস্য।" তবে ত তিনি একব্যক্তি বটে। ইহার এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম—বুঝিলাম যে তিনি একাই এক সহস্র। কিন্তু "সরকারস্য প্রণীতং" যে কি সামগ্রী তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। "সরকারেণ প্রণীতং" অর্থ লোকে জানে—কিন্তু "সরকারস্য প্রণীতং" সামগ্রীটা কি? আমরাও একটু সংস্কেকৃড়ি ঝাড়িব। আমাদিগের পরামর্শ শ্রীমধুসূদন সরকার মহাশয়ং একটু একটুং মধ্যমনারায়ণ তৈলং সেবনং করিবেনং।

এই ত গেল টাইটেল পেজ। তার পর বিজ্ঞাপন। সে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। উদ্ধৃত না করিলে তাহার মহিমা কেহ বুঝিতে পারিবেন না—

"সম্প্রতি সুশিক্ষিত চরিত এবং সৌদামিনী প্রণয়িনী বিরহতাপ।

এই দুইখান পুস্তক মুদ্রাঙ্কন হইল। অতিশীঘ্র জ্ঞানতরঙ্গিণী নাম্নী একখান পুস্তক মুদ্রাঙ্কন হইবে। ভো ভো পণ্ডিতপ্রবরগণ এই সুশিক্ষিত চরিত একরূপ বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকখান বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করিলে আমি ক্রমশঃ নানাবিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন করিব। এই কয়েকখান গ্রন্থের আবশ্যক হইলে জেলা পাবনার অন্তর্গত মালঞ্চী গ্রামে আমার নিকট পত্র প্রেরণ করিলে অনায়াসে পাইতে পারিবেন।"

এই সুশিক্ষিত চরিত একরূপ বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী, তাহার সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে গঞ্জিকালয় এবং শুণ্ডিকালয় বলিয়া যে সকল চতুষ্পাঠী আছে,

সেই সকল মহাবিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ বড়ই আদৃত হইবে। গ্রন্থকার ভয় দেখাই-য়াছেন যে ক্রমশঃ নানাবিধ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন করিবেন। আমরা ভয় পাই না। আ-মরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তিনি যত গ্রন্থ লিখিবেন, সকলই গঙ্গিকাস্রোতে চলিতে পারিবে।

বিজ্ঞাপনের পর একটী সংস্কৃত শ্লোক। মধুসূদনসরকারি সংস্কৃত; তার পর আবার অন্যার্থঃ, তার পর হঠাৎ "অন্নদা সতী অমিত্রাক্ষর প্রবন্ধ।" কবিত্ব, প্রথমের দুই চারি ছত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

"হে মাত ভুবনময়ী জীবনদায়িনী,
তব গুণচয় স্মরি ক্ষুধার্ত্ত জঠর॥"

পড়িয়াই বুঝা গেল, শ্রীমধুসূদন সর-কারস্য ক্ষুধা পাইয়াছে, মাত ভুবন-ময়ীকে ভক্ষণ করিবেন। তার পরেই

"শীতলিল পুলকিল তনু মন প্রাণ।
শিহরিল তনু রোম ভরিল জঠর॥"

দেখা যাইতেছে ক্ষুধা পাইবামাত্রেই সরকার মহাশয় ভুবনময়ীকে ভোজন করিয়াছেন। নহিলে তখনি জঠর ভরিবে কেন।

এই সুশিক্ষিত-চরিত এইরূপ আগা গোড়া পাগলামি। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা এবং কদর্য্য রুচির পরিচয়। বাস্তবিক এই গ্রন্থ সমালোচন করিয়া আমরা বঙ্গ-দর্শন কলুষিত করিতাম না। সমা-লোচন করার উদ্দেশ্য এই যে আমরা পাঠককে দেখাইলাম যে যাহারা আদৌ পাঠশালায় যায় নাই, তাহারাও এক্ষণে গ্রন্থ লিখিতেছে। ইহার পর আর বাঙ্গালাসাহিত্যের শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে। নহিলে মধুসূদন সরকারস্য পৃষ্ঠ-দেশ বঙ্গদর্শনের বেত্রাঘাতের যোগ্য নহে।

নলিনী। অধরলাল সেন বিরচিত।

এই নব্য গ্রন্থকার ললিতা সুন্দরী প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করিয়া-ছেন। ইনি সুইবার্ণের উপাসক। ইহার কবিতা সুমধুর। অনেক স্থলে কবিত্বের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ—কিন্তু বড় একঘেয়ে। কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"চিরিয়ে তরুণ বুক তরল শোণিতে
মদিরা, করিয়ে, প্রিয়ে, দিতাম তোমারে;
সাধের বাসনা গুলে' অতুল অমৃতে
জুড়াতেম তো'রে ভালবাসিলে আমারে।
ভালবাসা দিলে
সুখেতে রাখিতে, প্রিয়ে, সুখেতে থাকিতে—
দুই দেহে একচিতে, একদেহ দুই চিতে,
দুলিতে কুসুমলতা আনন্দ অনিলে,
শুধু ভালবাসা দিলে।

বসন্তে বাতাস নাই, নাহিক কোকিল,
শরদে শশাঙ্ক নাই, নাহিক নীরদ,
জগতে মানুষ নাই, নাহিক অনিল,
যৌবনে প্রণয় নাই, নাহিক সুখদ।
কাতর হৃদয়
ফিরে ফিরে চেয়ে দেখে, কোথা ভালবাসা
কোথা মনমের আশা, অমিয় সাগরে ভাসা

এই কি রে সেই নয় চন্দ্রমা উদয়?
সেই ভালবাসা নয়?
আন আশারজ্জু কর হৃদয় মন্থন,
অমৃত-সাগরে হ'ক গরল-উদ্ভব,
আগুন বিরাগে মিশে যা'ক ত্রিভুবন,
জ্ব'লে যা'ক পুড়ে যা'ক, ছার হ'ক সব।
তবু নাহি পা'বে—
ভালবাসা, সুখ আশা পাইবার নয়।
রূপ নাই, শব্দ নাই, সুখ নাই, আশাময়,
খুঁজে খুঁজিয়ে শুধু হৃদয়ে হারা'বে,
কেন হৃদয়ে জ্বালা'বে ?"

টক্‌সিকোলজিকাল চার্ট। অর্থাৎ ধাতুঘটিত, ঔদ্ভিদিক, ও প্রাণিঘটিত বিষ খাইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং নিশ্বাস বন্ধ (জলে ডুবা, প্রাণনাশক বায়ু দ্বারা শ্বাসরোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাস-বিহীন সদ্যপ্রসূত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম বা লু) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা। কলিকাতা মেডি-কাল কালেজের গ্রাজুয়েট শ্রীহরিশচন্দ্র শর্ম্মা কৃত।

ইহা গৃহীগণের পক্ষে নিতান্ত প্রযো-জনীয়। আমরা ইহা হইতে জলে ডুবার চিকিৎসা উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন।

"জল যে প্রকার অগ্নিনির্ব্বাণ করে, সেই প্রকার প্রাণও নষ্ট করে। বায়ু বন্ধ হয় বলিয়াই জলে ডুবিলে জীবের প্রাণ সংশয় হয়। রোগীকে জল হইতে তুলিয়া যাহাতে বায়ু গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ যাহাতে তাহার ফুস্ ফুস্ মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে এ প্রকার উপায় অব-লম্বন করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত শরীরে উষ্ণতা থাকে এবং অঙ্গ প্রত্য-ঙ্গাদি শিথিল থাকে সে পর্য্যন্ত ফুস্ ফুস্ মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবে। সমস্ত জল মুখ দিয়া বাহির করিবে। মুখের লালা বাহির করিবে। পরে পিঠে এবং গলায় চাপ দিবে। দুই নাক বন্ধ করিবে। এবং মুখে মুখ লাগাইয়া ফুঁ দিবে যদি কামারের জাঁতা পাওয়া যায় তবে মুখ এবং এক নাক বন্ধ করিয়া এক নাকের মধ্যে জাঁতার নল প্রবেশ করাইয়া বাতাস দিবে। পরে জাঁতার নল খুলিয়া সে নাক বন্ধ করিয়া অপর নাকের মধ্যে জাঁতার নল প্রবেশ করাইয়া বাতাস দিবে পিঠ এবং গলার বায়ুনালী আস্তে আস্তে চাপিতে থাকিবে।

ফুস্ফুস্ বায়ুতে পরিপূর্ণ হইলে বুকের উপরে চাপিয়া কতক বায়ু বুক হইতে বাহির করিয়া দিবে। পুনর্ব্বার ফুস্ফুস্ পূর্ব্বমত বায়ু পরিপূর্ণ করিবে, এবং পরে পূর্ব্বমত বুক চাপিয়া বায়ু বাহির করিয়া দিবে, ইহাতে স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস অনুকরণ করা হয়। রোগীকে বার আনা উপুড় করিয়া শয়ন করাইবে। পরে চিত করিয়া শয়ন করাইবে। এই প্রকার এক মিনিটে ২০বার করিবে। কিম্বা মস্তকের উপরে দুই হাত তুলিবে।

পরে দুই হাত এক স্থানে সংলগ্ন হইলে নিচে নামাইবে, বুকের উপর নিয়ম মত চাপিবে। এ প্রকার এক মিনিটে ২০ বার করিবে। ইহাতে স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস অনুকরণ করা হইবে। গলায় কোন বন্ধনি থাকিলে তাহা তফাৎ করিবে। ভিজা কাপড় ছাড়াও, গা পুঁছিয়া দাও, গাযে উত্তাপ দিয়া গা গরম কর। স্থানান্তরে লইতে হইলে তক্তপোষের উপরে মাথা উচ্চ করিয়া লইয়া যাইবে। বায়ুনালী অবরুদ্ধ হইলে নল চালাইয়া ফুস্ফুসে বাযু প্রবেশ করাইবে। অম্লজান বায়ু অর্থাৎ অক্সিজেন্ গ্যাস প্রবেশ করাইতে পারিলে ভাল হয়।

উত্তেজক ঔষধ সেবন বিধেয়। গিলিতে না পারিলে নল দ্বারা ঔষধ দিবে। রাইচূর্ণ, লবণ বা ব্রাণ্ডী জলে মিশাইয়া পিচকারী দিবে। বুকের দক্ষিণে রক্তভার করিলে সাবধান পূর্ব্বক রক্ত মোক্ষণে উপকার হইবে। কিন্তু এদেশের লোকের পক্ষে রক্তমোক্ষণ প্রায় সততই অপকারী হয়। গ্যাল্‌ভ্যানিক্ ব্যাটারি দ্বারা তাড়িতশক্তি বুকে চালাইবে। কোন উপায়ে ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করাইতে না পারিলে ট্রেকিয়া অর্থাৎ বায়ুনালীর নিচে কাটিয়া দিবে। ইহাতে চিকিৎসকের আবশ্যক।"

এই চার্ট সকলের ঘরে ঝুলান থাকা উচিত। ইহা কাপড় মোড়া ও কাটের ফ্রেম দেওয়া পাওয়া যায়। মূল্য ১।৷০ টাকা মাত্র।

বঙ্গদর্শন।

ষষ্ঠ বৎসর।

রাজসিংহ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মানিকলাল তখনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মানিকলাল দেখিল যে বাজার অত্যন্ত শোভাময়। দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে—নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুলিত করিতেছে—পুষ্প, পুষ্পমালা, থরে থরে নয়নরঞ্জিত, এবং ঘ্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড় সের জল খাইল। এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া তাম্বুলের দোকানে তাম্বুলান্বেষণে গেল। দেখিল একটা পানের দোকানে বড় জাঁক। দেখিল দোকানে বহুসংখ্যক দীপ বিচিত্র ফানুসমধ্য হইতে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে নানা বর্ণের কাগজ মোড়া—নানা প্রকার বাহারের ছবি লট্‌কান—তবে চিত্রগুলি একটু বেশীমাত্রায় রঙ্গদার। মধ্য স্থানে কোমল গালিচায় বসিয়া—দোকানের অধিকারিণী তাম্বুলবিক্রেত্রী—বয়সে ত্রিশের উপর, কিন্তু কুরূপা নহে। বর্ণ গৌর; চক্ষু বড় বড়, চাহনি বড় কোমল, হাসি বড় রঙ্গদার—সে হাসি অনিন্দ্য দন্তশ্রেণী মধ্যে সর্ব্বদাই খেলিতেছে—হাসির সঙ্গে সর্ব্বালঙ্কার দুলিতেছে—অলঙ্কার কতক পিতল কতক সোনা—কিন্তু সুগঠন এবং সুশোভন। মাণিকলাল, দেখিয়া শুনিয়া, পান চাহিল।

পানওয়ালী স্বয়ং পান বেচে না—সম্মুখে একজন দাসীতে পান সাজিতেছে

ও বেচিতেছে—পানওয়ালী কেবল পয়সা কুড়াইতেছে—এবং মিষ্ট হাসিতেছে।

দাসী একজন পান সাজিয়া দিল, মাণিকলাল ডবল দাম দিল। আবার পান চাহিল। যতক্ষণ পান সাজা হইতেছিল, ততক্ষণ মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া দুই একটা মিষ্ট কথা কহিতে লাগিল; পানওয়ালীর রূপের প্রশংসা করিলে, পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এ জন্য প্রথমে তাহার দোকান সজ্জা ও অলঙ্কার গুলির প্রশংসা করিতে লাগিল। পানওয়ালীও একটু ভিজিল। পানওয়ালী মিঠে পানের সঙ্গে মিঠে কথা বেচিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল তখন দোকানে উঠিয়া বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর হুঁকা কাড়িয়া লইয়া, টানিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে মাণিকলাল পান খাইয়া দোকানের মশালা ফুরাইয়া দিল। দাসী মশালা আনিতে অন্য দোকানে গেল। সেই অবসরে মাণিকলাল পানওয়ালীকে বলিল, "বিবি সাহেব! তুমি বড় চতুরা। আমি একটি চতুরা স্ত্রীলোক খুঁজিতেছিলাম। আমার একটি দুষমন্ আছে—তাহাকে একটু জব্দ করিব ইচ্ছা। কি করিতে হইবে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তুমি যদি আমার সহায়তা কর, তবে এক আশরফি পুরস্কার করিব।

পান। কি করিতে হইবে।

মাণিক চুপি চুপি কি বলিল। পানওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়া—তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বলিল আশরফির প্রয়োজন নাই—রঙ্গই আমার পুরস্কার।

মাণিকলাল তখন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল, দাসী তাহা নিকটস্থ বেণিয়ার দোকান হইতে আনিয়া দিল। পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক পত্র লিখিল,

"হে প্রাণনাথ। তুমি যখন নগর ভ্রমণে আসিয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমার একবার দেখা না পাইলে আমার প্রাণ যাইবে। শুনিতেছি তোমরা কাল চলিয়া যাইবে—অতএব আজ একবার অবশ্য অবশ্য আমায় দেখা দিবে। নহিলে আমি গলায় ছুরি দিব। যে পত্র লইয়া যাইতেছে—তাহার সঙ্গে আসিও—সে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে।"

পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, "মহম্মদ খাঁ।"

পানওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল "কে ও ব্যক্তি?"

মা। একজন মোগল সওয়ার।

বাস্তবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে একজনকেও চিনিত না। কিন্তু অভিপ্রায়, এই পত্রে লুব্ধ করিয়া কোন একজন মোগলের নিকট হইতে তাহার অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবে। কিন্তু নিজ নাম শিরোনামায় না দেখিলে কোন মোগলই ফাঁদে যে পা দিবে না, তাহা মাণিক বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। অথচ কাহারও

নাম জানে না। সে মনে ভাবিল, তুই হাজার মোগলের মধ্যে অবশ্য একজন মহম্মদ আছেই আছে—আর সকল মোগলই "খাঁ"। অতএব সাহস করিয়া "মহম্মদ খাঁ" লিখিল; পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল বলিল, "তাহাকে এইখানে আনিব।"

পানওয়ালী বলিল, "এ ঘরে হইবে না। আর একটা ঘরভাড়া লইতে হইবে।"

তখনই তুইজনে বাজারে গিয়া আর একটা ঘর লইল। পানওয়ালী মোগলের অভ্যর্থনা জন্য তাহা সজ্জিতকরণে প্রস্তুত হইল—মাণিকলাল পত্র লইয়া মুসলমান শিবিরে উপস্থিত হইল। শিবিরমধ্যে মহাগোলযোগ—কোন শৃঙ্খলা নাই—নিয়ম নাই। তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া গিয়াছে—রঙ্গ তামাসা রোশনাই-য়ের ধূম লাগিয়াছে। মাণিকলাল মোগল দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, "মহম্মদ খাঁ কে মহাশয়? তাঁহার নামে পত্র আছে।" কেহ উত্তর দেয় না—কেহ গালি দেয়,—কেহ বলে চিনি না—কেহ বলে খুঁজিয়া লও। শেষ একজন মোগল বলিল, "মহম্মদ খাঁকে চিনি না, কিন্তু আমার নাম নুর মহম্মদ খাঁ। পত্র দেখি—দেখিলে বুঝিতে পারিব পত্র আমার কি না?"

মাণিকলাল আনন্দচিত্তে তাহার হস্তে পত্র দিল—মনে জানে, মোগল যেই হউক, ফাঁদে পড়িবে। মোগলও ভাবিল পত্র যারই হউক, আমি কেন এই সুবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আসি না। প্রকাশ্যে বলিল, হাঁ পত্র আমারই বটে। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। এই বলিয়া মোগল তাম্বু মধ্যে প্রবেশ করিয়া চুল আঁচড়াইয়া গন্ধ দ্রব্য মাখিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"ওরে ভৃত্য, সে স্থান কতদূর!"

মাণিকলাল যোড়হাত করিয়া বলিল "হুজুর, অনেক দূর। ঘোড়ায় গেলে ভাল হইত।"

"বহুত আচ্ছা" বলিয়া খাঁ সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে যান, এমত সময়ে মাণিকলাল আবার যোড়হাত করিয়া বলিল,

"হুজুর! বড় ঘরের কথা—হাতিয়ার বন্ধ হইয়া গেলেই ভাল হয়।"

নূতন নাগর ভাবিলেন, সে ভাল কথা—জঙ্গী জোয়ান আমি; হাতিয়ার ছাড়া কেন যাইব। তখন অঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মাণিক-লাল বলিল, "এই স্থানে উতারিতে হইবে। আমি আপনার ঘোড়া ধরি-তেছি, আপনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করুন।"

খাঁ সাহাব নামিলেন—মাণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল। খাঁ বাহাদুর সশস্ত্রে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে হাতিয়ার বন্ধ হইয়া রমণী সম্ভাষণে যাওয়া বড় ভাল দেখায়

না। ফিরিয়া আসিয়া মাণিকলালের কাছে অস্ত্র গুলিও রাখিয়া গেলেন। মাণিকলালের আরও সুবিধা হইল।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাঁ সাহেব দেখিলেন, যে তক্তপোষের উপর উত্তম শয্যা; তাহার উপর সুন্দরী বসিয়া আছে—আতর গোলাবের সৌগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে—চারি দিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে। এবং সম্মুখে আলবোলায় সুগন্ধি তামাকু প্রস্তুত আছে।—খাঁ সাহেব, জুতা খুলিয়া, তক্তপোষে বসিলেন, বিবিকে মিষ্ট বচনে সম্ভাষণ করিলেন—পরে পোষাকটি খুলিয়া রাখিয়া, ফুলের পাখা হাতে লইয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং আলবোলার নল মুখে পুরিয়া সুখের আবেশে টান দিতে লাগিলেন। বিবিও তাঁহাকে দুই চারিটা গাঢ় প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত করিল।

অর্দ্ধদণ্ড হইতে না হইতে মাণিকলাল আসিয়া দ্বারে ঘা মারিল। বিবি বলিল, "কেও?"

মাণিকলাল বিকৃত স্বরে বলিল, "আমি।"

তখন চতুরা রমণী অতি ভীতকণ্ঠে খাঁ সাহেবকে বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আমার স্বামী আসিয়াছেন—মনে করিয়াছিলাম—তিনি আজ আর আসিবেন না। তুমি এই তক্তপোষের নীচে একবার লুকাও। আমি উহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

মোগল বলিল, "সেকি? মরদ হইয়া ভয়ে লুকাইব? যে হয় আসুক না; এখনই কোতল করিব।"

পানওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, "সে কি সর্ব্বনাশ! আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়া আমার অন্নবস্ত্রের পথ বন্ধ করিবে? এই কি তোমাকে ভালবাসার ফল? শীঘ্র তক্তপোষের নীচে যাও। আমি এখনই উহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

এ দিকে মাণিকলাল পুনঃ পুনঃ দ্বারে ঘাত করিতেছিল। অগত্যা খাঁ .. তক্তপোষের নীচে গেলেন। মোটা শরীর বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল—কি করে—প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়। সে স্থূল মাংসপিণ্ড তক্তপোষ তলে বিন্যস্ত হইলে পর পানওয়ালী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে পানওয়ালী পূর্ব্ব শিক্ষামত বলিল, "তুমি আবার এলে যে? আজ আর আসিবে না বলিয়াছিলে যে?"

মাণিকলাল পূর্ব্বমত বিকৃতস্বরে বলিল, "চাবিটা ফেলিয়া গিয়াছি।"

দুই জনে চাবি খোঁজার ছল করিয়া, খাঁ সাহেবের পরিত্যক্ত পোষাকটি হস্তে লইল। পোষাক লইয়া দুই জনে বাহিরে চলিয়া আসিয়া, শিকল টানিয়া বাহির হইতে চাবি দিল। খাঁ সাহেব

তখন তক্তপোষের নীচে, মূষিকদিগের দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন।

তাঁহাকে গৃহ পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া, মাণিকলাল তাঁহার পোষাক পরিল। পরে তাঁহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হইয়া মুসলমান শিবিরে তাঁহার স্থান লইতে চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে মোগল সৈন্য সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহ দ্বার হইতে, উষ্ণীষ কবচ শোভিত, গুম্ফ শ্মশ্রু সমন্বিত, অস্ত্র সজ্জাভীষণ, অশ্বারোহীর দল সারি দিল। পাঁচ পাঁচ জন অশ্বারোহী এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার পর আবার সারি, সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে, ভ্রমর শ্রেণী সমাকুল ফুল্লকমল তুল্য তাহাদের বদন মণ্ডল সকল শোভিতেছিল। তাহাদিগের অশ্বশ্রেণী গ্রীবাভঙ্গে সুন্দর, বল্‌গা বোধে অধীর, মন্দগমনে ক্রীড়াশীল; অশ্বশ্রেণী, তাহাদিগের শরীর ভরে হেলিতেছে, দুলিতেছে, এবং নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে।

চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল। চঞ্চল বলিল, "ফুলের মালা পরাও সখি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।" প্রবলবেগে প্রবহমান চক্ষের জল, চক্ষুঃপ্রান্তে ফেরৎ পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল, "রত্নালঙ্কার পরাই সখি তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।" চঞ্চল "বলিল পরাও। পরাও! নির্ম্মল! কুৎসিত হইয়া কেন মরিব? রাজার মেয়ে আমি; রাজার মেয়ের মত সুন্দর হইয়া মরিব। সৌন্দর্য্যের মত কোন রাজ্য? রাজত্ব কি বিনা সৌন্দর্য্যে শোভা পায়? পরা।" নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল, সে কুসুমিত তরুবিনিন্দিত কান্তি দেখিয়া কাঁদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন, নির্ম্মলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চল তার পর বলিল, "নির্ম্মল! আর তোমায় দেখিব না। কেন বিধাতা এমন বিড়ম্বনা করিলেন! দেখ ক্ষুদ্র কাঁটার গাছ যেখানে জন্মে সেইখানে থাকে; আমি কেন রূপনগরে থাকিতে পাইলাম না?"

নির্ম্মল বলিল, "আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক; আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা হইবে না; তোমায় না দেখিলে আমার মরা হইবে না।"

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব।

নির্ম্মল। দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে।

চঞ্চল। সে কি নির্ম্মল? কি প্রকারে তুমি যাইবে?

নির্ম্মল কিছু বলিল না। চঞ্চলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চলকুমারী বেশভূষা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে গেলেন। নিত্য

ব্রত শিবপূজা ভক্তিভাবে করিলেন। পূজান্তে বলিলেন, "দেব দেব মহাদেব! মরিতে চলিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বালিকার মরণে তোমার এত তুষ্টি কেন? প্রভো! আমি বাঁচিলে কি তোমার সৃষ্টি চলিত না? যদি এতই মনে ছিল, কেন আমাকে রাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে?"

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্চলকুমারী মাতৃচরণ বন্দনা করিতে গেলেন। মাতাকে প্রণাম করিবা চঞ্চল কতই কাঁদিল! পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিল। পিতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল! তার পর একে একে সখীজনের কাছে, চঞ্চল বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে কাঁদিয়া গণ্ডগোল করিল। চঞ্চল কাহাকে অলঙ্কার, কাহাকে খেলেনা, কাহাকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না; আমি আবার আসিব। কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না; দেখিতেছ না, আমি পৃথিবীশ্বরী হইতে যাইতেছি?" কাহাকেও বলিলেন, "কাঁদিও না—কাঁদিলে যদি দুঃখ যাইত; তবে আমি কাঁদিয়া রূপনগরের পাহাড় ভাসাইতাম।"

সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া, চঞ্চলকুমারী শিবিকারোহণে চলিলেন। এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য শিবিকার অগ্রে স্থাপিত হইয়াছে; এক সহস্র পশ্চাতে। রজতমণ্ডিত, রত্নখচিত সে শিবিকা, বিচিত্র স্বর্ণ খচিত বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে; আশা সোঁটা লইয়া চোপদার বাক্‌জালে গ্রাম্যদর্শকবর্গকে কৌতুহলী করিতেছে। চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলেন। দুর্গমধ্য হইতে শঙ্খ নিনাদিত হইল, কুসুম ও লাজাবলিতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল; সেনাপতি চলিবার আজ্ঞা দিলেন; তখন অকস্মাৎ মুক্তপথ তড়াগের জলের ন্যায় সেই অশ্বারোহী শ্রেণী প্রবাহিত হইল, বল্‌গা দংশিত করিয়া, নাচিতে নাচিতে, অশ্বশ্রেণী চলিল—অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বাজিল।

অশ্বারোহীগণ প্রভাত বায়ু প্রফুল্ল হইয়া কেহ কেহ গান করিতেছিল। শিবিকার পশ্চাতেই যে অশ্বারোহীগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবর্ত্তী একজন গায়িতেছিল—যাহা গায়িতেছিল, তাহার অনুবাদ যথা—

যারে ভাবি দূরে সে যে সতত নিকটে।
প্রাণ গেলে তবু সে যে রাখিবে শঙ্কটে॥

রাজকুমারীর কর্ণে সে গীত প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, "হায়! যদি শিপাহীর গীত সত্য হইত।" রাজকুমারী তখন, রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। তিনি জানিতেন না, যে আঙ্গুল কাটা মাণিকলাল তাঁহার পশ্চাতে এই গীত গাইতেছিল। মাণিকলাল, যত্ন করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে নির্ম্মল কুমারীব বড় গোলমাল বাঁধিল। চঞ্চল ত বত্নখচিত শিবিকারোহণে চলিয়া গেল—আগে পিছে দুই সহস্র কুমাবপ্রতিম অশ্বারোহী আল্লাব মহিমাব শব্দে রূপনগরেব পাহাড় ধ্বনিত কবিয়া চলিল। কিন্তু নির্ম্মলেব কান্না ত থামে না—একা—একা—একা—শত পৌরজনেব মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্ম্মল বড়ই একা। নির্ম্মল উচ্চ গৃহচূডাব উপবি উঠিয়া দেখিতে লাগিল—দেখিতে লাগিল ক্রোশ পবিমিত অজগব সর্পেব ন্যায় সেই বৃহৎ অশ্বারোহী সৈনিকশ্রেণী পার্ব্বত্যপথে বিসর্পিত হইবা উঠিতেছে, নামিতেছে—প্রভাত সূর্য্যকিবণে তাহাদিগেব উর্দ্ধোত্থিত উজ্জ্বল বর্ষাফলক সকল জ্বলিতেছে। কতক্ষণ নির্ম্মল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখন নির্ম্মল চক্ষু মুছিয়া, ছাদের উপব হইতে নামিল। নির্ম্মল একটা কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়াছিল। নামিয়া প্রথমে একজন সামান্যা পবিচাবিকার জীর্ণ মলিনবাস চুবি করিল—তাহার বিনিময়ে আপনাব চারুদর্শন পবিধেয় রাখিযা আসিল। নির্ম্মল সেই জীর্ণ মলিন বাস পারিল।—অলঙ্কার সকল খুলিয়া কোথায লুকাইয়া বাখিল, কেহ দেখিতে পাইল না। সঞ্চিত অর্থ মধ্যে কতিপয় মুদ্রা নির্ম্মল গোপনে সংগ্রহ কবিল। কেবল তাহাই লইয়া সেই জীর্ণ মলিনবাসে নির্ম্মল একাকিনী রাজপুবী হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। পরে দ্রুতপদে অশ্বারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে সেই পথে একাকিনী তাহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।

তর্কসংগ্রহ।

কারণ ভেদ।

আমবা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে এক একটি কার্য্যের পূর্ব্বে যে এক একটি বস্তু থাকিবে তাহার কোন নিয়ম নাই। সর্ব্বত্রই প্রায় অনেকগুলি বস্তু পূর্ব্বে মিলিত হইয়া একটি কার্য্য উৎপাদন করে। যেমন একটি ঘটোৎপত্তির প্রতি মৃত্তিকা, জল, চক্রদণ্ড, সূত্র ও কুম্ভকারের যত্ন এই সকলেরই পূর্ব্বে থাকা নিতান্ত আবশ্যক, ইহাদেব মধ্যে একটির অভাব হইলে কখনই ঘট হয় না অতএব ইহারা সকলেই ঘটেব কাবণ। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে ইহারা সকলে ঘটের কারণ হইলেও ইহাদের সকলের সহিত কি ঘটের সমান সম্বন্ধ? মৃত্তিকার সহিত ঘটের যেরূপ সম্বন্ধ, দণ্ডের সহিত কি সেইরূপ সম্বন্ধ? কখনই নয়, সুতরাং

ইহারা সাধারণকারণ নামে অভিহিত হইলেও ইহাদের পরস্পরের আবার ভেদ করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

এই নিমিত্ত নৈয়ায়িকরা বলেন—

"তস্য ত্রৈবিধ্যম্ পরিকীর্ত্তিতম"

"সমবায়ি হেতুত্বং, জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়ি হেতুত্বং, এবং ন্যায়নয়জ্ঞৈ স্তৃতীয় মুক্তং নিমিত্ত হেতুত্বম্।" কারিকাবলী

কারণ তিন প্রকার, প্রথম সমবায়ি কারণ, দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ, তৃতীয় নিমিত্ত কারণ। সমবায়িকারণ—যাহাতে সমবায় সম্বন্ধবিশিষ্ট* হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে যাহা কার্য্যের অধিকরণ তাহার নাম সমবায়িকারণ (causa materialis) একটি বস্তুর প্রত্যেক অংশকে ঐ বস্তুর সমবায়ী কারণ বলা যায়। যেমন ধনুকের পরমাণুদ্বয়, বস্ত্রের সূত্র, সূত্রের তুলা, ঘটের কপাল,† কপালের মৃত্তিকা। এই সমবায়ীকারণের নামান্তর উপাদান। নৈয়ায়িকগণ বলেন দ্রব্য—দ্রব্য,গুণ ও ক্রিয়ার সমবায়ি কারণ।‡

অসমবায়িকারণ।—সেই সমবায়িকারণের আসন্ন অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়া যাহা কার্য্য উৎপাদন করে তাহার নাম অসমবায়িকারণ। অসমবায়ীকারণের মধ্যে কেহ কেহ কার্য্যের সহিত এক সমবায়ীকারণে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতি করে, কেহ কেহ বা কারণের সহিত এক সমবায়িকারণে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে। প্রথম তন্তু সমূহের সংযোগ বস্ত্রের অসমবায়িকারণ, কেননা তন্তুসমূহের সংযোগ সমবায়ী সম্বন্ধে তন্তুসমূহে আছে এবং বস্ত্রও সমবায় সম্বন্ধে তন্তুসমূহে থাকে, এখন দেখ, তন্তুসমূহের সংযোগ বস্ত্র রূপ কার্য্যের সহিত সমবায় সম্বন্ধে তন্তু রূপ সমবায়ি কারণে বর্ত্তমান হওয়ায়, তন্তুসমূহের সংযোগ প্রথম অসমবায়িকারণ হইল। এইরূপ কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের, এবং পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ ধনুকের অসমবায়িকারণ। আবও দেখ, যখন একটি ঘট প্রস্তুত হয়, তখন তাহার সহিত তাহার রূপ,তাহার পরিমাণ ইত্যাদি সকলই হয়; ঐরূপ বা পরিমাণাদির প্রতি দুটী কারণ প্রথম ঘট, দ্বিতীয় ঘটের অবয়ব (Parts)

* সমবায় সম্বন্ধের বিষয় পূর্ব্ব টীকায় উল্লেখ হইয়াছে। অবয়ব অবয়বীর, দ্রব্যগুণের দ্রব্যক্রিয়ার সম্বন্ধের নাম সমবায়।

† কপালের অর্থ ঘটের অবয়ব, যাহা একত্র করিয়া ঘট প্রস্তুত হইয়াছে।

‡ দ্রব্য শব্দে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি পরে উক্ত হইবে। ক্রিয়া শব্দে গমনাদি।

দ্রব্য দ্রব্যের সমবায়িকারণ—ঘটের প্রতি কপাল

দ্রব্যগুণের সমবায়িকারণ—ঘটের রূপের প্রতিঘট কারণ, কপাল রূপের প্রতি কপাল কারণ।

দ্রব্য ক্রিয়ার সমবায়ি কারণ—গমনাদির

কপালদ্বয়ের রূপ ও পরিমাণাদি। ঘটের রূপাদির প্রতি ঘট সমবায়ী কারণ, যেহেতু রূপ ও পরিমাণাদি গুণ ঘটে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে। দ্বিতীয় কপালের রূপ ও পরিমাণাদি ঘটের রূপ ও পরিমাণাদির প্রতি অসমবায়ী কারণ, কারণ, ঘটের রূপ বা পরিমাণাদি স্ব স্ব সমবায়ী কারণ ঘটের সহিত কপালরূপের সমবায়ী কারণ কপালে সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিত হয়। এইরূপ তন্তুর রূপ বস্ত্রের রূপের অসমবায়ী কারণ। এই অসমবায়ী কারণের নাশ হইলে কার্য্যের নাশ হয়। যেমন কপাল সংযোগের নাশ হইলে ঘটের নাশ হয়, তন্তু সংযোগের নাশ হইলে বস্ত্রের নাশ হয়, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ নষ্ট হইলে দ্ব্যণুক নষ্ট হয়। এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে যদি সমবায়ী কারণে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়া যে কার্য্যোৎপাদন করে তাহার নাম অসমবায়ী কারণ* তবে তুরীতন্তু সংযোগও বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ হৌক, কারণ উহা বস্ত্রের সমবায়ী কারণ তন্তুতে বস্ত্র রূপ কার্য্যের সহিত সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত অর্থাৎ বস্ত্রও যেরূপ আপনার অবয়ব তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে আছে সেইরূপ তুরীতন্তু সংযোগও তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত। কিন্তু এদিকে আবার তুরীতন্তু সংযোগকে বস্ত্রের অসমবায়ী কারণও বলা যাইতে পারে না, কারণ অসমবায়ী কারণ নষ্ট হইলে কার্য্যও বিনষ্ট হয় কিন্তু তুরী তন্তু সংযোগের নাশ হইলে কিছু বস্ত্রের নাশ হয় না। এই বিরোধ নিবারণের নিমিত্ত বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ নির্দ্দেশ স্থলে এইরূপ বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে যে তুরীতন্তু সংযোগ ভিন্ন বস্ত্রের সমবায়ী কারণে যে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে তাহাই বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ। এখানে ইহাও বক্তব্য যে আত্মার বিশেষ গুণ যে জ্ঞানাদি তাহারা আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইলেও উহারা কাহারও অসমবায়ী কারণ নহে।

নিমিত্ত কারণ। এই সমবায়ী কারণ এবং অসমবায়ী কারণের অতিরিক্ত যে সকল কারণ নৈয়ায়িকগণ তাহাদিগকে "নিমিত্ত কারণ" এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা যে অবধি একটি অনুগত সম্বন্ধ ধরিতে পারিয়াছিলেন সেই অবধি সেই সম্বন্ধ ধরিয়া কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে দেখিলেন কার্য্যের প্রতি অসংখ্য কারণ হইতে পারে, তাহাদিগের প্রত্যেককে সম্বন্ধ ধরিয়া নির্দ্দেশ করা কঠিন এই নিমিত্ত বলিয়া উঠিলেন যে সমবায়ী এবং অসমবায়ী কারণ ভিন্ন যতগুলি কারণ হইতে পারে তাহারা কার্য্যের সহিত যে রূপ সম্বন্ধ রাখুক না কেন, তাহাদের সাধারণ নাম নিমিত্ত কারণ। যেমন ঘটের প্রতি দণ্ড, চক্র, কুম্ভকার ইত্যাদি; বস্ত্রের প্রতি তুরী, তুরীতন্তু সংযোগ, তন্তুবায় প্রভৃতি।

* তুরী শব্দের অর্থ মাকু যাহাতে সূত্র জড়িত থাকে, তন্তু শব্দের অর্থ সূত্র।

নৈয়ায়িকগণ কারণের এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন। দ্রব্য, (পৃথিবী, জল, বায়ু আকাশ ইত্যাদি) দ্রব্য, গুণ, ও ক্রিয়ার সমবায়ী কারণ, যখন কোন দ্রব্য অপর দ্রব্যের অংশ হইবে তখনই উহা সেই দ্রব্যের সমবায়ী কারণ। গুণের মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ (অনুষ্ণ), পরিমাণ, একত্ব, পৃথক্ত্ব, স্নেহ ও শব্দ ইহারা অসমবায়ী কারণ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, অদৃষ্ট এবং ভাবনা প্রভৃতি আত্মবিশেষ গুণ সকল আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে থাকিলেও কোন কার্য্যের প্রতি অসমবায়ী কারণ নহে কিন্তু নিমিত্ত কারণ।

উষ্ণস্পর্শ, গুরুত্ব, বেগ, দ্রবত্ব সংযোগ এবং বিভাগ ইহারা দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিলেও কেবল অসমবায়ী কারণ নহে স্থলবিশেষে ইহারা নিমিত্ত কারণও হয়। যেমন উষ্ণস্পর্শ, উষ্ণস্পর্শের অসমবায়ীকারণ কিন্তু পাকজ স্পর্শের নিমিত্ত কারণ। গুরুত্ব, গুরুত্ব এবং পতনের অসমবায়ী কারণ, প্রতিঘাতের নিমিত্তকারণ। বেগ, বেগ ও স্পন্দনের অসমবায়ী কারণ অভিঘাতের নিমিত্ত কারণ। ভেরীদণ্ড-সংযোগ শব্দের নিমিত্ত কারণ এবং ভেরী আকাশের সংযোগ শব্দের অসমবায়ী কারণ, বংশ দলদ্বয়ের বিভাগ শব্দের নিমিত্ত বংশদল ও আকাশের বিভাগ শব্দের অসমবায়ী কারণ ইত্যাদি।

কর্ম্ম (ক্রিয়া) সকল কারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে এই নিমিত্ত ইহারা কার্য্যের প্রতি অসমবায়ী কারণ।

এতদ্ভিন্ন আর যত কারণ তাহারা সকলে নিমিত্ত কারণ।

নানক।

নানক সাহ অথবা বাবানানক ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণবর্ত্তী কানাকুচা* গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালুবেদী, তিনি ক্ষত্রিয় বংশোৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নানকের বিবরণ অনেক অবাস্তবিক ও কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। যিনি যখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিকাশ করেন, মানবকল্পনা তখনই উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ ঘটনা প্রচার করিতে থাকে। না-

* কেহ কেহ বলেন, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী তলবন্দীগ্রামে নানকের জন্ম হয়। তাঁহার পিত্রালয় এই তলবন্দীগ্রামে। কিন্তু অন্যান্য মতানুসারে নানক কানাকুচা গ্রামে, তাঁহার মাতামহের আলয়ে জন্মপরিগ্রহ করেন। কাহারও মতে নানক ১৪৬৮ অব্দে ভূমিষ্ঠ হয়েন।

মক ধর্ম্মজগতে যেরূপ ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে যে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচারিত হইবে তাহা বিস্ময়জনক নহে। শিখগণ আপনাদের ধর্ম্মগুরুর মহিমা পরিবর্দ্ধিত ও ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিতে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাতে কখনও বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। নানকের জন্মগ্রহণের সমকালে অদূরে মহতী জনতার আনন্দোৎসব, শৈশবে সর্পকর্ত্তৃক ছায়া প্রদান, যৌবনে বিশুষ্ক জলাশয়ে জলোচ্ছ্বাসের আবির্ভাব প্রভৃতি অনেক ঘটনায় অমানুষত্ব ও সর্ব্বশক্তিময় দেবত্ব সংমিশ্রিত আছে। এরূপ ঘটনায় সাধারণের বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং এ স্থলে তৎসমুদয়ের উল্লেখেরও আবশ্যকতা নাই।

নানক অল্পবয়সে অল্প সময়ের মধ্যে গণিত ও পারস্য বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তিনি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচারী ও চিন্তাশীল ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই সাংসারিক কার্য্য ও সাংসারিক ভোগ সুখে তাঁহার নিতান্ত বিতৃষ্ণা জন্মিল। কালুবেদী পুত্রকে সংসারধর্ম্মে আনয়ন করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইলেন, নিজ হইতে চল্লিশটী টাকা দিয়া নানককে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী ও সে অনুরোধ প্রতিপালিত হইল না, নানক পিতৃদত্ত মুদ্রায় খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া অনাহারী উদাসীন ফকিরদিগকে ভোজন করাইলেন।

নানক যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্ম্মানুশাসন এবং বেদ ও কোরাণের সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এবং সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানবলে উদার ও পবিশুদ্ধ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও সমস্ত কুসংস্কারময় লৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। যাহাতে হৃদয়ের শান্তিলাভ হয় যাহাতে পবিত্র ও উদার ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচারিত হয়, তাহাই জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার নিকট বিবেচিত হইল। প্লেতো ও বেকন যেমন পৃথিবীর সমস্ত দর্শনশাস্ত্র আন্দোলন করিয়াও প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে নানাবিধ জঞ্জাল দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, নানকও সেইরূপ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ধর্ম্মপদ্ধতিতে নানাবিধ কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তিনি সন্ন্যাসিবেশে ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিলেন, অনেক সাধু ও যোগীদিগের সহিত আলাপ করিলেন, আরবের উপকূল অতিবাহিত করিয়া ফকীরদিগের কার্য্যকলাপ দর্শন করিলেন, কিন্তু কোথাও পবিত্র সত্যের আভাস দেখিতে পাইলেন না। সকল স্থানেই কুসংস্কারের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সকল স্থানেই কর্ম্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকার দেখিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত

হইলেন। স্বদেশে আসিয়া নানক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ করিলেন। গুরুদাসপুর জেলায় ইরাবতীর তটে "করতারপুর" নামে একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। নানক এই ধর্ম্মশালায় স্বীয় পরিবার ও শিষ্যসম্প্রদায়ে পরিবৃত্ত থাকিয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমে এই স্থানেই বাবা নানকের পবিত্র জীবনস্রোত কালের অনন্ত সাগরে মিশিয়া যায়। নানক লোদীবংশের অভ্যুদয় সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন, এবং মোগলবংশের অভ্যুদয়ের পর কলেবর ত্যাগ করেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মচিন্তায় তাঁহার জীবিতকালের ষাটী বৎসর, পাঁচ মাস ও সাত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

নানকের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ লইয়া তদীয় হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদিগের মধ্যে ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। হিন্দুরা দাহ করিতে ইচ্ছা করে, এবং মুসলমানেরা সমাধি দিতে প্রস্তুত হয়। এই বিবদমান উভয়দলই বলপূর্ব্বক শব লইবার আশায় চাদর তুলিয়া দেখে যে, তাহার তলে শব নাই। গোলযোগের সময় শিষ্যগণের কেহ অবশ্যই উহা স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়াছিল। যাহা হউক, অনন্তর উভয় দলে, যে আভরণে শব আচ্ছাদিত ছিল, তাহাই দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া একখণ্ড অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধি অনুসারে দাহ ও অপর খণ্ড রীতিমত উপাসনা করিয়া সমাধিস্থ করিল। এই দাহস্থলের উপর মঠ ও সমাধিভূমির উপর স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। এক্ষণে এই উভয় স্মৃতিমন্দিরেরই কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। ইরাবতীর অনন্ত প্রবাহ ইহা সর্ব্ব সংহারক কালের কুক্ষিগত হইয়াছে।

নানক যে পবিত্র ও উদার ধর্ম্মপদ্ধতি প্রচার করেন, তাহার আলোক পঞ্জাবের বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায়, সরলস্বভাব জাঠগণের মধ্যে প্রসারিত হয়। ক্রমে মুসলমানগণও এই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া উঠে। নানকের একজন বিশ্বস্ত মুসলমান শিষ্যের নাম মর্দ্দানা। এ ব্যক্তি ছায়ার ন্যায় নানকের সহগামী ছিল। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকগণ যেমন নিমিষে নিমিষে উদরের চিন্তায় হা হতোঽস্মি বলিয়া আক্ষেপ করিত মর্দ্দানাও সেইরূপ কথায় কথায় ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত। সংগীত শাস্ত্রে মর্দ্দানার বিশেষ আশক্তি ছিল। সে সর্ব্বদাই বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণ গান করিত। নানক যখন মুদ্রিতনয়নে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন, বাহ্য জগতের সহিত কোনও সংস্রব না রাখিয়া প্রগাঢ়রূপে ঈশ্বরে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়িতেন, তখন মর্দ্দানা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াও তদ্গত চিত্তে সুমধুর বীণাসংযোগে গাইত :—

"তুহী তিরন্‌কার করতার, নানক বন্দু তেরা।"

নানক সুলক্ষণী নামে একটী কুমারীর

পাণিগ্রহণ করেন। সুলক্ষণীর গর্ভে শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে নানকের দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচন্দ্র উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

এই গুলি নানকের জীবনচরিতের কঙ্কাল মাত্র। আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আর দুই একখানি অস্থি আনিয়া এই কঙ্কালে সংযোজিত করিতে ইচ্ছা করি না। এ স্থলে যতটুকু দেখান হইল, তাহাতেই নানক কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, একরূপ বুঝা যাইবে।

নানকের লিখিত আদিগ্রন্থে* তদীয় মত সকল পরিব্যক্ত হইয়াছে। যাহাতে দেশ হইতে বাহ্য ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান ও জাত্যভিমানের উন্মূলন হয়, এবং যাহাতে দেশায় লোকেরা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া সুপরিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে, নানক্ তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে নানা জাতিতে ও নানাসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকা উচিত নহে। দেবালয়ে গিয়া যাগযজ্ঞ করা ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন করানও কর্ত্তব্য নহে। ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তসংযমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

আত্মশুদ্ধি নানকের মূল মন্ত্র। বিশুদ্ধ হৃদয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ করা হয়। তিনি কহিতেন, ঈশ্বর এক ভিন্ন বহু নহেন, এবং প্রকৃত বিশ্বাস এক ভিন্ন নানা নহে। তবে যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে নানাপ্রকার ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল মনুষ্যের কল্পিত মাত্র। তিনি সমভাবে মোল্লা ও পণ্ডিত, দরবেশ ও সন্ন্যাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া, যে ঈশ্বর অসংখ্য মহম্মদ, বিষ্ণু ও শিবকে আসিতে ও যাইতে দেখিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে ও তৎপ্রতি চিত্তস্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি কহিতেন, ধর্ম্ম, দয়া, বীরত্ব ও সংগৃহীত জ্ঞান বস্তুতঃ কিছুই নহে, যে জ্ঞানবলে ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে ঈশ্বর এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান্। সৎকার্য্য ও সদাচারে এই এক প্রভুর প্রভু, সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদভাজন হওয়া যায়। গো ও শূকরের সম্বন্ধে হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের যেমত বিরোধ আছে নানক্ বিশিষ্ট উদারতার সহিত তাহার সামঞ্জস্য করেন। তিনি কহিতেন, একপক্ষ শূকরের অধিকার আর এক পক্ষ গোর অধিকার লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু যাহারা কোনও প্রাণীকেই আপনাদের জন্য গ্রহণ না করেন, "গুরু" ও "পীরগণ" তাঁহাদেরই প্রশংসা করিবেন।

নানকের মতে সংসারবিরাগ ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম অনাবশ্যক। তিনি কহিতেন, সাধু

* নানক 'প্রাণশঙ্কলী' নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা আদিগ্রন্থে সংযোজিত আছে।

যোগী ও পরমাত্মনিষ্ঠ,গৃহী উভয়ই সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বরের চক্ষে তুল্য। ধর্ম্মানু-যায়ী মতের সম্বন্ধে নানকের আরও কতকগুলি উক্তি আছে। সেই উক্তিগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এস্থলে তাহার কয়েক-টীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদা নানক হরিদ্বারে গিয়া তত্রত্য গঙ্গাস্নায়ী ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন :—"ভ্রাতৃগণ। তোমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমহাশয়দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাও। ইঁহারা যে তোমাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আ-ছেন, তাহা তোমরা জানিতে পারিতেছ না। আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যাবৎ মনুষ্যের মন পরিশুদ্ধি না হইবে, তাবৎ তাঁহাদের অনুষ্ঠিত জপ, যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি কোন কার্য্যেরই ফল জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।" অন্য একদিন ব্রাহ্ম-ণেরা স্নান করিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণমুখ হইয়া, তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে নানক জলে দাঁড়াইয়া পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া জল সেচিতে লাগিলেন। সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নানক কহিলেন, তাঁহার করতারপুরের ক্ষেত্র পশ্চিমদিকে আছে, তিনি সেই ক্ষেত্রে জল সেচিতেছেন। ইহা শুনিয়া সকলে উপহাসপূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, "কর-তারপুর বহুশত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই জল কিরূপে তত্দূর পৌছিবে?" নানক কহিলেন, "তবে তোমরা ইহ-লোক হইতে জল সেচিয়া পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণের তৃপ্তি জন্মাইবার আশা করিতেছ কেন?" ১৫২৬ কি ২৭ খ্রীষ্টাব্দে নানক প্রথম মোগল সম্রাট্ বাবরসাহের দ্রব্যসামগ্রী বহন করিতে ধৃত হয়েন। বাবর নানকের আকার প্রকার, সাধুতা ও বাক্‌চাতুরীতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করেন এবং তাঁহার ভরণপোষণের জন্য অনেক সম্পত্তি দিতে চাহেন। নানক এই দানগ্রহণে অসম্মত হইয়া কহেন, "আমার কিছুরই অভাব নাই, আমার সঞ্চয় এমন অক্ষয় যে কখনও তাহার হ্রাস হইবে না।" বাবরসাহ এই কথার ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে নানক স্পষ্টা-ক্ষরে নির্দ্দেশ করেন, যে, তাঁহার হৃদয় কেবল পরমেশ্বরের সাধনাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সময়ান্তরে নানক আর একবার কহিয়াছিলেন, ঈশ্বরের নামামৃত পান করিয়া তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা সকলই একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি কেবল সেই অমৃতেই সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। কথিত আছে, না নক মক্কায় গিয়া একদিন কাবানামক উপাসনামন্দিরের দিকে পা রাখিয়া শয়ন করেন। ইহাতে পবিত্রগৃহের অবমাননাকারী বলিয়া তথায় তাঁহার বড় নিন্দা হয়। নানক এজন্য ক্ষুব্ধ হইয়া তত্রত্য মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী,যেদিকে পা ফিরাইব, সেই দিকেই তাঁহার অব-মাননা হইতে পারে। এক্ষণে কোন্

দিকে পা রাখিলে নিস্তার পাই, বল।” নানক, অন্যসময়ে কহিয়াছিলেন, “এক লক্ষ মহম্মদ, দশলক্ষ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং একলক্ষ রাম সেই সর্ব্বশক্তিমানের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মৃত্যুর শাসনাধীন, কেবল ঈশ্বরই অমর। তথাপি এই ঈশ্বরের উপাসনাতে সম্মিলিত হইয়াও লোকে পরস্পর বাদানুবাদ করিতে লজ্জিত হয় না। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কুসংস্কারের প্রেতাত্মা এখনও সকলকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যাহার হৃদয় সৎ তিনিই প্রকৃত হিন্দু এবং যাঁহার জীবন পবিত্র তিনিই প্রকৃত মুসলমান।”

কেহ কেহ অনুমান করেন, নানক কবীরের গ্রন্থ হইতে স্বীয় মত সঙ্কলন করিয়াছেন। অনেকস্থলে কবীরের মতের সহিত নানকের মতের একতা দৃষ্ট হয়। কবীর যেরূপ জপ, পূজা ও জাতিভেদাদির নিন্দা করিয়াছেন, নানকও সেইরূপ জপ, পূজা প্রভৃতির অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং কবীর যেরূপ ভগবৎপ্রেমে চিত্তার্পণ করিতে বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন, নানকও সেইরূপ অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করিতে সকলকে উত্তেজিত করিয়াছেন। কবীর অন্তঃশুদ্ধির প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন :—

“মন্‌কা ফেরৎ জনম গয়ো, গয়ো ন মন্‌কা ফের।
করকা মন্‌কা ছোড় কর মন্‌কা
মনকা ফের॥”

“জপমালার গুটিকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গত হইল, কিন্তু হৃদয়ের ঘোর বিগত হইল না। অতএব হাতের গুটিকা পরিত্যাগ করিয়া মনের গুটিকা ঘূর্ণন কর।”

স্থলান্তরে :—

“গঙ্গা ফেরা হরিদ্বারকা, গুদ্ধড়ি লিয়া মন চারকা, ভট্‌কা ফেরা তৌ ক্যা হুয়া জিন এস্ক মে সের না দিয়া। কাবা গয়া, হাজি হুয়া, মনকা কপট মিটা নাহি। মনকা কপট টুটা নাহি, কাবা গয়া তৌ ক্যা হুবা, হাজি হুয়া তৌ ক্যা হুবা; জিন এস্ক মে সের না দিয়া। বোস্তাং গোলেস্তাং পন্দ গয়া মৎলব না সমঝা। শেখকা আলিন হুবা তৌ ক্যা হুবা, ফাজেল হুবা তৌ ক্যা হুবা, জিন এস্ক মে সের না দিয়া॥”

“যে ব্যক্তি হরিদ্বারবাহিনী জাহ্নবী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছে, দুই চারি মণ কন্থাভার বহন করিয়াছে, এবং বিভ্রান্ত হইয়া নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছে, কিন্তু ভগবৎপ্রেমে শিরসমর্পণ করে নাই, তাহাতে তাহার কি হইল? যে ব্যক্তি কাবা গিয়াছে, হাজি হইয়াছে, অথচ যাহার মনের কপটতা ক্ষীণ হয় নাই, মনের কপটতা দূরীভূত হয় নাই ও ভগবৎপ্রেমে শিরসমর্পিত হয় নাই, তাহার কাবাগমনই বা কি হইল? এবং হাজিপদে অধিরোহণই বা কি হইল?

যে ব্যক্তি বোস্তা গোলেস্তা সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছে, কিন্তু সেখ সাদির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে নাই ও ভগবৎপ্রেমে শিরসমর্পণ করে নাই, তাহার পণ্ডিত ও পারদর্শী হওয়াতেই বা কি হইল?”

নানকের ধর্ম্মপদ্ধতি এই সকল মতেরই ছায়া মাত্র। প্রভেদ এই নানক সাক্ষাৎসম্বন্ধে কেবল একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে চিত্তসংযোগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কবীর রাম ও হরিতে সেই সর্ব্বশক্তিময় ঈশ্বরত্ব আরোপিত করিয়া তাঁহাদের উপাসনাবিধি প্রচারিত করিয়াছেন। যাহা হউক, নানক যেরূপ পবিত্র ও উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনাপদ্ধতি যেরূপ সকল স্থলে, সকল সময়েরই অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া রহিয়াছে, তজ্জন্য তিনি কখনও স্পর্দ্ধা বা অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের একজন দাস ও বিনয়ী আদেশবাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। নিজের লিখিত ধর্ম্মানুশাসন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ হইলেও† তিনি কখন তাহার উল্লেখ করিয়া আত্মগরিমার বিস্তারে উন্মুখ হয়েন নাই, এবং নিজের ধর্ম্মপ্রচারে অসাধারণ ভাবের বিকাশ থাকিলেও কখন তাহা অমানুষী ঘটনায় কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি কহিতেন, “ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না। আপনাদের মতের পবিত্রতা ব্যতীত সাধু ধর্ম্মপ্রচারকগণের অন্য কোনও অবলম্বন নাই।”*

গুরুনানক এইরূপে কালান্তরাগত ভ্রান্তির উচ্ছেদ করিয়া আপনার শিষ্যদিগকে উদার ও পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে শিষ্যগণ তাঁহার নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মপদ্ধতির উপর স্থাপিত হইয়া ধীরে ধীরে একটী নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মপরায়ণ বৃহৎ সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। “শিষ্য” শব্দের অপভ্রংশে “শিখ” শব্দের উৎপত্তি হইল। এজন্য নানকের শিষ্যগণ অতঃপর সাধারণের নিকট এই ‘শিখ’ নামে পরিচিত হইতে লাগিল।।

* বাবা নানকের গ্রন্থ শিখদিগের মধ্যে মহা পূজ্য। অমৃত সহরে এক চমৎকার স্বর্ণমন্দিরে এই গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে। স্বর্ণমন্দিরে কোন দেবমূর্ত্তি বা অন্য কিছুই নাই কেবল এই আদি গ্রন্থ অতি যত্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভক্তেরা অনবরত চামর ব্যাজন করিতেছে।

† অনেকে বলেন যে শিখা হইতে “শিখ” নাম হইয়াছে। যে সকল পাঞ্জাবির মস্তকে শিখা আছে অনেকের মতে কেবল তাহারাই “শিখ”।

গঙ্গাধরশর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কাদম্বিনী-মেঘমালা।

আজ ভাবিয়া দেখিলাম, কর্ত্তৃপক্ষদের অজ্ঞাতে তিনটি কার্য্যে নিপুণ হইয়াছি। অশ্বারোহণ, শিকারনৈপুণ্য ও সন্তরণ-পটুতা। আমাদের দেশীয় সভ্যেরা শিকার-খেলা নৃশংস কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমার পক্ষে শিকারভূমি প্রত্যুৎ-পন্নমতি ও প্রমোদবর্দ্ধনের কারণ এবং অঙ্গচালনা ও বুদ্ধিচালনার রঙ্গভূমি হইযা-ছিল; তাহার সঙ্গে বনভ্রমণে পশু পক্ষীর ক্রীড়া ও বনশোভা অবলোকন পল্লীমধ্যে অস্থিরকর লোকবিবাদ হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া অনুভব হইত। কখন দূরে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভাবিতাম, বনের এ শোভা কিরূপে কেমন করে নিষ্পন্ন হইল।

আশুতোষ বাবুর অশ্বশালার সহিষ সকলেই জটাধারীর অনুগত ছিল। বারুনী, রথে, পূজা পার্ব্বণে খেলানা খরিদের নিমিত্তে যাহা কিছু সংগ্রহ হইত, যে মিঠাই সন্দেশ জটাধারীর হাতে আসিত, তাহার অর্দ্ধেক-সহিষদের সহিত ভাগা-ভাগি ছিল। গ্রামের ঈশান কোণে বিসর্জ্জনের ঘাটের উপর যে বিস্তৃত ময়-দান ছিল, তথায় প্রায় প্রতি সন্ধ্যাকালে ঘোটকদল "বোলে" যাইত, জটাধারী সেই সময় অশ্বারোহী হইতেন ও একটি ভুটিয়া টাট্টু সতেজে দৌড় করাইতেন।

দারগা সাহেব যে দিবস রঘুবীরকে বেতার অবস্থায় চালান দিলেন, তাহার কয়েক দিবস পরে আমি ঐ ভুটিয়া টা-ট্টুতে আরোহণ করিয়াছি। অশ্ব চলিতে চলিতে ঘামিল, ঘামিয়া দৌড়িল, দৌড়িতে দৌড়িতে পতঙ্গসম উত্তরমুখে ছুটিল। ঝড়ুবা সহিষ চীৎকার করিতে লাগিল, "বাবুজী সাবধান, দেখিবেন যেন পড়েন না।" সহিষ যাহাতে সঙ্গী না হইতে পারে তাহাই আমার উদ্দেশ্য হইল, ঘোড়া আরও তেজে চালাইলাম, সন্ধ্যার প্রাক্কালে শান্তিপুরে সিংহদের বাটীর নিকট মাঠে উপস্থিত হইলাম। এখানে দেখিলাম, একটি ঘোর যুদ্ধ বাঁধিয়াছে—পশ্চাৎ ভাগে কয়েকটি বৃক্ষ রাখিয়া দেও-য়ান গজানন একটি জড়সহিত বাঁশ উৎপাটন করিয়া মল্লবেশে দণ্ডায়মান। তাঁহার ঘোটকটি পশ্চাতে সহিষের হস্তে

পত্তন করি; দুই একটি বৃক্ষশাখা ফল-ভরে আমাদের গৃহের দিকে নত হইয়া আসিলে সেই ফলের মিষ্টতা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হই; পরক্ষেত্রের বেড়া পাতলা হইলে পথ চালাইবার চেষ্টা করি, এক একবার বলি "ও চিরকেলে পথ"; দুর্ব্বল লোকের লাখরাজের অনুগত প্রজা ভাঙ্গাইয়া আমাদের মালের সামিল করিতে ত্রুটি করি না, লুকিয়ে লুকিয়ে ছুরি চালাইয়া থাকি, তবু আমরা পরস্পর আত্মীয়, চারচোখে দেখাদেখি হইলে হাসি খুসি, খেলার ধুমে সন্ধিপ্রিয়তার পরিচয় দিয়া থাকি। অপরিচিত লোক আমাদের বৈঠকে বসিলে মনে করেন এ গ্রামের সমাজ সৌহার্দ্দ্যবদ্ধ, বড় সুখী!

আমি এখনও বুঝিতে পারি না যে স্থানান্তরে এইমাত্র যাহার সর্ব্বনাশের পরামর্শ করিতেছিলাম তাহার সহিত সাক্ষাতে আবার সঙ্গে সঙ্গে কিসের বন্ধুত্ব, কিসের সম্প্রীতি? যদিও দুই নৃপতির বন্ধুত্ব অপেক্ষা দুই দরিদ্রের বন্ধুত্ব নিষ্কপট, যদিও দুই বিষয়ীর আত্মীয়তা অপেক্ষা দুই ভিক্ষুকের আত্মীয়তা সরলভাব, তথাপি গরিবের কে গুণগ্রাহী? কিন্তু যখন বড়লোকে বড়লোকে কোলাকোলি করেন, যখন ব্যাঘ্র ভল্লুক করস্পর্শ করেন, এক দেশের সিংহরাজ অন্য দেশের ঋক্ষনৃপতিকে "আমার প্রিয়তম বন্ধু" বলিয়া সম্ভাষণ করেন তখন বন্ধুত্বশব্দের কেমন সার্থকতা সম্পাদন হয়? রোজনামচা হইতে সেই নিষ্কপট গৌরবের আজ একটি পরিচয় দিতেছি।

দেওয়ান গজানন আজ বিগ্রহবেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিসজ্জায় সজ্জিত। তাঁহার প্রশস্ত স্থূল কলেবর সর্ব্বদাই সু-নির্ম্মল, লোমহীন, গৌরবর্ণ, ব্রাহ্মণের সুচিহ্ন শুভ্র সবল মার্জ্জিত যজ্ঞোপবীত বামস্কন্ধ হইতে, বক্ষদেশ হইয়া সেই লম্বোদরের দক্ষিণপার্শ্বে লম্বমান, লম্বা লংকলাথের ধুতি মাত্র পরিধেয়, তাঁহার উভয় কাছা ও কোঁচা উদরের এক অন্ত হইতে আর এক ধার পর্য্যন্ত পরিসর—এই গজাননের পোশাকী বেশ। তিনি যখন নিজগৃহে বসিয়া থাকিতেন অতি খর্ব্ব কম চৌড়া ধুতি মাত্র তাঁহার পরিধানে থাকিত, কাছা প্রায় থাকিত না, কাছা বাঁচাইয়া গামছা করিতেন এবং দুইখানি ঐরূপ কাছা বাঁচাইয়া আর একখানি আবার ঐরূপ ক্ষুদ্র ধুতি করিতেন, সে জন্য শ্রীনগরে ছেলের মুখে একটি নামতা শুনা যাইত, জটাধারীই তাহা রচনা করিয়াছে বলিয়া আমার অনর্থক কেহ কেহ অপবাদ দিত, নামতাটি এই:—

কাছাকে কাছা,
কাছা দুগুণে গামছা,
দুই গামছা যোড় ভাই,
গজাননের ধুতি তাই।

এই বচন গজানন কখন কখন স্বকর্ণে শুনিতেন, কিন্তু কাহারও কথায় তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, বরং ভাবিতেন

এই বচনের সার সংগ্রহ করিলে, অনেকের সঞ্চয়শীলতা বৃদ্ধি হইতে পারে। যাহা হউক আজ সঞ্চয়শীলতা পরিত্যাগ করিয়া, অনাবশ্যক খরচ করিয়াও দেওয়ানজী পোশাকী বস্ত্র পরিধান করিযাছেন; তাঁহার চরণ আজ "ফুলপুখুরীর" ফুলদার জরির ফুল তোলা পাদুকা দ্বযে শোভমান। জুতা যোড়াটী দ্বাদশ বৎসর হইল খরিদ হইযাছিল কিন্তু তাহার রঙ্গ টস্‌কে নাই। বিশেষ বিশেষ মঙ্গলের দিন, পুণ্যাহ,পূজা দশমী ইত্যাদি বৎসরে দুই চারি দিবস বাহির হয়, নচেৎ ভৈরব খানসামার জিম্বায় একটী পশ্চিমে বাক্‌তার বস্তানিতে বান্ধা থাকে, ভাদ্রমাসে দুই এক দিবস মাত্র সূর্য্যদেব দেখিতে পান, বার বৎসরের মধ্যে বুড ভৈরব একবার তামাকের অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া ঐ পাদুকার একটি শ্বেত ফুলে দাগ লাগাইযা আপনার বাম গণ্ডে গজাননের এক চাপড়ের কালিশিরা রূপ চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। দেওয়ানজীর সুসজ্জা দেখিয়া আমি ভাবিতেছি আজ শুভদিন, কারণ যে দিন দেওয়ানজী সুসজ্জিত হন একটি পর্ব্ব উপস্থিত হয, মিষ্টান্ন সন্দেশের প্রায় আমদানি হইয়া থাকে। কিন্তু গজাননের দুই একটি কথা শুনিয়া আমার সে ভ্রম দূর হইল। একটি প্রিয় অনুচরকে লক্ষ্য করিয়া গজানন কহিলেন "এস, আজ ভোরেই কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, আশুতোষ ত আশুতোষ! যেমন নাম তেমনি গুণ, আমার ঘোড়াটী হত হইয়াছে শুনিয়াই কহিলেন নূতন একটি অশ্ব ক্রয় করিয়া লও, সিংহদেব নিকট আর দাবি করিও না—" গজানন আবার নিম্ন স্বরে কহিলেন "ঘোড়াটি ত সরকারী খরচেই খরিদ হইবে, কিন্তু সিংহদেব নিকটেও মূল্য আদায় করা চাই,চাই বৈ কি?—চাই গো—চাই!" এই কথা কহিয়া দেউড়ির সম্মুখে যথায় শিবিকা প্রস্তুত ছিল দেওয়ানজী আসিযা দাঁড়াইলেন। আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন এমন সময় আমি কহিলাম "দাদা মহাশয় আমি যাইব।"

গজা। কে রে ভাই—জটু! কোথায় যাইবে?

"তোমার সঙ্গে" কহিযাই আমি গজানন দাদার শিবিকার এক কোণে বসিলাম। অধিকক্ষণ মুখ বন্ধ রাখা আমার পক্ষে কষ্টকর, বাহকগণ কয়েকটি পদ না চলিতেই কহিলাম "গজু দাদা আজ আবার দাঙ্গা হবে?"

গজা। রাম কহ, রাম কহ। রঘুবীর রঘুবীর। সন্ধি মানসে যাইতেছি যাত্রার সময় এ কুকথা কেন শুনালি?

আমি বলিলাম "কি 'কুকথা দাদা দাঙ্গা? দাঙ্গা দেখায় আমোদ আছে।"

গজা। রাম কহ, গঙ্গা কহ, আবার ঐ অকথা।

আমি কহিলাম "কি অকথা দাঙ্গা"।

গজা। তুমি আজ বিপদ ঘটাইবে দেখিতেছি! আবার ঐ কথা বল ত, নামিয়ে দিয়ে যাব।

"আর কহিব না—কিন্তু দাদা আমি সে দিন দেখেছিলাম—আপনার কৌশল চমৎকার।"

গ। ভাই এ সকল শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, বেটা ছেলে হয়ে কেবল পুথি পড়া নয়—বল্ চাই, বুক্ চাই, দন্ত চাই, তবে অদৃষ্ট যোগ দেয় বড়লোক হয়—হয় রে—ভাই—হয়।

এ দিকে রঘুবীর সর্দ্দার আম্র রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, রাঙ্গা পাগড়ি মাথায় দিয়া কুম্ভীরচর্ম্মনির্ম্মিত ঢাল পৃষ্ঠে বান্ধিয়া, কোমরের বামপার্শ্বে মহিষের চর্ম্মকৃত কোষ সংযুক্ত তরবাল ঝুলাইয়া, লাঠি হাতে পাল্কির এক বাড় ধরিয়া চঞ্চল পদচালনায় বাহকদলের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। আমাদের কথা শুনিয়া কহিয়া উঠিল,

"বেটা ছেলে হলেই কি ভাগ্য হয় হজুর? আমরাও ত বেটা ছেলে, বেটা ছেলে হওয়া বড় সুখ। বরং মেয়েরা কাটনা কাটিয়া, মাছ ধরিয়া ভাল থাকে, আমাদের—"

সর্দ্দার বেহারা কহিয়া উঠিল, "এই বোঝা কান্ধে করিয়া কাদা কাঁটা ভাঙ্গিতে বড় সুখ!" রঘুবীর কহিয়া উঠিল "আর মধ্যে মধ্যে দারগা সাহেবের পয়জারে বড় সুখ!"

কথা কহিতে কহিতে বিস্তৃত হরিত ক্ষেত্র, শেষে নিবিড় বৃক্ষশির ভেদ করিয়া সিংহ বাবুদের প্রাসাদের শ্বেত উর্ম্মিপৃষ্ঠবৎ আলিসা ও কারনিস দৃষ্ট হইল। বেহারাগণ সজোরে হাকিতে লাগিল, রঘুবীর দ্রুতপদ হইল, সর্দ্দারের লালকুক্কুর যেন ভাবি বিষয় কার্য্যে তৎপর হইয়া সবার অগ্রে দৌড়িল—জমাদারের টাট্টু ঘোড়া দৌড়িল, কিয়ৎক্ষণমধ্যে সিংহ বাবুদের গৃহদ্বারে পাল্কি থামিল।

শ্রীযুত বাবু শিবসহায় সিংহ দেউড়ির সম্মুখে শিবিকা দেখিয়াই নিজ আসন একটি নিয়ারের খাট হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়ম পায়ে দিয়া দাড়াইলেন। উপরে সুপক্ক ভ্রূ-যুগল, নিম্নে কদম্বকেশরের ন্যায় প্রচুর শ্বেত গোঁফের দলমধ্যে বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয়, বয়োগুণে তাবাদ্বয় আর তাদৃশ ভ্রমরকালো নাই; ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া যখন গজাননের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন তখন রাজবাটীর সিংহদরজার সেই বুড় সিংহের মূর্ত্তিটি মনে পড়িল—মনে হইল গজাননের গজস্কন্ধ চিবিয়া রক্তশোষণ করিবেন। বাবু শিবসহায় সিংহ চৌহান রাজবংশীয়—তাঁহার পিতামহ সুবাদারী করিয়া শেষ মারহাট্টা ও পিণ্ডারী যুদ্ধে বিশেষ যশোলাভ করিয়া জঙ্গল স্থানে বিস্তৃত জায়গির মহল লাভ করিয়াছিলেন। অদ্য তিন পুরুষ বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিমবিভাগে বাস করিয়াও চৌহান জাতির কুল-নীতি ভুলেন নাই, পশ্চিম অযোধ্যা বাসী স্বজাতি সদ্বংশের সহিত কুটুম্বিতা রক্ষা করিতেছেন। কাদম্বিনী একমাত্র কন্যা, অধিষ্ঠাত্রী করাল-বদনী কালীকাপ্রসাদে এই কাদম্বিনী

পাইয়াছেন। সেই কন্যার কল্যাণবিধান জন্য প্রতি অমাবস্যায় সিংহমহাশয় ঘোররূপ কালীর ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া থাকেন, আবার কালোচিত সুনীতিতে সেই কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। যেমন কাদম্বিনী পুস্তকপাঠে নিপুণা, সুকাব্যের রসগ্রাহিণী, তেমনি গৃহধর্ম্মে শিল্পকার্য্যে অবশেষে প্রসিদ্ধ পাচিকা রাঙ্গা ঠাকুরুণের শিক্ষায় রন্ধনকার্য্যে সমীচীন ব্যুৎপন্না—মাতৃহীন হওয়ায় কন্যার পরিণয়কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়াছে—বাল্যবয়স অতিক্রম করিয়া যৌবনোন্মুখী হইয়াছেন। সম্প্রতি সুলতানপুরনিবাসী কোন ছত্রিয় বংশ হইতে কোন যুবা রাজপুত্র আনাইয়া আপন জামাতৃপদে বরণ করিবার শিবসহায় বাবুর ইচ্ছা ছিল, ভবিষ্যৎ অযোধ্যাকুসুম আপাতত বঙ্গকাননে সিংহদের গৃহপ্রাঙ্গণই উজ্জ্বল করিয়াছিল কিন্তু সেই সোহাগের ধন আচম্বিৎ বিশহাত জলে মগ্ন। এই কুসুম হইতে পীযূষ পরিবর্ত্তে গরল উৎপন্ন হইয়া সিংহকুলকে একবারে বিষবারিসিক্ত করিতে উদ্যত। বাবু শিবসহায় সিংহ যে সময়ে গজাননের প্রতি ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন সেই সময়ে কাদম্বিনীর রূপলাবণ্য ও কুলগৌরব তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন সেই রূপে সেই গৌরবে গজাননের ষড়যন্ত্রে কলঙ্কক্ষেপণের চেষ্টা হইতেছে। সেই সুরূপা প্রাসাদ হইতে দাঙ্গা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকেও অভিযুক্ত ব্যক্তির শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। দেওয়ানজী কহিয়াছেন তাঁহার আদেশেই দাঙ্গা আরম্ভ হয়, তিনিই কহেন "বাবা ওদের মার্‌তে হুকুম দিয়াছেন" ও তাঁহার ইঙ্গিতে কয়েকটি দাসী ছাদ হইতে ইট নিক্ষেপ করে, তিনিই ত প্রধান আসামী। দেশবিভাগের তেজীয়ান্ বিচারপতি মৌলভি সাহেব কাদম্বিনীর নামেও শমন জারি করিয়াছেন।

গজানন মিষ্টমুখ, সতত নম্র, বিনয়ী, বাবু শিবসহায়কে দেখিবামাত্র ত্বরিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দুটি হাত বিনয়ে ধরিলেন। এবং কথা কহিতে কহিতে গজানন বাবু শিবসহায় সিংহকে খাটিয়ায় বসাইলেন। খাটিয়ার নিম্নভাগে একটী শতরঞ্জিতে নিজে বসিয়া নিম্ন স্বরে কি কথা কহিলেন। শিবসহায় সিংহ জল হইয়া গেলেন। দেওয়ানজী প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন "রাগ চণ্ডাল, চণ্ডাল মশাই চণ্ডাল! রাগে মানুষে বুদ্ধিহীন হয়, আপনি যে জন্য ক্রুদ্ধ আমি বুঝিয়াছি, কেহ আপনাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া থাকিবে, আপনার যাহাতে অসম্ভ্রম হয়—দোহাই রঘুবীর! সে চেষ্টা গজাননের সততই কষ্টকর জানিবেন। যাহা হইয়াছে, হইয়া গিয়াছে, নির্ব্বোধ সেই ছেঁড়া মুক্তারটা এক বুঝিতে আর বুঝেছে, এক্ষণে ক্ষমা করুন, রাম বলুন, শান্তি শান্তি শান্তি বলুন—না বলবেনই বা কেন? যাহাতে ইজ্জত রক্ষা হয় তার অনিচ্ছা বা কেন? তা করাই ক

কি কঠিন কাজ? উভয় পক্ষ সম্মত হইলে হাকিম কি করতে পারেন? দায়ী মুদ্দয় রাজী ত কি করবে কাজী?” দেওয়ানজীব মন্ত্র সর্ব্ব শক্তিমান্, মিথ্যা-বাদ কপটতা কি এতই মিষ্ট? সবল সিংহ বাবু এক্ষণে মন্ত্রে বশীভূত দেও-য়ানজীর কথা যথার্থই হিতৈষী সুহৃ-দের পরামর্শ বলিয়া গ্রহণ কবিলেন। পার্শ্ব-বর্ত্তী লোক সমস্তেব প্রতি গজানন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কবিয়া কহিলেন“ওহে তোমবা একবার অন্তরে যাও, যাও হে যাও” পরক্ষণেই কহিলেন“মহাশয় এখন এখানে কেহ নাই—এই শ্বেত চূণের ঘরে বসিয়া কহিতেছি—স্বরূপ কহিতেছি কোন বিষযে চিন্তা কবিবেন না, যদিও সমন হইযাছে তাহাব উপায় আছে। আপনাব মান, বুকে হাত দিয়া বলিতেছি, এই আমার মান, আমাব মান, মশাই, আমাব মান! কুলকন্যাকে কাছারিতে উপস্থিত করা —রাম কহ, বাম কহ—সে কথা মনে করিবেন না—না হয় দুহাজাব টাকা গেলই। নিতান্ত সমনজারি নিষেধ না হয অল্পবয়স্ক দাসী একজনকে সাজা-ইয়া দিব—মৌত নাম লিখাইয়া দিব—একটি চিতা সাজাইয়া শবদাহ দেখাইব —কথাটা কি এতই ভাবি? সহজ কথা মশাই সহজ কথা! আজ চৌকিদারকে দিয়া থানায় একটা এত্তেলা দিযা রাখুন যে গ্রামে বিসূচিকাব পীড়ার বড় প্রাদু-র্ভাব, যেই পীডার উদয় সেই মৃত্যু—মৃত্যুরেব ন সংশয়! ব্যাম হল কি মল—আব শুনুন—গ্রামে চাঁদা কবিয়া একটি রক্ষাকালীর পূজা আবন্ত করে দিন, লোকে জানুক যে মহামাবী যথার্থই উপ-স্থিত হইয়াছে—হয়েছে ত—কোন্ না হযেছে।”

সবল শিবসহায় সিংহ ঘোব শাক্ত, কালীভক্ত, রক্ষাকালী পূজার নাম শুনি-য়াই সব বিপদ ভুলিলেন, দেওয়ানজীর কথায় মত্ত হইয়া তাহাব পরামর্শ একান্ত মনে গ্রহণ করিলেন, পরক্ষণেই দেওয়া-নজী চাঁদার ফর্দ্দ লইয়া বসিলেন। কালী-পূজার খরচেব সহিত আপন মৃত ঘো-ড়াব মূল্য উঠাইতে লাগিলেন। বন্দবস্ত সমাপ্ত হইলে আমাদের শিবিকা কিঞ্চিৎ কাল পবেই গৃহাভিমুখ হইল। যখন আ-মরা শান্তিপুবের বহির্দ্দেশে আসিলাম ঢাকের শব্দ উঠিল। রঘুবীর কহিল প্রতি-মাব মাটী তুলিতে যাইতেছে।

সমাজের পরিবর্ত্ত কয়রূপ।

আজিকালি সমাজসংস্কারের বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে। সমাজ সংস্কার কর, বলিয়া কত লোক যে উচ্চৈঃস্বরে গলাবাজী করত ছাপায় নাম তুলিয়া লইল তাহার ঠিকানা নাই। কেহ বিবাহসংস্কার, কেহ ধর্ম্মসংস্কার, কেহ সমাজসংস্কার কেহ ভারতসংস্কার, কেহ লেখনসংস্কার লইয়া দিন কত গোলযোগ করতঃ শেষ, বড় লোক,—গট হইয়া ঘরে বসিয়া গল্প মারিতে লাগিলেন। অনেকেই আপন কাজ, অর্থাৎ কিছু পয়শা, মারিয়া লইলেন। বিবাহ, ধর্ম্ম, সমাজ, ভারত, লেখন যেমন তেমনি রহিল, তাহাদের আর সংস্কার হইল না। লোকে প্রথম গোলযোগ,নামসই, দরখাস্ত, লেখালেখি, বকাবকি তুমুলকাণ্ড দেখিয়া ভাবে, এই বার বুঝি কিছু হবে, শেষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে কি হলো!!! বহুকাল ধরিয়া লোকে বলিয়া আসিতেছে কি হলো!!! অথচ কিছুই হয় না। কেন? কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ খুঁজিতে গেলে প্রথম কারণ কেহই বলিয়া উঠিতে পারে না। আমরা বলি সংস্কার জিনিস্‌টা কি একবার তত্ত্ব লওয়া যাউক না কেন? সংস্কারের লক্ষণ কি? প্রকৃতি কিরূপ? কোথায় সংস্কার দরকার হয়? সংস্কার ভিন্ন আর কোন সমাজপরিবর্ত্তন আছে কি না? যদি থাকে ত সে কিরূপ? অদ্য আমরা তাহাই দেখিতে বসিব। আমাদের অদ্যকার প্রস্তাব সংস্কার ও বিপ্লব।

সংস্কার ও বিপ্লব,দুইটী কথার অর্থ কি? সংস্কার শব্দে মেরামত, কোন জায়গা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা সারিয়া লওযার নাম সংস্কার। যেমন আমরা বাটীর সংস্কার বা মেরামত করিয়া থাকি। বিপ্লব শব্দে উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেওয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেওয়া, কেহ কেহ বলেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়ার নাম বিপ্লব; আমরা এ প্রস্তাবে সেরূপ অর্থ গ্রহণ করিব না। কেন? পরে জানা যাইবে। এই দুই প্রকার উপায়ই সময়ে সময়ে দরকারী হয়। যখন কোন নূতন সমাজ কোন কারণ বশতঃ বিপথগামী হয়, তাহার পরিবর্ত্ত আবশ্যক হয়, সেই পরিবর্ত্তের নাম সংস্কার। যেমন আথেন্স ও রোমে ঋণসংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত্ত। যাহারা ঋণ দিত তাহারা খাতকদিগকে দাস করিত, প্রহার করিত,চুণের গারোদে পুরিয়া রাখিত, তাহাদের সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিয়া লইত ইত্যাদি, এ অবস্থায় দেশের সমস্ত লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাতে যে বন্দোবস্ত দ্বারা ঋণসংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত্ত হইল সে আইন দ্বারা সমাজ সংস্কার হইল। ইংলণ্ডের বন্দোবস্ত দেশের লোকে দেশ শাসন করিবে। ১৮৩২

সালে দুঃখী প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিল যে যদি দেশের লোকেই দেশ শাসন করিবে তবে আমাদের লোক কেন মহাসভায় না যায়। তখন রিফরম বিল Reform bill পাস হইল। রিফরম দিল সমাজসংস্কার করিল। আবার যখন ফ্রান্সের রাজা ওমরাহবর্গ ও ধর্ম্মযাজকগণ সকলেই অত্যাচার করিতে লাগিলেন, যখন রাজার বাবুগিরির খরচে, রাজার বেশ্যা-দিগের পেন্‌শন দিতে রাজকোষ শূন্য হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন প্যাক্‌ট ডি ফেমিন (দুর্ভিক্ষ সমাজ) দেশের সমস্ত শস্য ক্রয় করিয়া গোলাজাৎ করত দেশে রোজ রোজ দুর্ভিক্ষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বসঞ্চিত শস্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বড় মানুষ হইতে লাগিলেন, তখন যে কয়েক জন সামান্য লোকের সর্ব্বশক্তিমতী লে খনীপ্রভাবে ফ্রান্সের লোকের চক্ষু উন্মীলিত হইল—যে উন্মাদনে রাজা, ওমরাহ, ধর্ম্মযাজক, বাষ্টাইল, অত্যাচার কোথায় উড়িয়া গেল, তাহারই নাম বিপ্লব। ঐ যে আবার ইতালি ও জর্ম্মনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা যথেষ্টাচার শাসনপ্রণালী ও নানাবিধ অত্যাচার কাটাইয়া একত্র হইতেছে ইহাও বিপ্লব। ১৬৮৪ খৃঃঅব্দে ইংরেজেরা যে জেমস্‌কে তাড়াইয়া উইলিয়ম্‌কে রাজা করিয়া বিপ্লব বিপ্লব বলেন, সে বাস্তবিক বিপ্লব নহে, সে রাজপরিবর্ত্ত মাত্র। সে সংস্কারও নহে, সে বিপ্লবও নহে। আর ইতিহাসের শ্রাদ্ধ না করিয়া মোটা কথায় একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিই। একটা নূতন বাটীর যদি কোথায় একটু চিড় যায় তাহার মেরামতের নাম সংস্কার। মনে কর, বাড়ীর দুইখান কড়ি বদলাইতে হইল, ছাদে দাগরাজি করিতে হইল সে সকলই সংস্কার. কিন্তু যদি বাড়ীটি চৌচাপটে বসিয়া যায়, কিম্বা এক দিক্ বসিয়া গিয়া মাঝখানে ফাক হইয়া পড়ে, কি অতি প্রাচীন লোণাধরা জরাজীর্ণ হয়, তবে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, সেই ভাঙ্গিয়া ফেলার নাম বিপ্লব। ফল কথা এই, খানিক বদলাইতে হইলেই সংস্কার, আর বুনিয়াদ শুদ্ধ বদলাইতে হইলেই বিপ্লব।

সমাজসংস্কার বলিলে বুঝায় যে, সমাজটী যেমন আছে আদত তেমন-টিই থাকিবে। আসলে যেন কোন বিঘ্ন না হয়। বিপ্লবে বুঝায় আসলই বদলাইতে হইবে। সমাজ যেমনটী ছিল তেমনটী আর না থাকে। সংস্কার করিতে গেলে দেখায় যে কোন্ টুকুতে অনিষ্ট হইতেছে কোন্ টুকু বদলাইতে হইবে। বিপ্লবে সে টুকু ঠিক করিবার যো নাই। বিপ্লবে ভাল মন্দ এই দুই অনিষ্ট হইতেছে বোধ হয়। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ ঠিক করিবার উপায় থাকে না। সংস্কারে উদ্দেশ্য ঠিক করিতে পারা যায়, যখন জানা যায়, যে এই টুকু মন্দ, তখন এই টুকু এই উপায়ে বদলাইলেই ভাল হয় তাহাও জানা যায়। কিন্তু বিপ্লবে উদ্দেশ্য ঠিক-হয় না, কত

টুকু বদলাইতে হইবে, তাহার নিশানা হয় না। এই জন্যই দেখা যায়, সংস্কার স্থলে লোকে বলে আমরা এই চাহি। বিপ্লবস্থলে বলে আমরা এ সব আর চাহি না। রিফরম বিল লইয়া গোল-যোগের সময় লোকে বলিল, আমাদের রেপ্রেজেণ্টেটিব দিতে হইবে। ফ্রেঞ্চ বিপ্লবে লোকে বলিল আমরা রাজা চাহি না ওমরাহ চাহি না। এই রূপ উদ্দেশ্য স্থির থাকে বলিয়াই দেখা যায়, যে সংস্কারস্থলে রফা রফিয়াৎ চলে। অর্থাৎ প্রথম অনেক চাহিয়া বসিলেও শেষ কতক দিয়া ঠাণ্ডা করা যায়। যেমন রিফরম বিলের সময় লোকে সমস্ত লোকের মত লইয়া মেম্বার পাঠা-ইতে হইবে চাহিয়া বসিল, শেষ রফা হইল, যাহারা বৎসর ১০ পাউণ্ড খাজানা দেয় তাহারাই পারিবে আর কেহ পা-রিবে না, কিন্তু বিপ্লবস্থলে প্রথম অল্প পরিবর্ত্তের জন্য আরম্ভ হয়, শেষ সব না বদলাইয়া তৃপ্তি হয় না। ফরাসিরা শাসনপ্রণালী বদলাইবার জন্য আরম্ভ করিয়া শেষ না বদলাইয়াছে এমন জিনিসই নাই। তাপমান যন্ত্রের মাপ করিবার পারা পর্য্যন্ত বদলাইয়াছে। যত রকম ওজন, মাপ ছিল, সব দশমিক অঙ্কে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছিলাম—বিপ্লবে উদ্দেশ্য ঠিক করা যায় না বলিয়াই বলিয়াছিলাম যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়ার নাম বিপ্লব নহে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলার নাম বিপ্লব। গড়িতে গেলে উদ্দেশ্যটা ভা-ঙ্গার আগে হইতেই ঠিক থাকা চাহি; বিপ্লবে তাহা একেবারে থাকে না। বিপ্লবে যদি কোন উদ্দেশ্য গোড়া গোড়ি স্থির থাকে তবে সে এই ঃ—

বর্ত্তমান সমাজের দ্বারা আমাদের কাজ চলিতেছে না, ইহাকে ভাঙ্গিয়া মনুষ্যকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন কর, তাহার পর দেখা যাইবে, যদি মনুষ্য-সমাজ ভিন্ন থাকিতে না পারে,তখন উপ-স্থিত মত বিচার করা যাইবে। গড়ার কথা পরে হবে, আগে ভাঙ্গ, আগে উপ-স্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হও।

উপরে সংস্কার ও বিপ্লবের যে রূপ বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাতে আর একটি মতও দূষিত হইল। অনেকে যে বলেন, " ভাঙ্‌বি ত আগে গড়্‌তে শেখ্" আমরা বলি গড়িতে শেখার দরকার নাই। ভাঙ্গিতে পারিলেই হইল। তবে এক কথা এই, সংস্কার সকলে বু-ঝিতে পারেন এই টুকু মন্দ আছে, বাপু ভাল করিয়া লও। বুদ্ধি যতই মোটা হউক না এটা সবাই বুঝিতে পারে। কিন্তু বিপ্লব বুঝা কিছু কঠিন। বর্ত্তমান যা আছে সব বদলাইব, কি হইবে জা-নিতে পারিব না, ইহা বুঝিয়া, এরূপ কার্য্যে সাহসী হইয়া হস্তক্ষেপ করা,সকল মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। আগে ত কেহই বুঝিত না; অষ্টাদশ শতাব্দীর ফিল-জফারদিগের কল্যাণে এখন তবু কেহ কেহ বুঝিতেছে। পৃথিবীর সমাজসকল

যেরূপে গঠিত তাহাতে লোকের "যা আছে বেশ, এর আর বদল কাজ নাই" এই ভাবই জন্মে। বদলাইতেত ইচ্ছা করেই না, তবে একটু আধটু বদলাইলে যদি ভাল হয় ক্ষতি নাই। "একেবারে সব বদল, বাপুরে, সে যে বড ভয়ানক, যা আছে এর কিছু থাক্‌বে না; না তা ত পার্‌ব না," এই ভাবই বেশী, সুতরাং বিপ্লব কেমন করিয়া হইবে। তবে যে দুই একটি বিপ্লব মাঝে মাঝে হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সমূল পরিবর্ত্তও হইয়া গিয়াছে তাহার কারণ এই:—তখন লোকে মনে করিয়াছে যে বর্ত্তমান পাপের ভরা,বর্ত্তমান অত্যাচাররাশি আর সহিতে পারি না, এর চেয়ে মরণ ভাল। এ অবস্থা বদলাইলে সুখ হউক আর নাই হউক অত্যাচার কমিবে, অন্ততঃ উহার রূপান্তরও হইবে। এই বলিয়া জীবনাশায় বিসর্জ্জন দিয়া উন্মত্ত হইয়া লাগিয়াছে, একটা প্রলয় হইয়া গিয়াছে। যে সকল বিপ্লব হইয়া গিয়াছে অধিকাংশ পূর্ব্বোক্তরূপ নৈরাশ্যভাব হইতেই হইয়াছে। আর যত বিপ্লব হইয়াছে অধিকাংশ রাজপরিবর্ত্ত, রাষ্ট্রবিপ্লব, অথবা শাসনপ্রণালীপরিবর্ত্ত। সমাজপরিবর্ত্ত এক ফ্রান্সে হইয়াছে আর কোথায় হতেছি ইবে? আমরা যে বিপ্লবের কথা কহিএও সমাজবিপ্লব। সমাজের আদ্যন্ত পরীক্ষা করিয়া সমাজসংস্কার আবশ্যক বা বিপ্লব আবশ্যক এরূপ বিচার কোথায় হইয়াছে বলিতে পারি না। সমাজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বহুদিন আগে এ সমাজ এ ভাবে চলিবে কি না বলিয়া দেওয়া সামান্য সমাজতত্ত্ববিদের কার্য্য নহে; কিন্তু ইউরোপে অনেকে ৪০।৫০ বৎসর আগে যে সকল ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেক সিদ্ধ হইয়াছে এবং বোধ হয় চেষ্টা করিলে আরও স্পষ্টরূপে বলা যাইতে পারে। যাহারা বহুদিন পদ্মায় মাঝিগিরি করিতেছে তাহারা মেঘের আকার, বায়ুর গতি দেখিয়া ৪।৫ ঘণ্টা আগে ঝড় হইবে টের পায়, যদি উদ্ধারের উপায় থাকে করে, আর যদি না থাকে সেই ৪।৫ ঘণ্টা আগেই বলিয়া দেয় "যে যার চেষ্টা কর, রক্ষা হবার নয়।" বিপ্লবের পূর্ব্বেও ঠিক সেইরূপ বলা চাহি। তবে সমাজতত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে, সমাজনৌকা সময়স্রোতে বেশ চলিয়া আসিতেছে, ঐ পাহাড়ে,ঐ চড়ায় তাহার বাণচাল হইবে, এই উপায়ে অন্য পথে চালাইতে পারিলে উদ্ধার নচেৎ সর্ব্বনাশ। অথবা "এ সমাজগৃহ অত্যন্ত জরাজীর্ণ, সামান্য বাতাসেই ভূমিসাৎ হইবে, বাতাসে পড়িলে অনেক লোক মারা পড়িবে, কাজ নাই এই বেলা বাতাস না উঠিতে ইহার বিনাশ সম্পাদন কর।" এই সকল কথা যখন বলিতে পারিবে তখন সমাজতত্ত্বশাস্ত্রের দ্বারা জগতের উপকার হইল বলিয়া স্বীকার করিব।

সমাজের সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার কোথায় কি দোষ আছে এবং সেই দোষের জন্য সংস্কার প্রয়োজন বা বিপ্লব প্রয়োজন বলা সহজ নহে এবং সংস্কার যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিপ্লব হইল এবং বিপ্লবস্থলে সংস্কার হইলে জগতে ভয়ানক অনিষ্ট হয়। এবং এ পর্য্যন্ত কত দেশ যে এই দোষে উৎসন্ন গিয়াছে তাহা বলা যায় না। ফরাসীদেশে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যে ভয়ঙ্কর প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয় তাহাতে সে একপ্রকার নূতন সমাজের নূতন জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। সে নূতন সমাজে বিপ্লব আর প্রয়োজন করে না বোধ হয় কোন বিষয়েই বদল দরকার হয় না, কিন্তু এই ৮৯ বৎসরের মধ্যে সেখানে ৪।৫টী বিপ্লব হইয়া গেল, নূতন সমাজে বিপ্লব হইলে সমাজের শক্তি হ্রাস হয়,তাহা গত প্রুসিয়ার যুদ্ধে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। যেখানে সংস্কার স্থানে বিপ্লব করা হয়, সেখানে ত এইরূপ, আবার যেখানে বিপ্লবস্থানে সংস্কার হয় সম্পূর্ণ বদল না করিয়া কিছু পরিবর্ত্তে শান্ত থাকা যায়, সেখানে দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। সাক্ষী রোম, রোমের ইতিহাস আদ্যন্ত এই মহৎ সত্যের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। রোমের সমাজ একটি নগরের সমাজ, একনগরের শাসন, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখসমৃদ্ধির জন্য যা কিছু দরকার রোমে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ক্রমে সেই এক নগরীর অদৃষ্টে সমস্ত জগতের আধিপত্য ঘটিল। তখন আর পুরান নগর শাসন প্রণালীতে চলিবে কেন? তখন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত স্বতই প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কিন্তু সেটি কেহ বুঝিতে পারিল না। যে সেনেট খ্রীষ্টাব্দের (৪০০) বৎসর পূর্ব্বে সুচারুরূপে রোম শাসন করিয়াছে, সেই সেনেট খৃঃ পূঃ ১৫০ ইউফ্রেটীস হইতে আটলাণ্টিক পর্য্যন্ত শাসন করিতে পারিবে কেন? রোমের পক্ষে ভয়ঙ্কর দিন সুতরাং উপস্থিত হইল। একশত বৎসর ধরিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, পৃথিবী রক্তস্রোতে প্লাবিত, খুন মারামারি কাটাকাটি অত্যাচার লোমহর্ষণ উৎপীড়ন,নগরদাহ প্রভৃতি পাঠ করিলে শরীর কণ্টকিত হয়। পৃথিবীর অমন দিন যেন আর না হয় এই সময় একজন লোক কেবল সম্পূর্ণ বিপ্লব করিতে চেষ্টা করেন। তিনি সম্পূর্ণ রূপে বুঝিয়া ছিলেন এভাবে আর চলিবে না। সেই লোক কয়াস্ গ্রেকাস্। তাঁহার কথা কেহ শুনিলনা। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য গণনা, একশত বৎসরের রক্তস্রোতের পর শেষ তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই দাঁড়াইল। অগষ্টস্ যাহা করিলেন গ্রেকাসও ঠিক তাহাই করিতে চাহিয়াছিলেন। রোমের স্বাধীনতা বিলোপ ও যথেচ্চাচার নামক শাসনপ্রণালী প্রচলন, এই বিপ্লবের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিপ্লব হইল বটে বিপ্লবে উপকারও হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় তিনবৎসর বিশাল রোমাণ

সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল, অন্ততঃ ভয়ানক অন্তর্বিদ্রোহ হয় নাই। কিন্তু যথেষ্টাচারে সমস্ত লোকের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল, শেষ সেই বিশাল সভ্যসাম্রাজ্য অসভ্য লোকের উৎপীড়নে লণ্ডভণ্ড হইয়া আবার কতশত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীশুদ্ধ রক্তস্রোতে আর্দ্র করিতে লাগিল। পরিণামে যাহাই হউক যখন অগষ্টসের সময় বিপ্লব সমাধা হয় তখন সকলেই বলিয়াছিল “আঃ বাঁচিলাম একশত বৎসরের অরাজক ত শেষ হইল, এখন নিশ্বাস ফেলিবার সময় হইল।” ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তে বুঝিতে একটু দেরি হয়, আবার সেই ভাঙ্গা বাড়ীর দৃষ্টান্তে দেখাই, যদি যখন বাড়ীটির একটু দাগবাজি হইলেই চলে, সে সময় তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেল তাহাতে গৃহস্থের অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই। আবার যখন বাড়ীটী সম্পূর্ণরূপে জরাজীর্ণ হইয়াছে,যখন একটু বাতাস হইলেই বুনিয়াদ শুদ্ধ নড়ে, যখন লোণা লাগিয়া সব ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অশ্বত্থগাছের শিকড় যখন তেতালা হইতে নামিয়া মাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল নয় কি? তাহার যতই মেরামত কর, নিশ্চিন্ত হইয়া সে বাড়ীতে কাহারও বাস করিবার যো নাই। বরং যে গৃহস্থ ভাঙ্গা মন্দিরে নিত্য খোয়া দিতে থাকে, তাহার টাকার বাড় বাঁধে না, হাজার সারাও কখন্ পড়িবে কখন্ পড়িবে ভয় সর্ব্বদাই করিবে। শেষ একদিন হয় ত পড়িয়া গিয়া সহস্র সহস্র লোকের গোর হইয়া চিরকাল প্রতিবেশীদিগকে ভূতের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। এরূপ বাড়ীর সংস্কার করিলে হয় ত দুপাঁচটি ঘর বাসযোগ্য হইতে পারে, অথবা এখনি পড়িত, না হয় দুবৎসরের জন্য তাহা রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই দুবৎসরও সর্ব্বদা সশঙ্কিত। আমার মতে তেমন বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল। এই ভাঙ্গা বাড়ীর দৃষ্টান্তটি আমাদের হিন্দুসমাজে বেশ খাটে, হিন্দুসমাজ কতকেলে সমাজ যে তাহার ঠিকানা হয় না। ইহার বুনিয়াদ অতি সঙ্কীর্ণ। মনুর সংহিতায় দেখিতে পাই ভারতবর্ষ যখন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখন তাহারই কোথাও কোথাও প্রকৃত হিন্দুসমাজ ছিল। যখন এলাহাবাদের এদিকে আর্য্যদিগের নাম ছিল না, যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বই জাতি ছিল না, তখন এই সমাজ ছিল। তাহার পর কত ধর্ম্ম কত বিপ্লব গিয়াছে কত নূতন শাসনপ্রণালী হইয়া গিয়াছে এখন ২০০০ জাতি হইয়াছে। ভারতের অর্দ্ধেক মুসলমান হইয়াছে। ইংরাজেরা সর্ব্বোপরি সর্ব্বশক্তিময়ী ডানা বিস্তার করিয়া সকলকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে, হিন্দুসমাজের জাঁকটুকু ছাড়া আর কি আছে? এখন কি না আমরা হিন্দুসমাজকে ভারতসমাজের

(Indian Nation) সঙ্গে এক করিয়া ধরি। কি ভুল! এমন হিন্দুসমাজের যত শীঘ্র অস্তিত্ব বিলোপ হয় ততই ভাল।

সমাজ মনুষ্যের জন্য, মানুষ সমাজের জন্য নহে। মানুষ আপনাদের সুখ সমৃদ্ধি স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য সমাজ বলিয়া একটী নূতন সৃষ্টি করে। উচিত যে যেমন মানুষের মনের শরীরের ও সংসারের অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গেই সমাজেরও পরিবর্ত্তন হয়। তাহা হইলেই সমাজের উদ্দেশ্য স্থির থাকে। আরনোল্ড বলেন সমাজেরও বাল্য, শৈশব ও যৌবন আছে, বৃদ্ধাবস্থাও আছে, মৃত্যুও আছে। সমাজের ক্রমে পরিবর্ত্তন স্বতই হয়, সেই পরিবর্ত্তনটী সমাজস্থ লোকের আয়ত্ত মত করিয়া লওয়া বড় দরকার। আপনি পরিবর্ত্তন হইলে এই মত হইবে, এই মত হইলে এই দোষ হইবে, অতএব একে এই দিকে ফিরাও, ওরূপ দোষ ঘটিলে দেশের অনিষ্ট হইবে। এই সকল বিবেচনায় সমাজ চালান পাকা ড্রাইবরের কাজ। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে মনুষ্য সমাজের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সমাজ বজায় রাখাই মানুষের কাজ, যে অসুরের অবতার সেই সমাজের পরিবর্ত্তন চাহে। এ রূপ ভাবিলে ও তদনুসারে কার্য্য করিলে সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বরং বিস্তর অপকার হয়। এই কথা কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে। প্রথম উদাহরণ রোমাণ জগৎ। রোমসমাজ এক সময়ে সমস্ত জগৎ জয় করিয়া সমস্ত জগৎকে রোমাণ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু উত্তরদেশীয় অসভ্যদিগের দৌরাত্ম্যে সেই রোমাণ সমাজ লণ্ড ভণ্ড হইয়া গেল। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রোমের নাম লোপ হইল। যথেষ্টাচার শাসনপ্রণালীর প্রভাবে ও উৎপীড়নে রোমের যেরূপ নির্জীবাবস্থা হইয়াছিল তাহাতে রোম-সমাজবিনাশ জগতের ভাবী উন্নতির সূত্রপাত মাত্র। রোমসাম্রাজ্য ধ্বংস হইল রোমনগর ভস্মসাৎ হইল। রোম সাম্রাজ্য মধ্যে ১০।১২টি প্রবলপরাক্রম স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইল। নূতন আইন কানুন চলিতে লাগিল কিন্তু লোকে তখন বলিত আমরা রোমাণ সাম্রাজ্যের লোক। ভস্মাবশিষ্ট রোমপুরী তখন তাহাদের মনে মনে রাজধানী রহিল। শেষ রোমক সম্রাজ্য পুনরুদ্দীপন করা রাজাদিগের একটা উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। কত কাটাকাটি মারামারির পর ৩ বৎসর পরে সারলেমেন আরাব হোলি রোমান এম্পারার উপাধি লইলেন। নামে রোম হইল, কাজে যে অসভ্য শাসন তাই রহিল, সারলমেন মরিলে আবার Emperor এই উপাধির জন্য ২০০ বৎসর লড়াই ঝগড়া চলিতে লাগিল। শেষ দশম শতাব্দীতে ওথো আপন দেশে Emperor নাম বদ্ধমূল করিয়া গেলেন। ওথোর পরও এই Emperor হবার জন্য কত লোকে কত মারামারি করিয়াছে। ষোড়শ

শতাব্দীতে ফ্রান্স ও জার্ম্মনিতে যে সকল যুদ্ধ হয় তাহারও কারণ এই উপাধি। শেষ উপাধি পড়িল ডিউক অব আষ্ট্রীয়ার ঘাড়ে। আষ্ট্রীয়ার রাজ্য ছোট নাম বড়। ডিউক এমপেরর তৃতীয় ফর্দ্দিনান্দের দারিদ্র ইউরোপে আজিও হাসির জিনিস্ হইয়া রহিয়াছে। শুদ্ধ নাম লইয়া হইলে না হয় হাসির জিনিস্, একটু হাসিয়াই ছাড়িয়া দিতাম। এই মৃত সাম্রাজ্যের জ্বালায় জার্ম্মনি ও ইটালি কখন একত্রিত হইতে পারে নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া অমন সুখভূমি ইটালি শত শত বৎসর ধরিয়া শ্মশান ভূমি হইয়া পড়িয়াছিল। শেষ নেপোলিয়ান ১৮০৬ সালে রোমসাম্রাজ্যের নাম তুলিয়া দিলেন। তাহার ফল দেখ, ইটালি বাঁচিল, জার্ম্মনি বাঁচিল, এই দুইটী দেশ এই ৫০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর প্রধান দেশমধ্যে গণ্য হইয়াছে।

যদি রোম নামের মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া ইটালি ও জর্ম্মনি যখন উহাদের সুদিন ছিল, তখন হইতে আপন আপন নামে রাজ্য করিত, যদি একাদশ শতাব্দী হইতে মিলান প্রভৃতি নগর গুলি ও জর্ম্মনি বহাল্পারা নগরসমবায় সকল স্বাধীন ভাবে উন্নতি লাভ করিত তবে কি আর জার্ম্মনি ইটালির দুর্দ্দিন হইত। না ফ্রান্স এত দৌরাত্ম্য করিতে পারিত। সত্য বটে, ভাল জিনিস্ যত্ন করে বেশী দিন রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। রোম সাম্রাজ্য একটি ভাল জিনিস। কিন্তু যখন সেই রোম ভাল জিনিস্ যখন রোমধ্বংস হইবে নিশ্চয়, জন কত Antiquarian লাগাইয়া দাও রোমের যা কিছু ভাল ছিল, তাহার একটা রেজিষ্টর হইয়া থাকুক। ভবিষ্যতে লোকে পড়িয়া শিখিতে পারিবে। তাহা না করিয়া যখন সেই ভাল জিনিস্ রক্ষা হইবার নহে তখন তাহা রক্ষার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া অগণ্য প্রাণিসংহার, যখন ধ্বংস হইয়া গেল তখন আবার সেই মৃত বস্তুর ভূত উদ্ধারের বৃথা চেষ্টায় পৃথিবী শোণিতাক্ত করা, ভূত উদ্ধার হইলে সেই ভূত আশ্রিত করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে ১২ শত বৎসর ধরিয়া নানারূপ কষ্ট দেওয়া কি উচিত, না বিবেচনার কাজ? ভাল জিনিস্ ভাল, ভাল জিনিসের স্মৃতি ভাল। ভাল জিনিস্ মন্দ হইলে ভাল নয়। ভাল জিনিস্ কচলাইয়া তিত করিলে ভাল নয়, ভাল জিনিস্ পচাইয়া দুর্গন্ধ করিলেও ভাল নয়। রোম ভাল ছিল কিন্তু রোমের যে ছায়া, ৮০৬ সাল পর্য্যন্ত ইয়ুরোপের মস্তক আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা ভাল ছিল না।

বঙ্গীয় পাঠক ইয়ুরোপীয়দিগের আহাম্মকি দেখিয়া হাসিওনা। তোমাদের সমাজও ঐ রূপ ছায়াবৃত ঐরূপ ভূতাবেশ বই আর কিছু নয়। তোমাদের যে হিন্দুসমাজ, বল দেখি তার কি আছে? হিন্দু সমাজ ছিল যখন বুদ্ধদেব জন্মান নাই। বুদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল হইল হিন্দুর আর কি রহিল? কিন্তু তোমরা

২৫০০ বৎসর কেবল ভূতের বোঝা টানিয়া বেড়াইতেছ বই নয়। বৌদ্ধদের সঙ্গে যত দিন সমান জোরে লড়িয়াছ, তত দিন তোমাদের জীবন ছিল সন্দেহ নাই। তাহার পর যে দিন হইতে মগধসাম্রাজ্য স্থাপন হইল সেই দিন হইতে কি তোমাদের পাতড়াড়ি গুড়ান উচিত ছিল না? তাহা না করিয়া বলবানের সঙ্গে দুর্ব্বলের বিবাদ হইলে দুর্ব্বলের যত দোষ ঘটে সব তোমাদের ঘটিল, তোমরা ভীরুতা দুষ্টামি ফেরাবি শিখিতে লাগিলে। বৌদ্ধেরা ক্রমে ক্ষীণতেজঃ হইয়া আসিলে তোমরা আবার প্রবল হইলে। তখন তোমাদের ঘটে যে বিষয়বুদ্ধি ছিল সে টুকুর লোপ হইয়া গিয়াছে। তোমরা নূতন সমাজ সৃষ্টি না করিয়া সেই সেকেলে বেদ উদ্ধার করিতে গেলে, পৌত্তলিক ও বৈদিকে বিবাদ আরম্ভ হইল। এই বিবাদে তোমাদের সমাজ ক্রমে অন্তঃসারবিহীন হইয়া পড়িল. যেখানে ঐক্যের দরকার সেইখানে ঘরে ঘরে অনৈক্য হইল। শেষ বেদ, স্মৃতি, বুদ্ধ, জৈন পুতুল ব্রহ্ম সব দুরন্ত মুসলমানের হাতে পড়িল। তাহাতেই তোমাদের লজ্জা হইল কই? চৈতন্য হইল কই? সমাজপরিবর্ত্তনের কটা চেষ্টা করিয়াছ? বলিলে কি না অদৃষ্টের ফল। রোমানেরাও সেকালে বলিয়াছিল অদৃষ্টের ফল। বড় সুবিধা। দুবার বলিলে অদৃষ্টের ফল, দুটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলে—সব—সব দুঃখ ঘুচিয়া গেল, আপনাদের দোষ যে তাহা এক বারও ত ভাবিলে না।

যাহা হউক, আমাদের সমাজে সংস্কার কি বিপ্লব আবশ্যক সে কথা তুলিয়া কাজ নাই। আমাদের অদ্যকার প্রস্তাব এই যে, সমাজের কত প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। দেখা গেল যে সে দুই প্রকার, সংস্কার ও বিপ্লব। দুইএরই সময় আছে কিন্তু সংস্কারের সময় বিপ্লব বা বিপ্লবের সময় সংস্কার হইলে হিতে বিপরীত হয়। তাহার ফল অতি ভয়ানক।

রাগ নির্ণয়।

সকল মতেই শ্রীরাগ প্রথম। ইহা সম্পূর্ণ রাগ। ইহার লক্ষণ এই যে
"শ্রীরাগঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ স ত্রয়েণ বিভূ
ষিতঃ।
পূর্ণঃ সর্ব্বগুণোপেতো মূর্চ্ছনা প্রথমা মতা।
কেচিত্তু কথয়ন্ত্যেনং ঋষভত্রয় সং
যুতম॥"

সত্রয়ে বিভূষিত প্রথম (ষড়জ) গ্রামের মূর্চ্ছনা। কেহ বলেন ইহা রিত্রয়যুক্ত। উদাহরণ—স রি গ ম প ধ নি স।

রাগগুলির উদাহরণস্থলে এক একটি মূর্ত্তি কল্পনা আছে, তাহা এ প্রস্তাবে উল্লেখ করিব না। কাল্পনিক ভাব উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি পরিদর্শনের নিমিত্ত একটী মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

" লীলাবিহারেণ বনান্তরালে
চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসবেশো ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ
শ্রীরাগ এষঃ কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ॥"

উদ্যানের মধ্যে, হাব ভাব বিলাসের সহিত, বধূসমভিব্যাহারে, পুষ্পচয়ন করিতেছেন। কবিরা বলেন, এই শ্রীরাগের মূর্ত্তি স্বর্গীয ও বিলাসোপযোগী বেশ ভূষায় পরিচ্ছন্ন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক্ষণে রাগ রাগিণীর এরূপ বৃথা বেশ ভূষার বর্ণনা না করিয়া, যাহা যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ যে যে রাগে বা যে যে রাগিণীতে যে যে স্বর আছে, কোনটী ওড়ব কোনটী খাড়ব কোনটীই বা সম্পূর্ণ, তাহাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

মালব শ্রী—"মালব শ্রীশ্চ রাগঙ্গাপূর্ণা স
ত্রয় ভূষিতা।
মূর্চ্ছনোত্তর মন্দ্রাস্যা চ্ছঙ্গার
রসমণ্ডিতা॥"

উদাহরণ—সরি গ ম প ধ নি স।

ত্রিবণী—রি ও প বর্জ্জিত। ওড়ব রাগ।

উদাহরণ—ধ নি স গ ম ধ।

ধৈবতে আরম্ভ ও ধৈবতে সমাপ্তি। যথা—
"ত্রিবণী সাচ বিজ্ঞেয়া গ্রহাংশ ন্যাস
ধৈবতা।
ঔড়বা সাচ বিজ্ঞেয়া রি পহীনা প্রকীর্ত্তিতা॥

গৌরী—ওড়ব, রি প বর্জ্জিত, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর ষড়জে।
উদাহরণ—স গ ম ধ নি স।

যথা—
ষড়্জগ্রহাংশক ন্যাসা রিপহীনা তু ঔড়বা।
মূর্চ্ছনা প্রথমা জ্ঞেয়া গৌরী সা কথিতা
বুধৈঃ॥

কেদারী—ওড়ব, রিধবর্জ্জিত, তিন নি যুক্ত, মার্গী মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স উদাহরণ—(স গ ম প নি স)
প্রমাণ—কেদারী নিধহীনাস্যাদৌড়বা
পরিকীর্ত্তিতা।
নিত্রয়ামূর্চ্ছনামার্গী কাকলী স্বরমণ্ডিতা॥

মধুমাধবী—ওডব, গ ধ হীন, প্রথম মূর্চ্ছনা, আবস্ত ও সমাপ্তি স্বর স।

উদাহরণ—(স বি ম প নি স)

প্রমাণ—ষড্জাংশক গ্রহন্যাসা গধহীনাতু মাধবী।

প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া ঔডবা পরিকীর্ত্তিতা॥

পাহাড়ী—ওড়ব, বাগ বিপ বর্জিত, (তৈলঙ্গ দেশের) আবস্ত ও সমাপ্ত স্বব স।

উদাহরণ—(স গ ম ধ নি স)

প্রমাণ—ষড্জত্রয়া পাহাড়ী স্যাৎ বিপ হীনা চ কীর্ত্তিতা।

ছায়া তৈলঙ্গদেশীয়া আলাপে ঔডবা মতা॥

বসন্ত—ষড্জ ও মধ্যম হইতেই ইহার উত্থান সুতবাং ষড্জ স্বরই ইহার গ্রহ, ন্যাস ও অংশ। এই সম্পূর্ণ রাগটি বসন্তকালে গেয়।

প্রমাণ—ষড্জান্মধ্যমিকাজ্জাতঃ ষড্জ ন্যাস গ্রহাংশকঃ।

গেয়ো বসন্তবাগোঽয়ং বসন্তসময়ে বুধৈঃ॥

তোড়ী—সম্পূর্ণ বাগ, মধ্যমে আবস্ত মধ্যমেই সমাপ্তি, মতান্তবে আবস্ত ও সমাপ্তি স্বব স। সৌবীরী মূর্চ্ছনা।

উং—(ম প ধ নি স রি গ ম। কিম্বা স রি গ ম প ধ নি স)

প্রমাণ—মধ্যমাংশ গ্রহন্যাসা সৌবেরী মূর্চ্ছনা মতা।

সম্পূর্ণা কথিতা তজ্জ্ঞৈ স্তোড়ী শ্রীকৌশিকে মতা।

গ্রহাংশন্যাস ষড্জা চ কৈশ্চিদত্র প্রচক্ষতে।

ললিতা—ওড়ব, কোনমতে সম্পূর্ণ রাগ। বি প বর্জিত, শুদ্ধমধ্য মূর্চ্ছনা, আরম্ভ সমাপ্তি স্বর স।

উং—(স গ ম ধ নি স)

প্রমাণ—রিপহীনাচ ললিতা ঔড়বা সত্রয়া মতা।

মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাৎ সম্পূর্ণাং কেচিদূচিবে॥

হিন্দোলী—ওডব, বিধ বর্জিত, ৩ স, যুক্ত, শুদ্ধমধ্যমূর্চ্ছনা, আবস্ত সমাস্বর স। (স গ ম প নি স স)

প্রমাণ—হিন্দোলিকা রিধত্যক্তা স ত্রয়া গদিতা বুধৈঃ।

মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যাচ ঔডবা কাকলিযুতা।

ভৈবব—ওড়ব, বি প বর্জিত, ধৈবতাদি মূর্চ্ছনা, আবস্ত ও সমাপ্তি স্বর ধ, অন্তে ম, বিকৃত ধ। উদাহবণ (ধ নি স গ ম ধ)

প্রমাণ—ধৈবতাংশ গ্রহন্যাসো রিপহীনোঽথমান্তগঃ। ঔড়বঃ স তু বিজ্ঞেযো ধৈবতাদিক মূর্চ্ছনা॥ ধৈবতো বিকৃতো যত্র ভৈববঃ পবিকীর্ত্তিতঃ॥

ইহার উদাহরণস্থলে এইরূপ মূর্ত্তি লিখিত আছে, যথা—

"গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলক স্ত্রিনেত্রঃ সর্পৈ-
র্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।
ভাস্বত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী শুভ্রাম্বরো
জয়তি ভৈরব রাগরাজঃ ॥

হনুমন্মতেও ইহা ওড়ব রাগ। যথা—
ধৈবতাংশগ্রহ ন্যাসো রিপহীনস্তমাগতঃ।
ভৈরবঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ধৈবতাদিক মূর্চ্ছনা।
ধৈবতো বিকৃতো যত্র ওড়বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥*

ভৈরবী—সম্পূর্ণ, সৌবীরী মূর্চ্ছনা, মধ্যম গ্রাম ইহার গতি, আরম্ভ ও শেষ ম।
উং—(ম রি গ ম প ধ নি)
প্রমাণ—সম্পূর্ণা ভৈরবীজ্ঞেয়া গ্রহাংশ
ন্যাস মধ্যমা।
সৌবীরি মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যম
গ্রামচারিণী।

দেশী—ইহাতে পঞ্চম বর্জ্জিত, রি ত্রয় যুক্ত, বিকৃত রি, কপোল লতিকা নামক মূর্চ্ছনা। এটী ষাড়ব রাগ।
উং—রি গ ম ধ নি স রি রি।
প্রমাণ—দেশী পঞ্চমনামা স্যাৎ ঋষভ
ত্রয় সংযুতা।
কপোললতিকা জ্ঞেয়া মূর্চ্ছনা
বিকৃতর্ষভা॥

বাঙ্গালী—ওড়ব, মতান্তরে পূর্ণা। রি ধ বর্জ্জিত, গ্রহাংশ ন্যাস স্বর স, প্রথম মূর্চ্ছনা,
উং—স গ ম প নি স।
প্রমাণ—বাঙ্গালী ওড়বা জ্ঞেয়া গ্রহাংশ
ন্যাস ষড়্জভাক্।
রিধহীনাচ বিজ্ঞেয়া মূর্চ্ছনা
প্রথমা মতা।
পূর্ণা বা মতত্রয়োপেতা কল্লিনাথেন
ভাষিতা।

কল্লিনাথ মতে ইহা সম্পূর্ণ, ৩য় যুক্ত। আরম্ভ ও শেষ স।
উদাহরণ—ম ধ নি স রি গ ম।

দেবগিরি—ইহাতে সারঙ্গীর তুল্য স্বর। যথা—
"দেবগির্য্যাঃ স্বরাঃ প্রোক্তাঃ সারঙ্গী
সদৃশা মতাঃ।

সৈন্ধবী—পূর্ণ, কোন মতে খাড়ব, রি বর্জ্জিত, স রি গ ম প ধ নিস।
মতান্তরে—স গ ম প ধ নি স।
প্রমাণ—
ষড়্জগ্রহাংশক ন্যাসা পূর্ণা সৈন্ধবিকা
মতা।
মূর্চ্ছনোত্তরমন্দ্রাঢ্যা কৈশ্চিৎ ষাড়বিকা
মতা॥

রামকিরী—সম্পূর্ণ, ১ প্রহর মধ্যে গেয়, আরম্ভ সমাপ্ত স্বর স, প্রথম মূর্চ্ছনা।
উং—স রি গ ম প ধ নি স।
প্রমাণ—
প্রহরাভ্যন্তরে গেয়া ষড়্জন্যাস গ্রহাংশকা
প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া তজ্জ্ঞৈ রামকিরী
মতা।

---

* ভৈরব রাগ সম্পূর্ণ বলিয়া প্রচলিত, ইহার ফল সম্পূর্ণ, তদনুসারে গীত হইয়া থাকে সত্য কিন্তু উপরের লিখিত বচনে ইহাকে স্পষ্টতঃ ওড়ব বলা হইয়াছে।

গুর্জ্জরী—সম্পূর্ণা,আরম্ভাদি রি, সপ্তম মূর্চ্ছনা, বহুলীর সহিত মিশ্রিত,

উং—রি গ ম প ধ নি স রি ।

প্রমাণ—

গ্রহাংশন্যাস ঋষভা সম্পূর্ণ গুর্জ্জরী মতা ।
সপ্তমী মূর্চ্ছনা তস্যাং বহুল্যাসহ মিশ্রিতা

গুণকিরী—ওড়ব, রি ধ বর্জ্জিত, আরম্ভাদি নি, কোন মতে স, ইহা ভৈরবের আশ্রিত ।

উং—নি প গ ম প নি, মতান্তরে স গ ম প নি স ।

প্রমাণ—

রিধহীনা গুণকিরী ওড়বা পরিকীর্ত্তিতা ।
নি গ্রহাংশা তু নি ন্যাসা কৈশ্চিৎষড্জ-
ত্রয়া মতা ।

পঞ্চম—ইহা খাড়ব, প বর্জ্জিত, প্রথম মূর্চ্ছনা, আরম্ভাদি স, মতান্তরে পূর্ণ ।

ইহা শৃঙ্গার রসের উত্তেজক ।

উং—স রি গ ম ধ নি স । মতান্তরে স রি গ ম প ধ নি স ।

প্রমাণ—

রাগপঞ্চমকো জ্ঞেয়ঃ প-হীনঃ খাড়বো
মতঃ ।
প্রথমা মূর্চ্ছনা যত্র স-ত্রয়েণ বিভূষিতঃ ।
কেচিদ্বদন্তি সম্পূর্ণং শৃঙ্গার রস পূরকম্ ॥

বিভাষ—ইহা ললিতার ন্যায়, স গ ম ধ নি স ।

প্রমাণ—

ললিতাবদ্বিভাষা তু রেবা গুর্জ্জরিবৎসদা ।

ভূপালী—সম্পূর্ণ, মতান্তরে ওড়ব, রি প বর্জ্জিত, শান্তিরসের উত্তেজক, প্রথম মূর্চ্ছনা, আরম্ভ শেষ স্বর স ।

উং—স রি গ ম প ধ নি স । মতান্তরে স গ ম ধ নি স ।

প্রমাণ—

গ্রহাংশন্যাস ষড্জা সা ভূপালী কথিতা
বুধৈঃ ।
প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া সম্পূর্ণা রস-
শান্তিকে ।
রিপ হীনৌড়বা কৈশ্চি দিয মেব
প্রকীর্ত্তিতা ।

কর্ণাটী—সম্পূর্ণ, ইহাতে বিকৃত নি, মার্গ নামক মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও শেষ স্বর নি ।

উং—নি স রি গ ম প ধ নি নি ।

প্রমাণ—

নিষাদত্রয়সংযুক্তা বিকৃতোঽস্যাঁ নিষাদকঃ ।
মার্গাখ্যা মূর্চ্ছনা প্রোক্তা কর্ণাটী চ সুখ-
প্রদা ॥

বড়হংসিকা—ইহাতে কর্ণাটীকার ন্যায় স্বর, কেবল মূর্চ্ছনা ভিন্ন ।

উং—নি স রি গ ম প ধ নি নি ।

প্রমাণ—

কর্ণাটীকাস্বরা জ্ঞেয়া বড়হংসা স্বরা বুধৈঃ ।

মালবী—ওড়ব, নিষাদে আরম্ভ ও শেষ, রঞ্জনী মূর্চ্ছনা, রি প বর্জ্জিত ।

উং—নি স গ ম ধ নি নি ।

প্রমাণ—

ওড়বা মালবী প্রোক্তা নিষাদত্রয়সংযুতা ।
রঞ্জনী মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া রি প হীনা চ
সর্ব্বদা ।

পটমঞ্জরী—সম্পূর্ণ, গ্রহ অংশ ও ন্যাস স্বর পঞ্চম, হৃষ্টকা নামক মূর্চ্ছনা, ইহা রসিকদিগের প্রিয়।

উং—প ধ নি স রি গ ম প।

প্রমাণ—পঞ্চমাংশ গ্রহন্যাসা সম্পূর্ণা
পটমঞ্জরী।
মূর্চ্ছনা হৃষ্টকা জ্ঞেয়া রসিকৈঃ
প্রার্থিতা সদা॥

ইত্যাদি ইত্যাদি

এতদ্ভিন্ন মেঘ, মল্লারী, সৌবাটী, সাবেরী, বা সৌবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গার, এই কয়েকটি রাগ পর পর লিখিত আছে।

তৎপরে নট্টনারায়ণ, কামোদী, কাল্যাণী আভিরী নাটিকা, সারঙ্গ, হাম্বীরা, এই কয়টি নির্দ্দিষ্ট আছে। এ সমস্তই প্রাচীন রাগ রাগিণী।

শ্রীরামদাস সেন।

বন্ধুতা।

পুরুষোত্তম—সন্ধ্যা—সমুদ্রতীর।

১

এ জীবন ফিরিবে না আর!
কালের তরঙ্গে সথে,
যে রত্ন ভাসিয়া গেল,
গেল চির দিন তরে, ফিরিবে না আর!
হায় রে জীবন নদী, এক স্রোত প্রবাহিনী,
চলিয়াছে এক স্রোতে উজান বহে না আর!

২

যা যায় তা যায় সথে, বড়ই মধুর।
কৈশোরে শৈশব যেন,
নবীন স্বরগ শোভা;
যৌবনে কৈশোর শোভা,
মরি কিবা মনোলোভা।
সেই খেলা সেই হাসি,
বিমল আনন্দরাশি,
সে পবিত্র জগতের,—মরি কি সুন্দর!
সে বিশ্বাস, ভাল বাসা, তরল অন্তর।

৩

যৌবন সঞ্চারে সেই পবিত্র জগতে,
কত রূপান্তর!
বিশ্বাসে সন্দেহ আসে,
ভালবাসা স্বার্থে গ্রাসে,
তরল অন্তর হয় কঠিন প্রস্তর।
কৈশোরের সরলতা,
নিরমল জ্যোৎস্নায়,
কুটিল করাল ছায়া ক্রমশঃ মিশিয়া যায়।

৪

যদি না মিশিল,
তুমি অভাগা মানব, তোমার জীবন,

সংসার সাগর বক্ষে,
কর্ণধার হীন তরী,
প্রত্যেক তরঙ্গ ক্রীড়া
পরিণাম নিমগন।

৫

বন্ধুত্বে বিপদ তব, প্রণয়ে নিবাশ,
ভীষ্মশরশয্যা তব সংসার নিবাস।
সকলি মায়ার খেলা,—
আজি যথা হাসি রাশি,
কালি তথা দাবানল,
আজি যাহা সুধাময়,
কালি তাহা হলাহল।
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে কর পর উপকার,
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত পাবে প্রতিদান তার।

৬

এ সিন্ধু সৈকতে, সান্ধ্য গগন ছায়ায়,
বসি তব পাশে সখে উচ্ছ্বসিত প্রাণে,
খুলিয়া হৃদয় দ্বার,
দেখায়েছি কত বার,
কত শত তীক্ষ্ণ অসি, কৃতঘ্নতা করে,
সহিয়াছি অকাতরে কোমল অন্তরে।

৭

একদা প্রভাতে সখে, মেলিয়া নয়ন,
সিন্ধু প্রান্তে সুসজ্জিত জলদমালায়,
দেখিলাম জন্মভূমি প্রতিমূর্ত্তি প্রায়।
তেমনি শ্যামল শোভা মণ্ডিত শেখর,
স্থানে স্থানে সমুন্নত, অতীব সুন্দর,
রহিয়াছে স্থির ভাবে প্রবাহ খেলিয়া,
উর্ম্মির উপরে যেন উর্ম্মি সাজাইয়া।
নিম্নস্তরে সাগরোর্ম্মি সুনীল বরণ,
ঊর্দ্ধ স্তরে শেখরোর্ম্মি শ্যাম সুদর্শন।
ভরিল হৃদয়, ধীরে ভিজিল নয়ন,
জননীপ্রতিম মূর্ত্তি করি দরশন।
দূর হতে প্রণমিয়া কহিলাম ধীরে,
"জন্মভূমি! কেন মাতা দেখা দিলে ফিরে?
হৃদয়ের রক্তে অঙ্গ আসিনু মাখিয়া,
বালার্ক বক্তিম করে তাহা অভিনিয়া
আসিলে কি দেখাইতে? পরীক্ষিতে আর
এখনো বহিছে কি না শোণিতের ধার,
হৃদয় হইতে বেগে? বহিছে, বহিবে,
যত দিন শেষ বিন্দু হৃদয়ে রহিবে।
রক্ষিতে পরের প্রাণ, আপনার প্রাণ
এখনো অর্পিতে পারি তৃণের সমান।
যারা গৌরাঙ্গের কৃপা কটাক্ষের তরে,
বিশ্বাস, বন্ধুতা, সব বিনিময় করে,
বলিও তাদেরে, মাতা, বলিও নিশ্চয়,
এখনো বিপদে তুচ্ছ, নির্ভয় হৃদয়।
উচ্চত্বর রক্তস্রোত ধমনীতে ধরি,
নীচত্বের মস্তকেতে পদাঘাত করি।"

৮

জানি তুমি বলিতেছ, ভাবিতেছ মনে—
"নাহিক সংসার জ্ঞান, উন্মত্ত যুবক।"
না চাহি সংসার জ্ঞান,
সেই বিজ্ঞতার ভাণ,
আমাদের সুশিক্ষার সেই বিষফল,
বদন মাধুরীপূর্ণ, অন্তর গরল।

৯

দাসত্ব চক্রের দীর্ঘ দৃঢ় নিষ্পেষণে
উচ্চ আশা আমাদের হৃদয় হইতে
হইয়াছে তিরোধান;
হীনতম স্বার্থ জ্ঞান,

জন্মিয়াছে সেই স্থলে,—স্বজাতি, স্বদেশ,
আমাদের উপকথা প্রলাপ বিশেষ।

১০

বর্ত্তমান সভ্যতার স্বার্থই ঈশ্বর,
স্বার্থবাদী আমরা সে দেবতার দাস,
প্রাচীনের সরলতা,
তরল সহৃদয়তা,
পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া।
কাঁদি, হাসি, যাহা করি,
দয়া, ধর্ম্ম, দান,—হরি।—
সকলই আমাদের স্বার্থে সপঙ্কিল,
যবনিকা অন্তরালে করিলে দর্শন
হরি! হরি! সকলই স্বার্থের সৃজন।

১১

এমন সংসার জ্ঞানে নাহি প্রয়োজন,
সমাজের চরণেতে সহস্র প্রণাম।
একাকী এ সিন্ধু তীরে,
নিরখি কালিন্দীনীরে
সলিলের মহাক্রীড়া,—নিরাশ জীবন
নীরবে নির্জ্জনে যেন হয় নির্ব্বাপণ।

১২

কি সুখ!—দুজনে বসি প্রদোষ সময়ে
গলায় গলায় এই সমুদ্র বেলায়।
সকলি তরঙ্গময়,
সর্ব্বত্রে প্রবাহ বহে,
সমুদ্র,—সমীর,—এই যুগল হৃদয়।
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি,
শ্বেত পুষ্পমালারাশি,
ঢালিছে সৈকতে সিন্ধু, সান্ধ্য সমীরণ
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ করিছে ব্যজন।

১৩

তরঙ্গে তরঙ্গে দুই উন্মত্ত হৃদয়,
আলিঙ্গিছে পরস্পরে তরঙ্গের মত;
কখনো তরঙ্গ মত,
হইতেছে পরিণত,
একত্বে একই ভাবে হতেছে বিলীন,
সে আনন্দ—মহানন্দ!—অনন্ত অসীম!

১৪

সর্ব্বরী যেমতি সুখে একে, একে, একে,
দেখাইত তারাবাজি আকাশের পটে,
তেমতি হৃদয় খুলি,
স্মৃতির তরঙ্গ তুলি,
দেখাতেম কক্ষ কক্ষ, সুখ দুঃখাধারে;
ফুরাইল, এ জীবন ফিরিবে না আর!

১৫

তুমি ত চলিলে ভাই, কালি সন্ধ্যা যবে
আসিবে ঢাকিতে সিন্ধু সৈকত সুন্দর,
একটি হৃদয় পড়ি
যাইতেছে গড়াগড়ি,
দেখিবে সৈকত ভূমে, শত ক্ষতে তার
বহিছে শোণিত ধার নির্ঝর আকার।

১৬

তুমি ত চলিলে,
যে তরঙ্গে নিক্ষেপিল সৈকতে দুজনে,
নাহি জানি সে তরঙ্গে মিলাবে কি আর?
আবার দুজনে বসি গলায় গলায়
গাঁথিব সরল প্রাণে বন্ধুতার হার?
হৃদয়ে রাখিব আশা,
রাখিব এ ভাল বাসা,
মিশিয়াছে উভয়ের তরল হৃদয়,
উভয়ে উভয় অংশ রহিবে নিশ্চয়?

১৭

মিলি কি না মিলি, থাক যে ভাবে যথায়
সুখ শান্তি হক তব ছায়ার মতন,
　　ওই ঊর্দ্ধে সুদর্শন,
　　পবিত্রতা নিদর্শন,
প্রসারুন পুণ্য ছায়া, হউক তোমার
স্নেহের পুতুলে পূর্ণ সুখের আগার।
　এ দিনে ক্ষীরোদ বর,
　তুলিয়া অসংখ্য কর,
করিছেন আশীর্ব্বাদ—করুন বিহার
ক্ষীরোদবাসিনী নিত্য গৃহেতে তোমার
　　কবির এ অভিলাষ,
　　কবি প্রণয়ের দাস,
তাঁর প্রেমে চিত্ত তব হউক অচল,
　　অহো।
সংসার মরুতে প্রেম নির্ঝরিণী জল।

শ্রীনঃ।

একজন বাঙ্গালি গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব।

এখন লোকের দেশহিতৈষিতা বড় প্রবল হইয়াছে। পুরাণ পুঁথি, খোদা পাথর, তাম্রশাসন পড়িয়া আমাদের পুরাণ গৌরবের কথা অনেকেই আন্দোলন করিয়া থাকেন। সেকালে আমাদের সোণার অট্টালিকা ছিল বলিয়া গুজব করিয়া বেড়ান কাপুরুষের কাজ, এ কথাটী কেহ বুঝেন না। আবার অনেকে গুমর করেন যে, সেকেলে বাঙ্গালিরা বড় লড়াই-মজবুত ছিল। রাজা নবকৃষ্ণ লড়াই করিতে করিতে উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এ কথা প্রমাণ করাইবার জন্য দিনকত অনেক চেষ্টা হয়। কিন্তু বাঙ্গালির লড়াইয়ে বিদ্যা কেমন ছিল, একবার দেখান উচিত। দেখাইতে হইলে উদাহরণ চাহি, উদাহরণ রাম দুর্ল্লভরাম।

রাজা দুর্ল্লভরাম রাজা জানকীরামের পুত্র। রাজা জানকীরাম সুবে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান। তখন আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার, দুর্ল্লভরাম উড়িষ্যায় নায়েব দেওয়ান হইলেন। যে আফগান সেনাপতির হস্তে উড়িষ্যার নবাবী ছিল, সে রাজবিদ্রোহী হওয়ায়, এবং অন্য লোক উপস্থিত না থাকায় উড়িষ্যার নবাবী দুর্ল্লভরামের হাতেই পড়িল। যুদ্ধ শেষ হইলে আলিবর্দ্দি রাজা জানকীরামের অনুরোধে তদীয় পুত্র দুর্ল্লভরামকে উড়িষ্যার কায়েমী নবাব করিয়া দিলেন। আতা উল্লা খাঁ তাঁহার অধীন প্রধান সেনাপতি হইলেন। এই সময়ে মহারাট্টাদিগের বড়ই উপদ্রব। কিন্তু উহারা বড় চতুর, উড়িয়া উহাদিগের পথ। উড়িষ্যায় কোন-

রূপ গোলযোগ না ঘটিলে স্বচ্ছন্দে হুগলি চন্দননগর কাটোয়া এমন কি মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত লুঠ করা যায়। দুর্লভরামকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য উহারা সন্ন্যাসী পাঠাইতে লাগিল। সন্ন্যাসীরা বলে মহারাষ্ট্রীরা আর আসিতেছে না, আমরা এই নাগপুর হইয়া আসিতেছি। আর নানা রকম পূজা অর্চ্চা যোগ ধ্যান ইত্যাদিতে উঁহাকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখে। এদিকে বর্ষাকাল কাটিয়া গেল। আতাউল্লা খাঁ নিত্য সংবাদ আনিতে লাগিল, যে মহারাষ্ট্রীরা সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছে। যত নিকট আসে, তিনি ততই দুর্লভরামকে উহাদিগকে তাড়াইবার উপায় করিতে বলেন। দুর্লভরাম সন্ন্যাসীদের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া বলেন, যে তাহারা আজিও নাগপুর ছাড়ে নাই।

শেষ একদিন সকালে কটকের এক পাশে মহাগোলযোগ উঠিল, চারিদিকে লুটপাট খুন হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, বর্গী আসিয়া পড়িয়াছে, আতাউল্লা সংবাদ পাইবাই শশব্যস্তে দুর্লভরামের দ্বারদেশে উপস্থিত। নবাবের হুকুম ব্যতীত সেনানী কাজ করে কেমন করিয়া? বেলা নয়টা, তখনও নবাবের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। আতাউল্লা যত বেলা হইতে লাগিল ক্রমেই ব্যাকুল হইতে লাগিল, প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর, মহারাষ্ট্রীরা যে দিকে পড়িয়াছিল, সেইদিকে ঘর সব জ্বালাইয়া দিতে লাগিল। তখন প্রজাবৃন্দের দারুণ আর্ত্তনাদে দুর্লভরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়াই শুনিলেন বর্গী কটকের উপর পড়িয়াছে। দুর্লভরামের আর কাপড় পরা নাই। সেই রাত্রিবাসের পাঁচহাতি ধুতিতে বিশাল উদর কথঞ্চিৎ আবৃত করতঃ দৌড়। একে সুর্য্যালোক, দারুণ মোটা, তাহাতে প্রাণ ভয়ে দৌড়। দৌড়িয়া যাবেন কোথায়? কটকের কেল্লায়। সেখান হইতে আধ ক্রোশ দূরে। বাড়ী হইতে গজেন্দ্র ল-ম্বোদর দুলাইতে দুলাইতে ছুটিতেছেন, পা উঠে উঠে উঠিতেছে না, বাহির হন এমন সময় আতাউল্লা খাঁ তাঁহাকে ধরিল। নবাব ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন ভাবিলেন বুঝি বর্গীতে ধরিল। অনেক ক্ষণের পর আতাউল্লার গভীর অথচ ধীর স্বরে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি শুনিলেন সেনাপতি বলিতেছেন আমায় শীঘ্র হুকুমনামা দিন, আমি সসৈন্যে উহাদিগকে সহরের বাহির করিয়া দিয়া আসি। দুর্লভরাম দাঁড়াইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বলিলেন সে সব কেল্লায় গিয়া দেওয়া যাইবে। আতাউল্লা বেশী জেদ করায় নবাব ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন সেনাপতি আর চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া বলিলেন, "আচ্ছা একটু দাঁড়ান না হয় পাল্কী আনাইয়া দিই।" নবাব বলিলেন, "আর পাল্কীতে কাজ নাই দেরি হবে"। বলিয়াই দ্রুতপদে কেল্লারদিকে ছুটিলেন। একে নবাব তাতে রাজা-জানকীরামের পুত্র, আতাউল্লা শীঘ্র পাল্কী আনাইয়া খানিক দূর গিয়া উঁহাকে

ধরিলেন, ধরিয়া পাল্কীতে পুরিয়া কেল্লায় পাঠাইয়া দিলেন।

কেল্লায় গিয়াই নবাবের রোখ। যত সৈন্য ছিল শীঘ্র সজ্জিত হইতে হুকুম দেওয়া হইল। আতাউল্লাকে উপর কটক হইতে বর্গী তাড়াইয়া দিবার হুকুম জারি করা হইল। কেল্লার কোথায় ভাঙ্গা আছে সারাইবার একটু একটু চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তখন কটকের অর্দ্ধেক বর্গীর দখল হইয়া গিয়াছে। আতাউল্লা খাঁ অনেক চেষ্টা করিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রম, যুদ্ধ, বক্তাবক্তির পর সসৈন্যে পিছু হঠিয়া দুর্গের দিকে পড়িলেন। রাত্রিতে দুর্গের চারিদিকে মহারাট্টা সেনা স্থাপিত হইল, নবাবের যে সাহস টুকু হইয়াছিল রাত্রে সে টুকু তিরোহিত হইল, ৮।১০ ক্রোশ দূরে আলিবর্দ্দি এক দল সেনা বর্গীর হাঙ্গামের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। আতাউল্লা বলিলেন, সেই সৈন্যদিগকে খবর দিয়া আনয়ন করা হউক; উহারা আসিলে দুর্গ রক্ষার উপায় হইবে। নবাব বলিলেন যদি এই দণ্ডে মহারাট্টা জোর করিয়া গড় দখল করে, তখন তোমার খবর দেওয়া কোথায় থাকিবে? আমার হুকুম—এই দণ্ডে মহারাট্টাদিগকে কেল্লা ছাড়িয়া দাও, এই মাত্র নিয়ম কর যে আমরা নিষ্কণ্টকে দেশে যাইতে পারি। ধূর্ত্ত বর্গী সেই কথায় দুর্গ দখল পাইল, পাইয়াই সর্ব্ব প্রথমে দুর্ল্লভরামকে বন্দী করিল। কিন্তু বীর আতাউল্লা দুর্গের যে ভাগে ছিলেন, সেই ভাগ দুই তিন মাস পর্য্যন্ত বর্গীদের সকল আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল। শুনিয়াছি দুর্ল্লভরামকে উদ্ধার করিবার জন্য আলিবর্দ্দি খাঁর তিনটী লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল।

এই এক বাঙ্গালির বীরত্ব। বাঙ্গালার অর্দ্ধ স্বাধীন অবস্থায় দুই জন হিন্দু নবাব হইয়াছিল—এক রামনারায়ণ আর এক দুর্ল্লভরাম। তাহার মধ্যে দুর্ল্লভরাম অপূর্ব্বকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেবার দুর্ল্লভরামের অনবধানতাবশতঃ বর্গীদিগের দূর করিতে আলিবর্দ্দিকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। উহারা কাটোয়া পর্য্যন্ত লুঠ করিয়াছিল।

আমাদের কত পুরুষ যে দুর্ল্লভরাম আছেন তাঁহার ঠিকানা নাই। আমাদের বীরত্ব পুরুষানুক্রমিক।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

নিশীথ-চিন্তা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। অতি ঘোর অন্ধকার নিশীথ বর্ণনা লইয়া গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে :—

"গভীর নিশীথ ;—বিশ্ব অন্ধকার ময় !
যতদূর চলে দৃষ্টি, তমসে সকল
গাঢ়রূপে আবরিত, দৃষ্টি নাহি হয়
হস্তে দূরের বস্তু ;—তমস কেবল।
দিবসে যে প্রতি অঙ্গে লোমকূপ যত
গণনা করেছি ; এবে বিশেষ যতনে
গণিবারে প্রাণ পণে—যত্ন করি কত,
তবু ও না পারি—ধাঁধা লাগিছে নয়নে।"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া আমরা বুঝিয়া লইলাম যে, যখন "তমসে সকল গাঢ়রূপে আবরিত" হয়, তখন লোমকূপ গণা যায় না ; প্রাণপণে বিশেষ যত্ন করিলেও গণা যায় না। আর, অন্ধকার অতি গাঢ় কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকে লোমকূপ তল্লাস করে, যদি দেখে লোমকূপ গণা গেল না, তাহা হইলেই তাহারা বুঝে যে অন্ধকার বড় গাঢ়, বড ঘোর। অতএব যদি কেহ কবি হইয়া ঘোর অন্ধকার বর্ণন করিতে চাহেন, তাহা হইলে যেন লোমকূপ গণনার কথা ভুলিবেন না। এই কাব্যের প্রথমাংশ যেরূপ অপাঠ্য পরে তত নহে। স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে। রাজকৃষ্ণ বাবুর অনেক কবিতা আমরা পাঠ করিয়াছি, বঙ্গদর্শনে তাঁহার প্রশংসাও করিয়াছি।

মানস-কুসুম। পদ্যগ্রন্থ। শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত মূল্য আট আনা মাত্র।

গ্রন্থারম্ভে কল্পনাকে উদ্দেশ করিয়া কবি বলিতেছেন :—

"যা'র বলে কত শত কবি চির তরে
অমরতা লভিয়াছে এ ভবমণ্ডলে ,—
ভারতীর বরপুত্র, যাহে, কালিদাস
কবি কুল পিকবলি বিখ্যাত ভুবনে।
যাহার সহায়ে মধু, মধুর গুঞ্জনে,
রচে ছিলা মধুচক্র
আজি আমি সেই কৃপাবলে নাহি ডরি,
কারে ত্রিভবনে।"

ইহা পাঠ করিয়া আর সমালোচনা করিতে আমাদের সাহস হয় না। কেশব বাবুর উপর কল্পনা দেবীর কৃপা হইয়াছে। যাহার বলে কালিদাস কবিকুল-পিক বলি বিখ্যাত, যাহার বলে অন্য কবিরা অমরতা লাভ করিয়াছেন, আজ সেই বলে কেশব বাবু মানস কুসুম লিখিয়াছেন, কেন তিনি আর ত্রিভুবনে কাহাকে ডর করিবেন।

উদ্ধৃত অংশের পর কবি লিখিতেছেন :—

"————সময়ে সময়ে মাতঃ !
ভ্রমি কাব্যোদ্যানে, তুলির কুসুম বাঞ্ছা
গাঁথিব মনের সাধে (কভু সাজাইয়া
অনুপ্রাসে আমি) সরস কুসুম হার ;"

তাহার পর কল্পনার নিকট কেশব বাবু প্রার্থনা করিতেছেন :—

"কিন্তু, যাচে তব কাছে অয়ি দয়াময়ি!
সদা যেন রয় দাস নয়নের কোণে।"

শেষ ভাষা অতি চমৎকার সন্দেহ নাই ভাবটিও ভাল। তবে কি না, আমরা প্রথমে ভাব বুঝিতে একটু গোলে পড়িয়াছিলাম, দাস কিরূপে নয়নের কোণে রয়, ইহা আমাদের ভাবিতে হইয়াছিল। এই সময় একজন বৃদ্ধ কবি আমাদের নিকটে ছিলেন, তিনি সত্যনারায়ণ পয়ারে লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের বড় ভক্তি। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, পূর্ব্বে রেওয়াজ ছিল যে, দাস স্বীকার করিলে স্থান চরণের প্রান্তে চাহিতে হইত, এক্ষণে সে রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে, দাসের পক্ষে এক্ষণে নয়নের কোণে স্থান হইয়াছে। আমরাও ভাবিলাম ইহা স্বাধীনতার সুফল. দাস হউক আর যাহাই হউক উনবিংশ শতাব্দীতে চরণপ্রান্তে স্থান চাওয়া সৎশিক্ষার বিরুদ্ধ . অতএব আহ্লাদে আমরা আবার পাঠ করিলাম। কিন্তু এবার বুঝিলাম যে,আমাদের বুঝিবার ভুল হইয়াছে। "সদা যেন রয় দাস নয়নের কোণে" ইহার অর্থ সদা যেন দাসের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টি থাকে, কেশব বাবু তাহার পরিবর্ত্তে বলিয়াছেন "রয় যেন নয়নের কোণে।" এই পরিবর্ত্ত,অবশ্য কল্পনাদেবীর বিশেষ অনুগ্রহের ফল। গ্রন্থখানি অবশ্যই ভাল হইয়াছে কিন্তু আমরা অধিক পড়িতে পারি নাই।

পরিচারিকা। মাসিক পত্র।— কলিকাতা জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫।

এক্ষণে অনেক বাঙ্গালির কন্যা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন বা শিখিতেছেন। উপযুক্ত শিক্ষক এবং অবসরের অভাবে, তাঁহাদিগের ইংরেজিতে শিক্ষা হয় না, যে দুই একজনের হয়, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ বাঙ্গালি কন্যা বাঙ্গালাতেই লিখিতে পড়িতে শিখে। কিন্তু পড়িতে বা লিখিতে শিখাই বিদ্যাশিক্ষা নহে। জ্ঞানোপার্জ্জন এবং মানসিক বৃত্তি সকলের উপযুক্ত পরিমার্জ্জনই শিক্ষা। তাহা সৎপুস্তক ভিন্ন সম্ভব নহে। বাঙ্গালা ভাষায় সৎ পুস্তকের সংখ্যা অল্প। এবং যাহা আছে, তাহাও সচরাচর, স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী নহে। ভাল বহি হইলেই যে স্ত্রীলোকের পাঠের যোগ্য হইবে এমত নহে। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা পুরুষে পড়িলে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা স্ত্রীলোকে পড়ায় ক্ষতি আছে। সংসারের পবিত্রতা স্ত্রীলোকের হস্তে, চিত্তশুদ্ধি ও পবিত্রতাই স্ত্রীলোকের জীবন। অতএব যে গ্রন্থ অতিশয় বিশুদ্ধ তাহাই স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী। আর সংসারে পুরুষের কার্য্য এবং স্ত্রীলোকের কার্য্য স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ও পুরুষের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। যাহা পুরুষের শোভা পায়, তাহা স্ত্রীলোকের শোভা পায় না

যাহা পুরুষে করিতে পারে, স্ত্রীলোকে তাহা করিতে পারে না। যে খানে পুরুষের ধর্ম্ম—ক্রোধ, সেখানে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম—দয়া, যেখানে পুরুষের ধর্ম্ম দণ্ড, সেখানের স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম—ক্ষমা। এজন্য স্ত্রীলোকের ও পুরুষের শিক্ষা কিয়দংশে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। জ্ঞান, উভয়েরই অর্জ্জনীয়; কিন্তু চিত্তবৃত্তি সকলের অনুশীলনে কিছু পার্থক্যের আবশ্যকতা আছে। এই সকল কারণে স্ত্রীলোকের পাঠ্য কতকগুলি স্বতন্ত্র পুস্তক হওয়া উচিত। বাঙ্গালা ভাষায় তাহা না থাকায় বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা আধুনিক নাটক নবেল পড়িয়া দিনপাত করেন। বাঙ্গালা ভাষায় একে ভাল নাটক নবেল অতি অল্প; তাহাতে যাহা আছে, তাহা আবার স্ত্রীলোকের পাঠযোগ্য বড় নহে।

এজন্য স্ত্রীলোকের পড়িবার যোগ্য সাহিত্য সৃজনের প্রয়োজন হইয়াছে। অনেক মহাত্মা এই ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। দুই খানি সাময়িক পত্র কেবল এই কাজে নিয়োজিত। পরিচারিকা নাম্নী আর এক খানি পত্রিকা সেই জন্য সম্প্রতি সৃষ্ট হইয়াছে। এখানি অতিমহৎ আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অনেক সুশিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী, এই পত্রের লেখক। পত্রের ভাষা অতি সরল ও সুমধুর, রুচি বিশুদ্ধ, এবং কথা গুলি সারগর্ভ; লিপিচাতুর্য্যেরও অভাব নাই। আমরা এই পত্রিকা পাঠে সুখী হইয়াছি। এবং যাহারা এই মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের অনেক ধন্যবাদ করি। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ গুলি প্রথম সংখ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মুখ বন্ধ।
টেলিফোন যন্ত্র।
স্বরস্বরণ।
শাক্যসিংহ এবং তাঁহার মাতা।
কৃত্রিম বেশভূষা।
কোথা সে শৈশব।
ক্ষতিমার স্বপ্ন।
The White Hills of Jabbalpore (ইংরেজি)।
পরিণয় ও পরিচয়।
স্বর্ণরেণু।
সম্বাদ।

হঠাৎ বাবু! প্রহসন। মূল্য /১০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার বোধ হয় বালক তাহাই লিখিতে এত সাধ।

প্রাইমারি গ্রামার। মথুরানাথ বর্ম্মা কর্তৃক সংগৃহীত। মূল্য চারি আনা।

যে সকল বালক কিছুমাত্র ইংরেজি বুঝিতে পারে না তাহাদের দুরূহ ইংরেজিতে গ্রামার শিখিতে হয়। সেই কষ্ট অপনয়ন করিবার নিমিত্ত সংগ্রহকার বাঙ্গালায় এই গ্রামার লিখিয়াছেন। ইহা দ্বারা বালকদিগের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। তবে গ্রামার খানি আর একটু সংক্ষিপ্ত হইলে আরও ভাল হইত। প্রথম শিক্ষার স্থলে এরূপ বিস্তারে জানিবার প্রয়োজন না হইতে পারে।

কবিতা। শ্রীযাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। গুপ্ত প্রেস কলিকাতা।

কবিতাগুলি কোকিল, হিমালয় শৃঙ্গ, সিংহ, বটবৃক্ষ, ক্ষুদের প্রভৃতি নানা বিষয়িণী। গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহা আমরা বড় বলিতে পারি না, কেন না, আমরা গ্রন্থের অধিকাংশ বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় ভাষা বাঙ্গালা—কিন্তু আমাদের জ্ঞানগম্যের অতীত, নমুনার স্বরূপ দুই এক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

কোকিল সম্বন্ধে ১ম পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত :—

"সহকার আলিঙ্গিত ব্রততী-
বিতানে,
প্রস্তীম সতত যথা অলি গুঞ্জ রবে।"

পদ্মিনী সম্বন্ধে ২৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত :—

বর্করাট করজাল, চকাসিত
শৈল শাল,
মলম্বা প্রতিম রুচি উচ্চতরুদলে।"

যদি কখন কেহ অনবধানতা প্রযুক্ত বা দুরদৃষ্ট বশতঃ এই গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, তবে তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পরম কারুণিক কবি প্রতি পত্রে কতকগুলি কথার অর্থ লিখিয়া দিয়াছেন। তাহাতেও যে বড় সুবিধা হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। গ্রন্থকার যদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতেন তাহা হইলে যে কি ক্ষতি হইত, বা কোন্ ভাবটি প্রকাশ হইত না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের বোধ হয় লেখক অতি বালক, সম্প্রতি অভিধান হাতে পাইয়াছেন, তাহাই কাগজ কালির এরূপে শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

সুরবালা সুরবালা। স্বর্ণলতা বিরচিত। হরিনাভি সাহিত্য-উৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থখানি মোটে ৩৬ পৃষ্ঠা, তাহার মধ্যে ২০ পৃষ্ঠা গ্রন্থকর্ত্রীর পরিচয়, আর ১৬ পৃষ্ঠা সুরবালা নাটক বা গল্প। গল্পটি এই :—

এক রাজবাটীর কানাচে যুদ্ধ উপস্থিত। রাজকুমার বিজয়সিংহ মুখ চুণ করিয়া অন্দরে আসিলেন। তাঁহার স্ত্রী সুরবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেন বিরস বদন?" রাজকুমার বলিলেন, "পিতৃ আজ্ঞায় অদ্য রণ করিতে যাইতে হইবে।" সুরবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রণ?" বিজয় সিংহ বলিলেন কানাচে। সুরবালা বলিলেন, তবে "দেখি রণ, বসি গবাক্ষেতে।" পরে রাজকুমার রণস্থলে গেলেন, কিন্তু শীঘ্র তথা হইতে পলাইলেন; তখন তাঁহার স্ত্রী সুরবালা আর কি করেন গবাক্ষ হইতে নামিয়া রণ করিতে গেলেন, গিয়া দুইজন শত্রুকে মারিলেন। তাহাতেই বীররসের চূড়ান্ত হইয়া গেল। হরিনাভি সাহিত্যসমাজ অমনি মাতিয়া উঠিলেন। সাহিত্যের সাহায্যার্থ এই গ্রন্থ পয়সা খরচ করিয়া ছাপাইলেন। হরিনাভির সমাজ বড় দয়ালু, আমাদের সাহিত্যের প্রতি তাঁহা

দের যথেষ্ট দয়া। কিন্তু এই ব্যাপারে সাহিত্য ব্যতীত তাঁহাদের যদি আর কেহ সাহায্যের পাত্র থাকে, তবে গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কণ না করিয়া অন্য রূপে সাহায্য করিলেই ভাল হইত।

কুসুমকলিকা। শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রী কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত।

এই পুস্তক খানি আমরা অনেক দিবস হইল পাইয়াছি, কিন্তু অনবধানতা প্রযুক্ত ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই। ইহাঁতে অনেক গুলি কবিতা আছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই একেবারে অপাঠ্য না হউক বিশেষ কবিত্ব নাই। কেবল "দময়ন্তীর কাল নিদ্রা" নামে কবিতাটিরই স্থানে স্থানে আমাদের কতক ভাল বোধ হইল; তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করাযাইতেছে।

"আমরি রমণী ঘুমে অচেতন।
ক্ষণে ক্ষণে তার নড়িছে চরণ!—
কভু করখানি, বিশ্ব-বিমোহন।
অলঙ্কাররাশি ঝমিছে তায়!
পত্নী-প্রেমোত্তাপে গলিত অন্তর
প্রহরী, অমনি ধীরে নিজ কর
নাড়িছে বামার দেহের উপর,
পাছে দংশে কীট রমণী কায়!

* * *

নেত্র, ওষ্ঠাধর, কপোল, বামার—
শিরীষ-কুসুম জিনি সুকুমার
সহিতে না পারি কেশের প্রহার,
বিবিধ প্রকারে ব্যঞ্জিছে ক্লেশ;—
নয়ন কপোল হতেছে কুঞ্চিত;
ওষ্ঠাধর চারু হইতেছে স্ফীত;
মমতার নাসা করিছে বাহিত
অতিরিক্ত শ্বাস, তাড়াতে কেশ;

অমনি তখনি পতি অনুকূল,
দয়িতার ক্লেশে হইয়া আকুল,
ধীরে ধীরে যত কেশ প্রতিকূল
ধরি, যথাস্থানে সবারে দিল।
ললাট উপরে, নাসিকার গায়,
অধরের নিম্নে, ওষ্ঠের সীমায়,
গলে, নেত্রকোলে, মুক্তামালাপ্রায়,
স্বেদ বিন্দু ছিল, মুছায়ে দিল।

কুমারী কার্পেণ্টারের সংক্ষিপ্ত জীবনী। বায যন্ত্র। মূল্য ৶০ আনা মাত্র। ১৮৭৭ সালের ১০ই জুলাই কুমারী কার্পেণ্টারের স্মৃতি-চিহ্ন সংস্থাপনার্থ বঙ্গমহিলাগণের যে সভা হইযাছিল, তাহাতে এই গ্রন্থলিখিত বিষযটি পঠিত হয। একবৎসর অতীত হইযাছে এক্ষণে ইহার উল্লেখ অনর্থক হইবে না, মনে করিযা এ স্থলে গ্রন্থের নাম উত্থাপন করা গেল। ২৪ পাতার পুস্তক পড়িতে আমাদের বিদ্যাবতীদের অধিক সময লাগিবে না, এবং জীবনী ক্রয করিতেও অধিক ব্যয় হইবে না অতএব সকলের ইহা পড়া উচিত।

ইণ্ডিয়ান পিল্‌গ্রিম। ইংরেজি পদ্য। যোগেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

ইংরেজি রচনা সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদের অনধিকার চর্চ্চা। তবে আমাদের মধ্যে যদি কেহ ইংরেজিতে গ্রন্থ লিখেন, তাহা হইলে আমরা দুইটা ভাল কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। উৎসাহ দিবার নিমিত্ত নহে, গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে আমরা কাহাকেও উৎসাহ দিই না। তাঁহার লেখা বাস্তবিক অনেক স্থানে আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

বঙ্গদর্শন।

ষষ্ঠ বৎসর।

রাজসিংহ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় ফিরিতে ফিরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অশ্বারোহী সেনা পার্ব্বত্য পথে চলিল। যে রন্ধ্র-পথের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল, বিবরে প্রবিশ্যমান মহোরগের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। অশ্ব সকলের অসংখ্য পদবিক্ষেপধ্বনি পর্ব্বতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—এমন কি, সেই স্থির শব্দহীন বিজন প্রদেশে আরোহীদিগের অস্ত্রের মৃদু শব্দ একত্রে সমুত্থিত হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনির উৎপত্তির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অশ্বগণের হ্রেষারব—আর সৈনিকের ডাক হাক! পর্ব্বততলে যে সকল লতা গুল্ম ছিল—শব্দাঘাতে তাহার পাতা সকল কাঁপিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বন্য পশু পক্ষী কীট যাহারা সে বিজনপ্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিত, তাহারা সকলে দ্রুত পলায়ন করিল। এইরূপে সমুদায় অশ্বারোহীর সারি সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ গুম করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। যেখানে শব্দ হইল, সে প্রদেশের অশ্বারোহীরা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পর্ব্বতশিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্ব্বতচ্যুত হইয়া সৈন্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে একজন অশ্বারোহী মরিয়াছে আর এক জন আহত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি তাহা কেহ বুঝিতে না বুঝিতে আবার সৈন্যমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল—এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে দশ পঁচিশ—তখনই একেবারে শত শত ছোট বড় শিলা বৃষ্টি হইতে লাগিল—বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী কেহ হত কেহ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সঙ্কীর্ণ পথ একেবারে রুদ্ধ

করিয়া ফেলিল। অশ্বসকল আরোহী ইয়া পলায়নের জন্য বেগবান্ হইল—স্তু অগ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের ঠেলা-ঠেলিতে অবরুদ্ধ—অশ্বের উপর অশ্ব, আরোহীর উপর আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল—সৈনিকেরা পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিয়া পথ করিতে লাগিল—শৃঙ্খলা একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল, সৈন্যমধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল।

"কাহার লোগ হুঁসিয়ার! বাঁয়ে রাস্তা!" মাণিকলাল হাঁকিল। যেখানে রাজকুমারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সম্মুখেই এই গোলযোগ উপস্থিত। বাহকেরা আপনাদিগের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত—অশ্ব সকল পাছু হঠিয়া তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পার্ব্বত্য পথের বামদিক্ দিয়া একটী অতি সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাতে একবারে একটি মাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌঁছিয়াছিল, তখনই এই হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত। সুশিক্ষিত মাণিকলাল প্রাণভয়ে ভীত বাহকদিগকে ঐ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি শিবিকা লইয়া সেই পথে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লইয়া মাণিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটস্থ সৈনিকেরা দেখিল যে প্রাণ বাঁচাইবার এই এক পথ, তখন আর একজন অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে শব্দে পার্ব্বত্য প্রদেশ কাঁপাইতে কাঁপাইতে আসিয়া সেই রন্ধ্রমুখে পড়িয়া স্থিতিলাভ করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অশ্বারোহী অশ্বসমেত চূর্ণ হইয়া গেল। রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আর কেহ সে পথে প্রবেশ করিতে পারিল না। একা মাণিকলাল শিবিকাসঙ্গে যথেপ্সিত পথে চলিল।

সেনাপতি হাসান আলি খাঁ মনসবদার, তখন সৈন্যের সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশপথমুখে স্বয়ং দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ণ দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্ত্বাবধারণ করিতেছিলেন। পরে সমুদায় সেনা প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্ব্বপশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকশ্রেণী মহাগোলযোগ করিয়া পাছু হঠিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল বুঝাইয়া বলিতে পারে না। তখন সৈনিকগণকে ভর্ৎসনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন—এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রগামী হইয়া ব্যাপার কি দেখিতে চলিলেন।

কিন্তু ততক্ষণ সেনা থাকে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে এই পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বস্থ পর্ব্বত অতি উচ্চ এবং দুরা-

বোহণীয়—তাহাব শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকাব কবিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তবে অনুসন্ধান কবিয়া পথ বাহিব কবিয়া, পঞ্চাশ জন তাহাব উপব উঠিয়া অদৃশ্য ভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক এক জন অপবের চাল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ কবিয়া আপন আপন সম্মুখে একটী একটী ঢিপি সাজাইয়া রাখিযাছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ খণ্ড শিলা নিয়স্থ অশ্বারোহীদিগের উপর বৃষ্টি কবিতে ছিল। এক একবাবে পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে মারিতে ছিল, তাহা তাহাবা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলে, দুরাবোহণীয় পর্ব্বতশিখবস্থ শত্রুগণেব প্রতি কোন রূপেই আঘাত সম্ভব নহে—অতএব তাহারা পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চেষ্টাই করিতেছিল না। যে সহস্রসংখ্যক অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়ন পূর্ব্বক রন্ধ্রমুখে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

পঞ্চাশজন রাজপুত দক্ষিণপার্শ্বের উচ্চ পর্ব্বত হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল—আর পঞ্চাশজন স্বয়ং রাজসিংহের সহিত বামদিকের অনুচ্চ পর্ব্বতশিরে লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এতক্ষণ কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কার্য করিবাব সময় উপস্থিত হইল। যেখানে শিলাবৃষ্টি নিবন্ধন ঘোরতব বিপত্তি সেখানে মিরজা মবাবকআলিনামা একজন যুবা মোগল—অর্থাৎ আহেলে বিলায়ত তুর্কস্থানী এবং দুইশতী মনসবদাব, অবস্থিতি কবিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খলেব সহিত পার্ব্বত্য পথ হইতে বহিষ্কৃত কবিবাব যত্ন কবিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন ক্ষুদ্রতর বন্ধ্রপথে রাজকুমাবীব শিবিকা চলিয়া গেল, একজন মাত্র অশ্বাবোহী তাহাব সঙ্গে গেল অমনি অর্গলের ন্যায় বৃহৎ শিলাখণ্ড সে পথ বন্ধ করিল—তখন তাঁহাব মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে এ ব্যাপার আব কিছুই নহে—কোন দুবাত্মা বাজকুমাবীকে অপহবণ করিবার মানসে এই উদ্যম করিয়াছে। তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকদিগকে বলিলেন—"প্রাণ যায় সেও স্বীকার! শত শিপাহী দোলাব পিছু পিছু যাও। ঘোড়া ছাড়িয়া পাঁও দলে, এই পাথব টপকাইয়া যাও—চল আমি যাইতেছি।" মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধক শিলাখণ্ডের উপব উঠিলেন। এবং তাহার উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া শত শিপাহী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

রাজসিংহ পর্ব্বতশিখব হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা

ক্ষুদ্রপথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে তাহারা রন্ধ্রপথমধ্যে নিবদ্ধ হইলে, পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাজপুত লইয়া বজ্রের ন্যায় উর্দ্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া, তাহাদের নিহত করিতে লাগিলেন। সহসা উপরহইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ঙ্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়া ঘোড়ার উপর, শিপাহী শিপাহীর উপর পড়িল—নীচে যাহারা ছিল তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচ সাত দশজন মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতেরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল না।

মবারকের সঙ্গে মোগল শিপাহীর বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই একজন মৃত সোওয়ারের অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই শৃঙ্খলাশূন্য মোগলসৈনার মধ্যে কোথায় লুকাইল মবারক তাহা দেখিতে পাইলেন না।

মাণিকলাল, যে মুখে মোগলেরা সেই পার্ব্বত্য পথে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথে নির্গত হইল। যাহারা তাহাকে দেখিল, তাহারা ভাবিল সে পলাইতেছে। মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরের গড়ের দিকে চলিল।

মবারক প্রস্তরখণ্ড পুনরুল্লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, আজ্ঞা দিলেন, "এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই, সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপরে উঠ। দস্যু অল্পসংখ্যক। তাহাদের সমূলে নিপাত করিব।" তখন পাঁচশত মোগল সেনা, "দীন! দীন!" শব্দ করিয়া অশ্বসহিত বামদিকের সেই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক। মোগলদিগের সঙ্গে দুইটা তোপ ছিল। একটা ঠেলিয়া তুলিয়া পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা লইয়া মোগলেরা টানিয়া, যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা পার্ব্বত্য রন্ধ্র বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তখন দীন দীন শব্দে পঞ্চশত অশ্বারোহী কালান্তক যমের ন্যায় পর্ব্বতে আরোহণ করিল। পর্ব্বত অত্যুচ্চ ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—শিখরদেশে উঠিতে তাহাদের অনেক কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ ত পর্ব্বতোপরে নাই। যে রন্ধ্রপথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এখন মবারক বুঝিলেন যে, সমুদায় দস্যু —মবারকের বিবেচনায় তাহারা রাজপুত দস্যুভিন্ন আর কিছুই নহে—সমুদায় দস্যু সেই রন্ধ্রপথে আছে। তাহার দ্বিতীয় মুখ রোধ করিয়া তাহাদিগের

বিনাশসাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন। হাসান আলি আর মুখে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন। এই ভাবিয়া, তিনি সেই রন্ধ্রের ধারে ধারে সৈন্য লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল, তখন মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন—চাল্লিশ জনের অনধিক রাজপুত, শিবিকাসঙ্গে রুধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে চলিতেছে। মবারক বুঝিলেন যে অবশ্য ইহারা নির্গমপথ জানে; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলে, রন্ধ্রদ্বারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা পর্ব্বত হইতে নামিয়াছিল সেইরূপ অন্য পথ দেখিতে পাইব। রাজপুতেরা যে আগে উপরে ছিল পরে নামিয়াছে তাহার সহস্র চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। মবারক সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে নির্গমের পথ। মবারক অশ্ব সকল তীরবেগে চালাইয়া পর্ব্বততলে নামিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ করিলেন। রাজপুতেরা, রন্ধ্রের বাঁক ফিরিয়া যাইতেছিল —সুতরাং তাহারা আগে রন্ধ্রমুখে পৌঁছিতে পারিল না। মোগলেরা পথরোধ করিয়া রন্ধ্রমুখে কামান বসাইল; এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস করিবার জন্য তাহার বজ্রনাদ একবার শুনাইল —দীন! দীন! শব্দের সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। শুনিয়া উত্তর স্বরূপ রন্ধ্রের অপর মুখে হাসান আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন; আবার পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল—তাহাদিগের কামান ছিল না।

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোনমতেই রক্ষা নাই। তাঁহার সৈন্যের বিশগুণ সেনা, পথের দুই মুখ বন্ধ করিয়াছে—পথান্তর নাই—কেবল যমমন্দিরের পথ খোলা। রাজসিংহ স্থির করিলেন সেই পথেই যাইবেন। তখন সৈনিকগণকে একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সবলান্তঃকরণে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এবিপদ ঘটিয়াছে—পর্ব্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি। এখন এ গলির দুই মুখ বন্ধ—দুই মুখেই কামান শুনিতেছ? দুই মুখে আমাদের বিশ গুণ মোগল দাঁড়াইয়া আছে—সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? রাজপুত হইয়া কে মরিতে কাতর? সকলেই মরিব—একজনও বাঁচিব না—কিন্তু মারিয়া মরিব। যে মরিবার আগে দুইজন মোগল না মারিয়া মরিবে—সে রাজপুত নহে—বিজাতক। রাজপুতেরা শুন। এ পথে ঘোড়া ছুটে না—সবাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও। এসো আমরা তরবাল হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই

হইবে—তার পর দেখা যাইবে কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি।”

তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একত্রে অসি নিষ্কোষিত করিয়া “রাণা জি কি জয়।” বলিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকান্তি দেখিয়া রাজসিংহ বুঝিলেন যে, প্রাণ রক্ষা না হউক—একটী রাজপুতও হটিবে না। সন্তুষ্ট চিত্তে রাণা আজ্ঞা দিলেন, “দুই দুই করিয়া সারি দাও।” অশ্বপৃষ্ঠে সবে একে একে যাইতেছিল—পদব্রজে দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত চলিল—রাণা সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। আজ আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্ত।

এমত সময়ে সহসা পর্ব্বতরন্ধ্র কম্পিত করিয়া, পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, রাজপুত সেনা শব্দ করিল “মাতা জি কি জয়! কালীমায়ি কি জয়!”

অত্যন্ত হর্ষসূচক ঘোর রব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন ব্যাপার কি? দেখিলেন, দুইপার্শ্বে রাজপুতসেনা সারি দিয়াছে—মধ্যে বিশাললোচনা, সহাস্যবদনা, কোন্ দেবী আসিতেছে। হয় কোন দেবী মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীর মূর্ত্তিতে গঠিয়াছেন। রাজপুতেরা মনে করিল, চিতোরাধিষ্ঠাত্রী রাজপুতকুলরক্ষিণী ভগবতী এ শঙ্কটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিতেছিল।

রাজসিংহ দেখিলেন—এ ত মানবী, কিন্তু সামান্যা মানবী নহে। ডাকিয়া বলিলেন,

“দেখ, দোলা কোথায়?”

একজন পিছু হইতে বলিল, “দোলা এই দিকে আছে?”

রাণা বলিলেন, “দেখ, দোলা খালি কি না?”

সৈনিক, বলিল “দোলা খালি। কুমারী জী মহারাজের সাম্‌নে।”

চঞ্চলকুমারী তখন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন,

“রাজকুমারি—আপনি এখানে কেন?”

চঞ্চল বলিলেন, “মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। প্রণাম করিয়াছি—এখন একটি ভিক্ষা চাহি। আমি মুখরা—স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা তাহা আমাতে নাই, ক্ষমা করিবেন। ভিক্ষা যাহা চাহি—তাহাতে নৈরাশ করিবেন না।”

চঞ্চলকুমারী হাস্য ত্যাগ করিয়া, যোড় হাত করিয়া কাতর স্বরে এই কথা বলিলেন। রাজসিংহ বলিলেন,

“তোমারই জন্য এতদূর আসিয়াছি—তোমাকে অদেয় কিছুই নাই—কি চাও, রূপনগরের কন্যে?”

চঞ্চলকুমারী আবার যোড় হাত করিয়া বলিল, “আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলিয়া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু আপনার মন আপনি বুঝিতে পারি নাই। আমি এখন মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্যের

কথা শুনিয়া, বড় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুমতি করুন—আমি দিল্লী যাইব।"

রাজসিংহ বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও—আমার আপত্তি নাই—স্ত্রীলোক চিরকাল অস্থিরচিত্ত। কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পাইবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই মোগল মনে করিবে যে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হউক—তার পর তুমি যাইও। যওয়ান্ সব—আগে চল।"

তখন চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসিয়া, মর্ম্মভেদী মৃদুল কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের কণিষ্ঠাঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় বামহস্তের অঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা ফিরাইয়া রাজসিংহকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, "মহারাজ! এই আঙ্গটিতে বিষ আছে। দিল্লীতে না যাইতে দিলে, আমি বিষ খাইব।"

রাজসিংহ তখন হাসিলেন—বলিলেন "বুঝিয়াছি রাজকুমারি—রমণীকুলে তুমি ধন্যা। কিন্তু তুমি যাহা ভাবিতেছ তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না, আজ রাজপুতকে মরিতেই হইবে—নহিলে রাজপুত নামে বড় কলঙ্ক হইবে।—আমরা যতক্ষণ না মরি—তত ক্ষণ তুমি বন্দী। আমরা মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইও।"

চঞ্চলকুমারী হাসিল—অতিশয় প্রণয়প্রফুল্ল ভক্তিপ্রমোদিত, সাক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্য্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "বীরচূড়ামণি! আজি হইতে আমি তোমার মহিষী হইলাম! যদি তোমার মহিষী না হই—তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে না।" প্রকাশ্যে বলিল, "মহারাজ! দিল্লীশ্বর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগলসৈন্যসম্মুখে চলিলাম—কাহার সাধ্য রাখে দেখি?"

এই বলিয়া চঞ্চলকুমারী—জীবন্ত দেবীমূর্ত্তি, রাজসিংহকে পাশ করিয়া রন্ধ্রমুখে চলিল। তাঁহাকে স্পর্শ করে কাহার সাধ্য? এজন্য কেহ তাঁহার গতি রোধ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে, সেই স্বর্ণমুক্তাময়ী প্রতিমা রন্ধ্রমুখে চলিয়া গেল।

একাকিনী, চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্বলিত বহ্নিতুল্য রুষ্ট, সশস্ত্র পঞ্চশত মোগল অশ্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে সেই পথরোধকারী কামান—মনুষ্যনির্ম্মিত বজ্র, অগ্নি উদ্গীর্ণ করিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে—গোলন্দাজের হাতে অগ্নি জ্বলিতেছে—সেইখানে, সেই কামানের সম্মুখে, রত্নমণ্ডিতা লোকাতীত সুন্দরী দাঁড়াইল। দেখিয়া বিস্মিত মোগলসেনা মনে করিল—পর্ব্বতনিবাসিনী পরি আসিয়াছে।

মনুষ্যভাষায় কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী

সে ভ্রম ভাঙ্গিল।—বলিল "এ সেনার সেনাপতি কে?"

মবারক স্বয়ং রক্ত মুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তিনি বলিলেন, "ইহারা এখন অধমের অধীন। আপনি কে?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন,

"আমি সামান্যা স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে—যদি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি।"

মবারক বলিলেন, "তবে বস্ত্রমধ্যে আগু হউন।" চঞ্চলকুমারী বস্ত্রমধ্যে অগ্রসর হইলেন—মবারক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

যেখানে কথা অন্যে শুনিতে পায় না এমত স্থানে আসিয়া চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন,

"আমি রূপনগরের রাজকন্যা। বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন—এ কথা বিশ্বাস করেন কি?"

মবারক। আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়।

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক—ধর্ম্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল—তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন।—তাঁহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম—আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশজন মাত্র শিপাহী লইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের বলবীর্য্য ত দেখিলেন?

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি—পঞ্চাশ জন শিপাহী এক সহস্র মোগল মারিল?"

চঞ্চল। বিচিত্র নহে—হলদীঘাটে ঐ রকম কি একটা হইয়াছিল শুনিয়াছি। কিন্তু সে যাই হউক—রাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ত। তাঁহাকে পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি। আমাকে দিল্লী লইয়া চলুন—যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।

মবারক বলিল, "বুঝিয়াছি নিজের সুখ বলি দিয়া, আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদেরও কি সেই ইচ্ছা?"

চ। সেও কি সম্ভবে? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে একমত হইয়া আপনি তাহাদের প্রাণরক্ষা করুন।

ম। তাহা পারি। কিন্তু দস্যুর দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। আমি তাঁহাদের বন্দী করিব।

চ। সব পারিবেন—সেইটী পারিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবেন কিন্তু বাঁধিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই মরিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন—মরিবেন।

মবা। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি দিল্লী যাইবেন ইহা স্থির?

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাতত যাওয়াই স্থির। দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছিব কি না সন্দেহ।

মবা। সে কি?

চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু শুধু মরিতে জানি না?

মবা। আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শত্রু আছে?

চ। আমি নিজে।—

ম। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে—আপনার?

চ। বিষ।

ম। কোথায় আছে?

বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপানে চাহিলেন। বুঝি অন্য কেহ হইলে তাহার মনে মনে হইত "নয়ন ছাড়া আর কোথায় বিষ আছে কি?" কিন্তু মবারক সে ইতর প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের ন্যায় যথার্থ বীরপুরুষ। তিনি বলিলেন,

"মা, আত্মঘাতিনী কেন হইবেন? আপনি যদি যাইতে না চাহেন তবে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে লইয়া যাই? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না—আমরা কোন ছার? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—কিন্তু এ রাজপুতেরা বাদশাহের সেনা আক্রমণ করিয়াছে—আমি মোগলসেনাপতি হইয়া কি প্রকারে উঁহাদের ক্ষমা করি?"

চ। ক্ষমা করিয়া কাজ নাই—যুদ্ধ করুন।

এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন—তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "যুদ্ধ করুন—রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে।"

মোগলসেনাপতির সঙ্গে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে শুনিবার জন্য রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্শ্বে আসিয়া দাড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! আপনার কোমরে যে তরবারি ঝুলিতেছে, রাজপ্রসাদ স্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা হউক।"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী।" এই বলিয়া রাজসিংহ কটিহইতে অসি নির্মুক্ত করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন। চঞ্চল অসি ঘুরাইয়া, মবারকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল,

"তবে যুদ্ধ করুন। রাজপুতেরা যুদ্ধ করিতে জানে। আর রাজপুতানার স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করিতে জানে। খাঁ সাহেব! আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। স্ত্রীহত্যা হইলে, আপনার বাদসাহের গৌরব বাড়িতে পারে।"

শুনিয়া, মোগল ঈষৎ হাসিল। চঞ্চলকুমারীর কথার কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া

বলিল, "উদয়পুরের বীরেরা কত দিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?"

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "যত দিন হইতে মোগলবাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, ততদিন হইতে রাজপুতকন্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে।" তখন রাজসিংহ সিংহের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গের সহিত, স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাজপুতেরা বাগ্‌যুদ্ধে অপটু। বৃথা কাল হরণে প্রয়োজন নাই পীপিলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল।"

এতক্ষণ বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় উভয় সৈন্য স্তম্ভিত হইয়া ছিল—প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা পাইয়া "হর। হর। বম। বম্!" শব্দে রাজপুতেরা জলপ্রবাহবৎ মোগলসেনার উপরে পড়িল। এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া, মোগলেরা "আল্লা—হো—আকবর।" শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সহসা উভয় সেনাই নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল! সেই রণক্ষেত্রে উভয়সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়া—স্থিরমূর্তি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া—সরিতেছে না।

চঞ্চলকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,

"যতক্ষণ না একপক্ষ নিবৃত্ত হয়—ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অগ্রে আমাকে না মারিয়া কেহ অস্ত্র চালনা করিতে পারিবে না।"

রাজসিংহ রুষ্ট হইয়া বলিলেন,

"তোমার এ অকর্ত্তব্য। স্বহস্তে তুমি রাজপুতকুলে এই কলঙ্ক লেপিতেছ কেন? লোকে বলিবে,আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিলেন।"

চ। মহারাজ! আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল আগে মরিতে চাহিতেছি। যে অনর্থের মূল—তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে।

চঞ্চল নড়িল না—মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল—নামাইল। মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনামধ্যে মবারক ডাকিয়া বলিলেন, "মোগলবাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না—অতএব বলি আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংসা ভরসা করি, ক্ষেত্রান্তরে হইবে। আমি রাণাকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছি, যে সেবার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না আইসেন।

চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্য চিন্তিত হইলেন। মবারক তখন তাঁহার নিকটে—অশ্বে আরোহণ করিতেছে মাত্র। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে বলিলেন,"সাহেব! আমাকে ফেলিয়া যাইতেছ কেন? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আপনাদের

দিল্লীশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাকে যদি না লইয়া যান, তবে বাদশাহ কি বলিবেন ?"

মবারক বলিল, "বাদশাহের বড় আর একজন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।"

চঞ্চল। সে ত পরলোকে, কিন্তু ইহলোকে ?

মবারক। মবারক আনি, ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে'না। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন—আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া মবারক অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যকে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেন, এমত সময়ে পশ্চাতে একবারে সহস্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ—কোথা হইতে সহস্রাধিক অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। দৃষ্টিমাত্র মোগলেরা পলায়ন করিল। যে যে দিকে পারিল সেই সেই দিকে পলাইল —মবারক রাখিতে পারিল না। তখন শত্রুগন হর হর বম বম্ শব্দ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

তর্কসংগ্রহ।

কার্য্য কারণ সম্বন্ধ।

এই জগতের কার্য্যকলাপের মধ্যে যত প্রকার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় তাহাদিগের মধ্যে এই দুইটি সম্বন্ধই প্রধান, প্রথম সমকালবৃত্তিত্ব দ্বিতীয় অনন্তরবৃত্তিত্ব। যে সকল কার্য্য পরস্পর একরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করে যে একটী আরম্ভ করিলে তাহার সহিতই আর একটী সিদ্ধ হইতে থাকে তাহাদিগের নাম সমকালবৃত্তি কার্য্য, উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের নাম সমকালবৃত্তিত্ব সম্বন্ধ। এই সমকালবৃত্তি কার্য্য সকল, সকল অবস্থায়ই এক রূপ ধারণ করে। ইহার প্রধান উদাহরণস্থল অঙ্ক শাস্ত্র। দেখ দুই আর দুই একত্র করিলেই চারি হয়, এই চারি যতকাল দুটী দুই একত্র থাকে ততকালই থাকে তাহার পর আর থাকে না, এবং দিন, বৎসর, ফুট, ইঞ্চি ইত্যাদি যে কোন বস্তুরই হৌক দুটি দুই একত্র করিলে চারি হইবে।

রেখাগণিত ক্ষেত্রব্যবহার প্রভৃতি শাস্ত্রে পেতিপদে এই সমকালবৃত্তিত্ব সম্বন্ধ এবং তজ্জন্য একরূপতা সর্ব্বপ্রকারে লক্ষিত হয়। উহাদের নির্ণয়ের নিমিত্ত সময় বা ভূয়োদর্শনের কিছুমাত্র আবশ্যকতা

হয় নাই। ইহারা প্রথম হইতেই স্বতঃসিদ্ধ এবং সত্য। যথা—যাহার পরিমাণ আছে তাহার মূর্ত্তি অর্থাৎ আকার আছে* এবং যাহাদের আকার আছে তাহারা ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ও বৃত্ত প্রভৃতি নানারূপ হয়। যদি একটী বর্ত্তুল পদার্থ একটি নলের সহিত সমোচ্চ ও সমব্যাসবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ দুইটী বস্তু যে ধাতু বা পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হৌক না কেন প্রথমটি দ্বিতীয়টীর ঠিক দুই তৃতীয়াংশ হইবে।

এইরূপ গণিত এবং ক্ষেত্রতত্ত্বাদি শাস্ত্রের নিয়ম সকল, সকল সময়েই এক রূপ এবং একরূপ কার্য্য করে, আমরা কখন কোন অংশে এই নিয়মের অন্যথা দেখিতে পাই না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সকল নিয়ম দ্বারা অপর কোন বিষয়ের সত্যতা স্থির করিতে পারা যায় না, কেবল অঙ্ক ও ক্ষেত্রাদি বিষয়ের সত্যতাই স্থির হয়। অপরসাধারণ ঘটনার সত্যতা নিরূপণার্থ আমাদিগকে অনন্তর বা ক্রমবৃত্তিত্ব সম্বন্ধের আশ্রয় লইতে হয়।

জগতের কার্য্য মাত্রেই অনন্তর বা ক্রম বৃত্তি অর্থাৎ একটির পর আর একটি তার পর আর একটি উৎপন্ন হয়। এবং প্রত্যেকই স্বপূর্ব্ববৃত্তি বস্তুর সহিত একটি অপরিবর্ত্তী সম্বন্ধ রক্ষা করে, বস্তু বিশেষ পূর্ব্বে হইলে বস্তু বিশেষের উৎপত্তি হয়ই হয় কদাচ অন্যথা হয় না। যেমন কৃষ্ণবর্ণ নবীন মেঘ আকাশে উদয় হইলেই পৃথিবীতে বর্ষণ অবশ্যই হইবে, কুম্ভকার দণ্ড দিয়া চক্র ঘুরাইলে ঘট অবশ্যই হইবে। ইত্যাদি।

এই অপরিবর্ত্তী নিয়ম বা সম্বন্ধকে "কার্য্য কারণ সম্বন্ধ" বলা যায়। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে "কার্য্য কারণ ভাব" বা "হেতু হেতুমদভাব" ও বলিয়া থাকেন। বোধ হয় পাঠকগণ কার্য্যের সহিত কারণের যে কি সম্বন্ধ তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারিলেন। যাহা কারণ তাহা অবশ্যই কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকিবে এবং কারণ অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকিলে কার্য্য অবশ্যই সংঘটিতও হইবে ইহার অন্যথা হইবে না। ইহার অপলাপ করিবার কাহারও শক্তি নাই।

বৈশেষিক দর্শনকার কনাদ মুনি বলিয়াছেন,

"কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ।"

১ অ ২ আ ১ সূ।

যদি কারণ না থাকে তাহা হইলে কখনই কার্য্য হইতে পারে না। ঘটের প্রতি যে পূর্ব্বে দণ্ড, চক্র, জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের

* নৈয়ায়িকেরা আকাশাদির পরিমাণ স্বীকার করিয়াছেন অথচ মূর্ত্তি স্বীকার করেন নাই সুতরাং তাঁহাদেরই মতে পরিমাণ থাকিলে আকার থাকে না কিন্তু যাহাদের অপকৃষ্ট পরিমাণ (limited extension) তাহাদেরই আকার আছে (মূর্ত্তত্বং অপকৃষ্ট পরিমাণ বত্ত্বম্)

মধ্যে একটীর ও অভাব হইলে কখন ঘট হয় না. অতএব যাহা কার্য্য অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয় তাহার যে কারণ আছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এবং কারণ স্বীকার করিলেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধেরও স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুবিশেষের বস্তুবিশেষের সহিত ক্লিপ্তরূপে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ না মানিলে ঘটের কারণ থাকিলেই বস্ত্র হইতে পারিত এবং বস্ত্রের কারণের অবস্থিতিতে ঘট হইতে পারিত, কিন্তু এরূপ ঘটনা যখন হয় না, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তু বিশেষের সহিত বস্তুবিশেষের এই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ একবারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধই অনুমানখণ্ডের মূল সূত্র, যদি আমরা জানিতে পারি অমুক বস্তুর সহিত অমুক বস্তুর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ অমুক বস্তু পূর্ব্বে থাকিলে অমুক বস্তুই সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা কোন সময় উহাদিগের মধ্যে একটীকে দেখিলেই অপরটির অনুমান করিতে পারি। যদি আমাদের জ্ঞান থাকে কোন বস্তুতে অগ্নিসংযোগ হইলে ধূম হয়। তাহা হইলে আমরা ধূম দেখিয়াই বুঝিতে পারি যে অমুক স্থানে অগ্নি সংযোগ হইয়াছে। যদি আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারি যে মেঘ হইলে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হইয়া নদীর জল বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে কোন সময় আমরা ইহাদিগের মধ্যে একটীকে দেখিয়া অপরের অনুমান করিতে পারি। আমরা অনেক সময় কেবল মেঘ দেখিয়া অনুমান করিতে পারি আজ খুব বৃষ্টি হইবে, গ্রামের সকল পুষ্করিণী উচ্ছলিত হইবে এবং সেই সঙ্গে নিজের পুষ্করিণীর মৎস্য সকল যাহাতে না পলাইতে পারে সেজন্য যত্ন করিয়া থাকি। বর্ষাকালে প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উত্থান করিয়া যখন গৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থিত পরিখাদি পরিপূর্ণ দেখিতে পাই তখনই অনুমান করিতে পারি যে গত রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এইরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জানা থাকিলে আমাদের এক প্রকার ভবিষ্যৎ জ্ঞানলাভ হয়। অনেক সময় আমরা কেবল কার্য্যকারণ জ্ঞানের প্রভাবে ভাবিবিপদের অনুমান করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পাইতে পারি।

বৈদ্যশাস্ত্রে কথিত আছে যে যিনি রোগের নিদান (প্রকৃত কারণ) বুঝিয়া চিকিৎসা করেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক, এবং তাঁহার প্রযুক্ত ঔষধ ফলোপধায়ক হয়; আমরাও বলি সংসারের মধ্যে যিনি কার্য্যকারণ সম্বন্ধটীকে প্রকৃতরূপে অবগত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সংসারী। এই সংসাররূপ মহাসাগরের তিনিই প্রকৃত কর্ণধার, তাঁহার চেষ্টা বা যত্ন প্রায়ই বিফল হয় না।

যতদিন অবধি পৃথিবীতে এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধের জ্ঞান হয় নাই ততদিন অবধি পৃথিবী মূর্খতারূপ নিবিড় অন্ধ-

কারে আচ্ছন্ন ছিল, তাহার পর যেই একটু একটু কার্য্যকারণ জ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল, অমনি পৃথিবীতে আদিম পুস্তক ঋগ্বেদের উদয় হইল। যখন প্রাচীন ঋষিরা মনে মনে বিবেচনা করিলেন চেতন ভিন্ন কাহারই কার্য্যকারিতা শক্তি নাই, অগ্নি যখন অনেক আবশ্যক কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তখন তাঁহার অবশ্য চেতন আছে, এই সময়েই ঋগ্বেদের প্রারম্ভ হইল। অমনি তাঁহারা তারস্বরে সেই অশেষ হিতকর কার্য্যের সম্পাদক অগ্নিকে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্" এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন

আবার যখন তাঁহারা দেখিলেন, বৃক্ষাদি জড়পদার্থ তাহাদের নিজের ত চলিবার শক্তি নাই, অতএব অত্যুচ্চ মহাবৃক্ষ সকল যাহাদ্বারা পরিচালিত হইতেছে সেই বায়ু কেবল সচেতন নহে তাঁহার শক্তিও অসাধারণ। অমনি তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া "বায় বায়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা বায়ুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে কার্য্যকারণ জ্ঞানের যখন উন্নতি হইল, তখন বৈদিক সময়ের নানা দেব দেবী অন্তর্হিত হইয়া তাহাদিগের সকলের স্থানে একমাত্র ঈশ্বর বিরাজ করিতে লাগিলেন। এই সময়ের পুস্তকের নাম দর্শন। পূর্ব্বে যে কার্য্যকারণ জ্ঞানে অগ্নি সচেতন বলিয়া স্তুত হইয়াছিলেন দার্শনিক সময়ের কার্য্যকারণ জ্ঞান তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নৈয়ায়িকদিগের ঈশ্বর নিরূপক বাক্যটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তাঁহারা বলেন ঘট পট প্রভৃতি যতগুলি কার্য্য আমরা দেখিতে পাই তাহাদের সকলেরই কারণ আছে। এই জগৎও কার্য্য, ইহারও একটী কারণ অবশ্য থাকিবে, কারণ ভিন্ন কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না।

তাহার পর ক্রমে কার্য্যকারণ জ্ঞান আরও উন্নতিপ্রাপ্ত হইলে কপিলাচার্য্য বিবেচনা করিলেন,

জগৎসৃষ্টির প্রতি পৃথিবীস্থ বস্তু সমূহের শক্তি বিশেষকেই (প্রকৃতি) কারণ বলিলে চলে, এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র একটা কারণ স্বীকার করিবার আবশ্যক কি এই চিন্তা করিয়া তিনি যাই "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই কথাটী বলিলেন অমনি আস্তিক দর্শনের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাহার পরই হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমুদয় ভারত ভূমি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত। এতদিন অবধি যে পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি চলিয়া আসিতেছিল তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল। কেবল ভারতবর্ষে কেন ইউরোপে যখন কোমৎ প্রভৃতি নব্য দার্শনিকেরা বলিলেন "কার্য্যের মূল বা উৎপাদক কারণ জানিবার আমাদের তত আবশ্যক নাই আমাদের এই মাত্র জানিলেই হয় যে অমুক বস্তু পূর্ব্বে থাকিলে অমুক কার্য্য সংঘটিত হয়।" অমনি যেন

ঈশ্বরের শিষ্যবর্গের মধ্যে নাস্তিকতার সূত্রপাত হইল। এতদিন খৃষ্টানেরা যে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত পরমেশ্বর উপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন সেই দিন অবধি যেন সেই ভক্তি বিচলিত হইতে লাগিল। যেন সেই পথ অবলম্বন করিয়া 'মিল' বলিয়া উঠিলেন জগতের কারণ এক হইতে পারে না।

কেবল দর্শনশাস্ত্র কেন জগতে যে কিছু শাস্ত্র বা তত্ত্ব আজপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে আর পরেও যদি কিছু হয় এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধই তাহাদের মূলভিত্তিস্বরূপ থাকিবে। নিউটন্ একদিন বাগানে বসিয়া দেখিলেন বৃক্ষ হইতে একটী সেউফল মৃত্তিকায় নিপতিত হইল, তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন যে যতগুলি কার্য্য হয় তাহাদের সকলেরই কারণ আছে, এক্ষণে সেউফলকে ভূমিতে নিপতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে তৎক্ষণাৎ উদয় হইল যে এই সেউফল ঊর্দ্ধে না উঠিয়া নীচে পড়িল তাহার কারণ কি? সেই কারণের অনুসন্ধান করিতে করিতে একবারে জগতের হিতকর এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার হইল। গালবিনি এক দিবস তাঁহার স্ত্রীর সহিত একত্র বসিয়া নানা কথা কহিতে একটা মৃত মণ্ডূকের চরণের একপার্শ্বে একটা তাম্রখণ্ড এবং অপর পার্শ্বে একটা জিঙ্ক নামক ধাতুখণ্ড লাগাইবামাত্র ব্যাঙের পাখানা ধড়ফড় করিয়া উঠিল। অমনি তিনি সেই কার্য্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই অনুসন্ধানের ফল বৈদ্যুত তত্ত্বের আবিষ্কার। যাহা পরে বেনজামিনের আবিষ্কৃত কারণের সহিত মিলিত হইয়া এক্ষণে বৈদ্যুত বার্ত্তাবহরূপে জগতের মধ্যে স্বর্গীয় দূতের কার্য্য করিতেছে। এইরূপ তত্ত্বাবিষ্কারীদিগের জীবনী পাঠে ইহাই প্রতীত হয় যে জগতে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মূল কারণানুসন্ধান। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন ভাল, জগতে যদি কার্য্য থাকে তবে ত কারণ থাকিবে, তাহার পরে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বিচার। কিন্তু জগতে কার্য্য কিছুই নাই। বেদে বলিয়াছেন "স দেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।" জগতে যাহা কিছু আছে তাহা বরাবরই আছে তাহাদের উৎপত্তিও নাই নাশও নাই। যদি বল কোন সময় কোন বস্তু দেখা যায় এবং কোন সময় কোন বস্তু দেখা যায় না কেন? ইহার উত্তর আবির্ভাব আর তিরোভাব অর্থাৎ কোন বস্তু কোন সময় লীন হইয়া থাকে কোন সময় আবার প্রকাশ পায়। ইহার উত্তরে আমরা এই কথা বলি যদি তাই হয় তবে বস্ত্র বয়ন করিবার তাঁতে ঘটের আবির্ভাব হয় না কেন? কুম্ভকারের চাকা ঘুরাইলে বস্ত্রের আবির্ভাব হয় না কেন? আমাদের এই কথার উত্তরে অবশ্য ইহাই বলিতে হইবে যে বস্তুবিশেষে বস্তুবিশেষের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেই হইল, তা হইলে কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে যে বস্তুর

থাকা আবশ্যাক করে সেই বস্তুকে কারণ না বলিয়া কোন বস্তুর প্রকাশের পূর্ব্বে যে বস্তুর থাকা আবশ্যক করে তাহাকেই কারণ বলিব।

বৈজিকতত্ত্ব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্তানের সহিত জনক জননীর কিছু না কিছু বৈসাদৃশ্য থাকে। আমরা এ পর্য্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি যে সন্তান জনক জননীর মত হয়, অর্থাৎ অপর ব্যক্তি অপেক্ষা জনক জননীর সহিত সন্তানের সাদৃশ্য বিশেষ থাকে। কখন কখন সাদৃশ্য এমত হয় যে, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু সাদৃশ্য যতই সূক্ষ্ম হউক, কোন অংশে না কোন অংশে বৈসাদৃশ্য থাকে। জনক জননীর ন্যায় সন্তান হয় ইহা নৈসর্গিক নিয়ম, আবার জনক জননী হইতে সন্তানের যে কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য থাকে ইহাও আর একটী নৈসগিক নিয়ম। উভয় নিয়ম পরস্পর অসংলগ্ন নহে। সাধারণতঃ আকৃতি বা প্রকৃতি সম্বন্ধে পিতা পুত্র একইরূপ হয়, কিন্তু অনেক সূক্ষ্ম অংশে অন্যরূপ হয়। পৃথিবীর কোন দুইটি পশু বা পক্ষী একরূপ নহে, কোন অংশে না কোন অংশে তাহাদের বৈসাদৃশ্য থাকে। আবার সেই বৈসাদৃশ্যের তারতম্য আছে। কোন অংশের প্রভেদ হয় ত এত স্পষ্ট যে প্রথমেই তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। কোথাও বৈসাদৃশ্য এত সামান্য বা এত সূক্ষ্ম যে তাহা বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে লক্ষ্য হয় না। আমাদের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ, সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকিলে আমরা হয় ত তাহা একেবারে দেখিতে পাই না। পিপীলিকার মধ্যে পরস্পর কোন প্রভেদই আমরা দেখিতে পাই না, অথচ তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে, প্রভেদ না থাকিলে তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিত না। মনুষ্যমধ্যে সূক্ষ্ম বৈসাদৃশ্য আমরা অনেক বুঝিতে পারি, সত্য, কিন্তু সকলগুলি পারি না। জন্মভূমিগত একরূপ বৈসাদৃশ্য হয় আমরা তাহা একেবারে দেখিতে পাই না। কিন্তু একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আছে তাহারা এই বৈসাদৃশ্য বুঝিতে পারে। উষ্ণপ্রদেশজাত ব্যক্তিকে তাহারা দংশন করে না, কিন্তু শীত প্রদেশজাত ব্যক্তির অনাবৃত দেহ পাইলে একেবারে অস্থির করিয়া দেয়। পিতা যদি শীতপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন আর পুত্রের জন্ম যদি উষ্ণদেশে হয়, তাহা হইলে পিতা পুত্রে এই এক প্রকার বৈসাদৃশ্য জন্মে। এইরূপ বৈসাদৃশ্য কতই আছে।

গুরুতর বৈসাদৃশ্যও [illegible] ঘটে। জনক জননীর অঙ্গুলিতে [illegible] [illegible]

পর্ব্ব ছিল, সন্তানের অঙ্গুলিতে দুইটি করিয়া পর্ব্ব হইল। কপোত কপোতীর পুচ্ছে বারটী করিয়া পাখা ছিল, তাহাদের শাবকের পুচ্ছে হয় ত তেরটি করিয়া পাখা হইল। বৃষ ও গাভী উভয়ের শৃঙ্গ ছিল, তাহাদের বৎস হয় ত একেবারে শৃঙ্গহীন হইল। এইরূপ বৈসাদৃশ্য বহুতর ঘটে; একবার ঘটিলে হয় ত পুরুষানুক্রমে থাকিয়া যায়। কিন্তু কেন ঘটে, সে বিষয় মীমাংসা করা কঠিন। তথাপি বিজ্ঞানবিদেরা স্থূল স্থূল বিষয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা তাহার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি। ব্যক্তিবিশেষের কথা না বলিয়া কেবল কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বলা যাইতেছে। এই সাধারণ নিয়মগুলি জাতি উৎপত্তির মূল। ঈশ্বর নূতন নূতন জাতি সৃষ্টি করেন না, তাঁহার এই নিয়ম হইতে জাতি উৎপত্তি হইতেছে। কিরূপে হয় তাহা এই পরিচয় গুলি দ্বারা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে।

দেখা যায়, যে আরণ্য পশুপক্ষী বা বৃক্ষ লতার মধ্যে বৈসাদৃশ্য অতি অল্প, একবারে থাকে না বলিলেই হয়। তাহারা পুরুষানুক্রমে একই অবস্থার অধীন, কাজেই তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি পুরুষানুক্রমে একই প্রকার হইয়া থাকে। সেই পূর্ব্বাপর প্রচলিত অবস্থার অন্যথা হইলে দেখা যায়, যে চারি পাঁচ পুরুষের মধ্যে তাহাদের বৈসাদৃশ্য আরম্ভ হয়। বন্য আম্র আকারেই ক্ষুদ্র ও অম্লময়, কখন বড় আকারের হয় না, কখন সুস্বাদু হয় না। চিরকালই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। বনের মৃত্তিকা প্রায়ই কর্ষণ অভাবে কঠিন, অথবা তাহা স্বাভাবিকই কঠিন। যতই বৃক্ষপরম্পরা তথায় জন্মিয়াছে বা জন্মিতেছে, সকলেরই পক্ষে মৃত্তিকা সমভাবে কঠিন, অতএব সকলের অবস্থা একই রূপ, ফলও কাজেই একই রূপ। ইহার অবস্থান্তর কর, সেই জাতি আম্র কোন দিকে ও কর্ষিত ভূমিতে রোপণ কর, দুই চারি পুরুষের মধ্যে বৈসাদৃশ্য আরম্ভ হইবে। কোন গাছের আম্র বড় হইবে, কোন গাছের আম্র ছোট থাকিবে, কোন গাছের আম্র লম্বা হইবে, কোন গাছের আম্র টক থাকিবে, কোন গাছের আম্র সুমিষ্ট হইবে।

অবস্থান্তরই বৈসাদৃশ্যের সাধারণ হেতু। নানাকারণে সেই অবস্থান্তর ঘটে; তন্মধ্যে ভোগজনিত অবস্থান্তর এবং ক্রিয়াজনিত অবস্থান্তর এই দুই প্রধান বলিয়া বোধ হয়। আম্র সম্বন্ধে বৈসাদৃশ্যের কথা যাহা উল্লেখ করা গেল তাহা ভোগজনিত, বনের শুষ্ক ও কঠিন মৃত্তিকায় যে অল্প রস থাকে বহুবৃক্ষ তাহার আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু কর্ষিত ভূমিতে রস অধিক, অথচ তাহার রসভোগী বৃক্ষ অল্প। এই জন্য বন্য বৃক্ষ এবং গ্রাম্য বৃক্ষের বৈসাদৃশ্য জন্মে। যে জাতীয় পশু বা পক্ষী পুরুষানুক্রমে বহুকষ্টে আহার উপার্জ্জন করিয়া কোন প্রকারে প্রাণধারণ করে, সেই জাতীয় পশু পক্ষী পরিশ্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মনু-

স্থ্যালয়ে যদি নিত্য যথেষ্ট আহার পায়, তাহা হইলে তাহাদের বৈজাত্য আরম্ভ হয়, এই বৈজাত্য কতকটা ভোগজনিত এবং আবার কতকটা ক্রিয়া জনিত। যে হংস বন্য অবস্থায় আকাশে উড়িত, তাহার শাবকদিগকে আর উড়িতে না দিয়া গৃহে আবদ্ধ রাখিলে তাহাদের পাখার ক্রিয়া হইতে পায় না। ক্রিয়া অভাবে তাহাদের ডানা পুষ্টিলাভ করে না। পুরুষানুক্রমে আবদ্ধ থাকিলে পুরুষানুক্রমে ডানা অপুষ্ট থাকে। শেষ অপুষ্ট বা দুর্ব্বল পাখা তাহাদের স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। গৃহপালিত হইলে কেবল পদ দ্বারা গতিবিধি করে কাজেই কেবল পদদ্বয় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তদ্ভিন্ন যথেষ্ট আহারে শরীর পুষ্ট ও ভারি হইয়া উঠে, ও সেই ভারি শরীর বহন করিতে হয় বলিয়া পদদ্বয় আরও বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয়। ক্রমে কিছু পুরুষ পরে বন্য হংস ও গৃহপালিত হংসের মধ্যে এত গুরুতর বৈসাদৃশ্য জন্মে, যে পৃথক্‌জাতি বলিয়া পরিচিত হয়, উভয় একত্র করিলে দেখা যায় যে পালিত হংসের শরীর বিলক্ষণ স্থূল ও গুরু, বন্য হংসের শরীর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও লঘু। পালিত হংসের পক্ষ সবল হেতু তাহারা উড়িতে সমর্থ, বন্য হংসের পক্ষ দুর্ব্বল হেতু উড়িতে অসমর্থ। একের পা ক্ষুদ্র এবং লঘু অপরের পদদ্বয় বলিষ্ঠ এবং গুরু। বালিহাঁস ও পাতিহাঁস তুলনা করিলেই এই পার্থক্য বুঝা যাইবে। আর এই পার্থক্য কিরূপে জন্মিল, বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে জাতির উৎপত্তি বোধ হইবে।

ক্রিয়াজনিত বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে যে উদাহরণ দেওয়া হইল তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তথাপি আর দুই একটী দেওয়া যাইতেছে। মেমথ নামে গভীর গুহায় যত প্রকার জন্তু বাস করে, সকলেই অন্ধ। গুহায় কোন রূপে আলোক প্রবেশ করে না, সর্ব্বত্র অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, কাজেই চক্ষের ক্রিয়া হয় না। ক্রিয়া অভাবে চক্ষের কোন অংশই পুষ্টিলাভ করে না। ক্রমে প্রত্যেক পুরুষের এইরূপ অক্রিয়া হেতুতে চক্ষু দুর্ব্বল হইতে থাকে। আবার প্রত্যেক পুরুষের সেই দৌর্ব্বল্য সন্তানে যায়। ক্রমে পুরুষ পরম্পরা এইরূপ হইয়া আসিলে শেষ তাহারা একেবারে চক্ষুহীন হইয়া পড়ে। এইরূপে মেমথ ও অন্যান্য গুহার জন্তুদিগের চক্ষু এক প্রকার লোপ পাইয়াছে, কেবল মূষিকের ন্যায় চক্ষুর গঠন আছে মাত্র, কিন্তু দৃষ্টি নাই। এই সকল জন্তুর পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন আলোকে থাকিত, তাহাদের চক্ষু ছিল। এক্ষণে ক্রিয়াজনিত রূপান্তর ঘটিয়াছে।

বন্যগাভীর দুগ্ধস্থলী বা পালান এত ক্ষুদ্র ও সামান্য যে তাহার প্রতি প্রায় দৃষ্টি পড়ে না, কিন্তু গৃহপালিত গাভীর পালান কি রূপ স্থূল ও পরিপুষ্ট তাহা সকলেই জানেন। এইরূপ [illegible] হেতু যে ক্রিয়াজনিত তাহার সন্দেহ নাই।

দোহন কালে গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধস্থলী যেরূপ প্রত্যহ টানা হয়, তাহা দেখিলেই প্রভেদের কারণ বুঝা যায়।

অনেকে বলেন, যে চতুষ্পদদিগের বন্য অবস্থায় কর্ণের অগ্রভাগ ঊর্দ্ধমুখে থাকে, অর্থাৎ তাহাদের কাণ খাড়া থাকে, তাহাদের কর্ণের গঠনই ঐরূপ। কিন্তু গৃহপালিত হইলে কিছু পুরুষ মধ্যেই তাহাদের কাণ ঝুলিয়া পড়ে। ডারউইন সাহেব বলেন, যে শব্দ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, বিশেষতঃ কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত, চতুষ্পদদিগকে সর্ব্বদাই কর্ণ উত্তোলন করিতে হয়; কিন্তু গৃহপালিত অবস্থায় তাহার প্রায় প্রয়োজন হয় না। ক্রমে সঞ্চালন ও ক্রিয়া অভাবে কর্ণের শিরা ও বলমাংস দুর্ব্বল হইয়া যায়, কর্ণ ঝুলিয়া পড়ে।

ব্যাঙ্ক সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে যে অঙ্গ সঞ্চালিত হয়, সঞ্চালনের সময় সে অঙ্গে অধিক রক্ত প্রধাবিত হয়, সঞ্চালন ক্ষান্ত হইলে রক্তস্রোতও হ্রাস পায়। কাজেই যে অঙ্গ সচরাচর সঞ্চালিত হয় সে অঙ্গের রক্তপ্রণালী বা শিরা পরিসর হইয়া উঠে, পথ-পরিসর হইলে রক্ত অধিক পরিমাণে প্রধাবিত হয়, যে অঙ্গ অধিক রক্ত পায় সে অঙ্গ অবশ্য অধিক পরিপুষ্টতা লাভ করে। আমরা বাম হস্ত অপেক্ষা দক্ষিণ হস্ত সচরাচর অধিক সঞ্চালন করি, এই জন্য আমাদের দক্ষিণহস্ত বামহস্ত অপেক্ষা মোটা, এমন কি বাম হস্তের অঙ্গুরী দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিতে প্রবেশ করে না। ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীরা বাম হস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া রাখে, কখন নামায় না, তাহাদের সে হস্তের আর কোন ক্রিয়া হয় না। কাজেই সে হস্তের রক্তের গতি কমিয়া যায়, ক্রমে হস্তটি শুকাইয়া উঠে। অতএব অঙ্গসঞ্চালন করিলে যেমন অঙ্গের পুষ্টিলাভ হয়, ক্রিয়াবোধ করিলেও অঙ্গের তদনুরূপ ক্ষীণতা জন্মে। পালিত হংসের পক্ষ সম্বন্ধে দৌর্ব্বলতা বা পালিত চতুষ্পদের কর্ণসম্বন্ধে দৌর্ব্বলতা এইজন্য।

অনেকেই জানেন, মনুষ্যমধ্যে বন্য জাতিরা পুরুষানুক্রমে বিশেষ বলিষ্ঠ। কেন বলিষ্ঠ? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে তাহাদিগকে সর্ব্বদাই বলের আলোচনা করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে রাজশাসন নাই, কাজেই কথায় কথায় মল্লযুদ্ধ দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া লইতে হয়। আগ্নেয় অস্ত্র বা যুদ্ধ কৌশল নাই, কাজেই তাহাদের জয় পরাজয় কেবল শারীরিক বলের উপর নির্ভর করিতে হয়। যে বলিষ্ঠ তাহারই জয়, যে দুর্ব্বল, সে হয় শিকারকালীন পশুহস্তে, নতুবা বিরোধকালীন শত্রুহস্তে প্রাণ ত্যাগ করে। কাজেই কেবল বলিষ্ঠেরা রক্ষা পায় এবং বলিষ্ঠেরাই বংশ রাখিয়া যায়। বলিষ্ঠের বংশ বলিষ্ঠ হয়, ইহা বৈজিক নিয়ম। আর এক কথা, বলিষ্ঠদের বলপরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতার পরিচালনা হইতে থাকে।

ক্রোধ হইলে মুখের যে সকল অংশ কুঞ্চিত বা বিস্ফারিত হয়, ক্রোধের পৌনঃপুন্যে সেই সকল অংশ পুষ্টতালাভ করে। বন্যদিগকে দেখিলে যে অতি ক্রুষ্ট বা নৃশংস বলিয়া বোধ হয়, এই তাহার কারণ। আর আমাদের বাঙ্গালিকে দেখিলে যে শান্তপ্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ ঠিক ইহার বিপরীত। বাঙ্গালার রাজশাসন যেরূপ এক্ষণে সুপ্রণালীবদ্ধ তাহাতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বড় বল আবশ্যক হয় না, রাজদণ্ডের ভয়ে হউক, আর শাস্ত্রের শাসনেই হউক, বাঙ্গালায় বহুকালাবধি বড় বলপ্রয়োগ নাই, যুদ্ধ বিক্রম নাই। কাজেই পরিচালনা অভাবে বলেরও বৃদ্ধি নাই। বরং হ্রাস পাইতেছে।

ক্রিয়াগত বৈসাদৃশ্যের কথা অনেক বলা গেল, এক্ষণে খাদ্যগত বৈসাদৃশ্যের কথা কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে ভোগজনিত বৈসাদৃশ্যের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে তাহা কেবল পরিমাণসম্বন্ধে, খাদ্যের প্রকারভেদে কিরূপ বৈসাদৃশ্য জন্মে তাহা বলা হয় নাই, এক্ষণে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, কোন কোন গোলাপগাছে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকড়সা থাকে। গোলাপের বর্ণের ন্যায় তাহাদের বর্ণ হয়; দেখিলে বোধ হয়, যেন গোলাপের পাপড়ি দিয়া তাহাদের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। গোলাপের পাপড়ি ভক্ষণ করিয়া মাকড়সার এই বর্ণ হয়। অনেকে বলেন, গাঁজার বিচি* খাইলে কোন কোন ক্ষুদ্র পক্ষীর বর্ণ কাল হইয়া যায়। গুটিপোকার বর্ণ আহার অনুসারে হয়। ভারজিনিয়া দেশে এক প্রকার মূল (Lachnanthes tinctoria) আছে, তাহা আহার করিলে শূকরের অস্থি রক্তবর্ণ হইয়া যায়।

গর্ভের অবস্থা বৈসাদৃশ্যের আর একটি কারণ। প্রতিবারই গর্ভের অবস্থা একরূপ থাকে না, এই জন্য প্রতিবারই প্রসবিত সন্তান একরূপ হয় না। কোন জনকজননীর অনেক সন্তান হইলে দেখা যায় সন্তানদের মধ্যে বিলক্ষণ বৈসাদৃশ্য থাকে। তাহাদের একত্রে দেখিলে বোধ হইবে একবংশজ অথবা এক গর্ভজ, অথচ পরস্পরের বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট থাকে। আবার সেই জনক জননীর যদি কোন যমজ সন্তান থাকে, তাহা হইলে দেখা যায় সেই যমজ সন্তানের মধ্যে আর তাদৃশ বৈসাদৃশ্য নাই। যমজ সন্তান একত্রে জন্মে, একত্রে গর্ভে পরিবর্দ্ধিত হয়; কাজেই তাহাদের উভয়েরই পক্ষে গর্ভের অবস্থা একই রূপ থাকে, উভয় সন্তান কাজেই একই রূপ হয়। একবার দুইটি যমজকন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাদের উভয়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বাঁকা হইয়াছিল, উভয়েরই এক দিকে একই প্রকার গজদন্ত উঠিয়াছিল।

---

* Hemp seed.

এই সাদৃশ্য হঠাৎ বা অকারণ হয় নাই, সেই গর্ভে শত সন্তান জন্মিলে সকলেরই কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বাঁকা হইত, সকলেরই গজদন্ত হইত। কি কারণে সন্তানের অঙ্গুলি বাঁকিয়া যায় অথবা গজদন্ত উঠে আমরা তাহা জানি না, কিন্তু তাহা যে কারণেই হউক গর্ভ অবস্থায় সে কারণ ঘটিয়াছিল, তাহাই উভয় সন্তানের শরীরে তাহার কার্য্য দেখা দিয়াছিল।

অন্য সন্তান অপেক্ষা যমজ সন্তানে বৈসাদৃশ্য বড় থাকে না; কারণ তাহাদের এক অবস্থাধীনে জন্ম। অনেক যমজ এক সময়ে এক গর্ভে জন্মে বটে, কিন্তু হয় ত পৃথক্ পৃথক্ থলী বা পোরোর ভিতরে থাকিয়া বড়িতে থাকে, সে স্থলে সন্তানদের মধ্যে পরস্পর অবস্থার কিঞ্চিৎ ভিন্নতা থাকে, কাজেই আকৃতি প্রকৃতিরও কিঞ্চিৎ ভিন্নতা জন্মে। কিন্তু যে স্থলে উভয় সন্তান এক "পোরোর" মধ্যে জন্মে, সে স্থলে যমজের মধ্যে একেবারেই বৈসাদৃশ্য থাকেনা বলিলেই হয়। অনেক দিন হইল একবার এইরূপ দুইটি যমজের সহিত আমাদের বাস করিতে হইয়াছিল, আমরা সর্ব্বদা তাহাদের দেখিতাম অথচ সর্ব্বদাই একজনকে মনে করিয়া আর এক জনের সহিত কথা কহিতাম। এই যমজসম্বন্ধে এরূপ ভ্রম সকলেরই হইত। তাহাদের শারীরিক ও অভ্যন্তরিক সাদৃশ্য এতই চমৎকার ছিল, যে উভয়ের পীড়া পর্য্যন্ত একই রূপ হইত। একজনের শিরঃপীড়া হইয়াছে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ অপরটিরও শিরঃপীড়া হইবে। তাহাদের মৃত্যুও একই পীড়ায় হইয়াছিল। এক জন মেদিনীপুরে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছিল, অপরটি তৎকালে প্রায় পনের ক্রোশ দূরে ছিল; তাহারও ওলাউঠায় মৃত্যু হইল। কিন্তু প্রায় তিন চারি দিবস পরে হয়। যমজ মাত্রেরই মৃত্যুবিষয়ে এই নিয়ম নহে, আমরা আরও দুই চারিটি যমজ দেখিয়াছি একটির অনেক বৎসর পর অপরটি মরিয়াছে।

অবস্থা যতই একরূপ হইবে সাদৃশ্য ততই সম্পূর্ণ হইবে। যমজদের অবস্থা অনেকবিষয়ে একরূপ, এই জন্য তাহাদের সাদৃশ্যও অতি অসাধারণ হয়। অপর সহোদরদের মধ্যে অবস্থা ততটা একই রূপ ঘটে না, এই জন্য সাদৃশ্যও তত প্রবল হইতে পায় না। সমাবস্থা সাদৃশ্যের কারণ। অসমাবস্থা বৈসাদৃশ্যের কারণ। একেবারে সম্পূর্ণ সমাবস্থা ঘটে না এইজন্য সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায় না, কাজেই বৈসাদৃশ্য সকল ব্যক্তিতে কিছু না কিছু থাকে।

এই বৈসাদৃশ্যের জন্য কতই নূতন নূতন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে, ও হইবে। জাতিবৃদ্ধির ফল কি, তাহা ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু এই বৈসাদৃশ্যের নিয়ম অবলম্বন করিয়া একণে মনুষ্যেরা আপনাদের ইচ্ছানুরূপ পশু পক্ষীর আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া লই-

তেছে। তাহার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় এস্থলে নিতান্ত আবশ্যক নহে, তথাপি দুই একটি কথা অতি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

জনক জননীর সহিত সন্তানের যে বৈসাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে কি দাঁড়াইবে ইহা অনুভব করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে গঠন সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন করান যাইতে পারে। সচরাচর পায়রার পুচ্ছে বারটি করিয়া পালক থাকে; মনে করুন এক সময়ে একটি শাবকের তেরটি পালক হইয়াছিল, একব্যক্তি সেই শাবকটিকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিল, শাবকের যখন শাবক হইতে লাগিল, তখন তাহাদের মধ্যে কোনটির পূর্ব্বমত বারটি পালক হইল, কোনটির তেরটী পালক হইল। দুই সম্ভব, কেন না কোন সন্তান পূর্ব্বপুরুষের মত হয়, কোন সন্তান বা জনক জননীর মত হয়। যে পায়রা গুলির তেরটি করিয়া পালক হইল, তাহাদের আবার শাবক হইলে পূর্ব্বমত কোনটির বারটি পালক, কোনটির তেরটি পালক, আবার কোনটির চৌদ্দটি পালক হইল। চৌদ্দটি পালক হওয়া অসম্ভব নহে, কেন না যে বৈসাদৃশ্যের নিয়মে বারটি পালকের স্থলে তেরটি পালক হইয়াছিল, সেই নিয়মে তেরটি পালকের স্থলে চৌদ্দটি হইল। এইরূপে কতক গুলি পায়রার পুচ্ছে পুরুষপরম্পরায় পালক বাড়িয়া এক্ষণে বাইশটি পালক হইয়াছে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র স্থানে সেই বাইশটি পালকের কেবল অগ্রভাগ আবদ্ধ থাকায় তাহার অপর ভাগ ছড়িয়া পড়িয়া ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় হইয়াছে। এই পায়রা গুলিকে এক্ষণে লক্কা নাম দিয়া স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, বাস্তবিকও ইহারা স্বতন্ত্র জাতি দাড়াইয়াছে।

যে ধান্য বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে ব্যবহার হইতেছে, তাহার আদি কি ছিল অনুসন্ধান করিলে বৈসাদৃশ্যের ফল বুঝা যাইবে। ধান্য গাছের আদি এক প্রকার ক্ষুদ্র ঘাস মাত্র। সেই ক্ষুদ্র ঘাস প্রথমতঃ কর্ষিত ভূমিতে রোপণ করা হয়। কর্ষিত ভূমিতে ঘাস পুরুষপরম্পরা রোপিত হইলে তাহাদের বৈসাদৃশ্য আরম্ভ হইল, কোন ঘাসটি পূর্ব্বমত ক্ষুদ্র রহিল, কোন ঘাসটি বড় হইল। যে গুলি বড় হইল বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের বীজ লইয়া পুনরায় আর এক স্থানে রোপণ করা হইল; আবার সেই স্থানের বড় বড় ঘাস হইতে ভাল ভাল বিচি বাছিয়া রোপণ করা হইল। এইরূপ করিতে করিতে শেষ এই ধান্য দাঁড়াইল। নির্ব্বাচন এই উন্নতির মূল। এখনও যদি বীজ বাছনি করিয়া রোপণ করা হয়, এখনও ধান্যের আরও উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কৃষকেরা এবিষয়ে আর বড় মনোযোগ করে না। তাহারা এক্ষণে কেবল পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি করে। কিন্তু সে দোষ তাহাদের নহে। বাণিজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণের বৃদ্ধি

আবশ্যক হইয়াছে। কৃষকেরা সেই আবশ্যকোপযোগী ধান্যের উৎপাদন করিবার উপায় করিতে পারিলেই আবার এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে পারিবে।

গঙ্গাধরশর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গোয়েন্দা।

শান্তিপুরে শান্তির শেষ হইয়াছে। আমরা সে দিন সিংহবাবুদের বাটী হইতে বিদায় হইবার পরক্ষণে যে বাদ্য শুনিতেছিলাম সেই বাদ্যশেষই উৎসবের শেষ—সেই বাদ্যই সিংহদের শেষ গর্জ্জন। রক্ষাকালীর পূজা হইয়া গিয়াছে। থানায় সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে গ্রামে বিসূচিকার পীড়ায় হুলস্থুল পড়িয়াছে। বাবু শিবসহায় সিংহের কন্যা কাদম্বিনী নাই,এমতও একটী জনরব ব্যাপ্ত হইয়াছে। একটী সজ্জিত চিতাতে নিশীথ শেষে তাহাকে দাহ করিতেও দেখিয়াছেন,কেহ কেহ কহিয়া থাকেন। গবাক্ষে, ছাদে, স্নানাগারে, দেবমন্দিরে কেহ তাহাকে কোথায় দেখিতে পায় না, নাপিতবধূ তাহাকে আলতাভরণ দিতে যাইয়া নৈরাশে ফিরিয়া আসিয়াছে। সকলে বিমর্ষ, রক্ষাকালীর বিসর্জ্জনের সহিত সিংহবংশের, আমোদের বিসর্জ্জন হইয়াছে, কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, বিপদ খণ্ডন হইয়াছে,কিন্তু তাহা হইয়াও হইল না, আমাদের দেশে গোয়েন্দার অভাব নাই—আসল কথা ব্যক্ত হইয়াছে। ছিদ্রানুসন্ধানী মহাত্মা গোয়েন্দা! তোমার অগম্য স্থান ভারতে কোথায় আছে? যে রাজনিকেতনে দণ্ডধারী ভীষণ প্রহরীর পাহারা সেখানেও তুমি। সভাপতি, অধ্যাপক, মোসাহেব, সম্পাদক সাজিয়া দেশের খবর দিয়া থাক। যে স্নানাগারে রাজমহিলা পিপীলিকার প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া স্নিগ্ধ হইবার আশা করেন সেখানেও তুমি। সেকেন্দরের জয়পতাকা তুমিই ভারতে উত্তোলন কর, যবন পতনের পথ তুমিই না দেখাইয়া দাও? তোমার কথায় ব্রাহ্মণবৃত্তির লোপ, সংস্কৃতশাস্ত্রের লয়প্রাপ্তি, তোমার প্রভাবেই আজ সিংহবংশের ঘোর বিপদ।

আমাদের নূতন রাজ্য-বিভাগ স্থাপন হইয়াছে, সরকার বাহাদুর বাছিয়া বাছিয়া একটি সুযোগ্য কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছেন, তিনি ছালা ছালা ইংরেজি পুস্তক পাঠ করিয়া কত কত আলমারী খালি

করিয়াছেন, কয়েক বৎসর কালেজের অধ্যাপক থাকিয়া শিক্ষকশ্রেণীতে সুখ্যাতিলাভ করিয়াছেন, বিষয় বুদ্ধিতে মন উথলে পড়িতেছে, নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শিষ্টপালন করিবেন, দুষ্ট দমন করিবেন বলিয়া উৎসাহে মন পরিপূর্ণ, তাঁহাকে ঠাকাইতে পারে এমন কে আছে? দরখাস্ত পড়িলেই তিনি বাদীর মনের ভাব জানিতে পারেন। কাগজ পাঠ হইতে হইতেই মৌলবী সাহেব কহিয়া উঠিলেন, "দারগা একটী মিথ্যা রিপোর্ট লিখিয়াছে যে, কাদম্বিনীর বিসূচিকা পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছি যে অমূলক ইজ্জতের ভয়ে সিংহ বাবুরা একটি ফেরেব বানাইয়াছেন, ইহার বিহিত উপায় করা যাইবে।"

পরদিন প্রভাত, সিংহবাবুর কুপ্রভাত হইল, বৈঠকখানার পার্শ্বে একটি কুঠরী বাবু শিবসহায় সিংহের শয়নগৃহ, তাহার গবাক্ষদ্বার সিংহবাবু উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, কালকাল পাগড়ী ও বড় বড় লাঠি হস্তে কতকগুলি যমদূত তাঁহার গৃহ বেষ্টন করিয়াছে। নাজির ঘোটকারোহণে বাটীর চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতেছেন, সকলকে সতর্ক করিতেছেন ও কহিতেছেন, "খান বাহাদুরের ঘোড়া আগত প্রায়।" বাবু শিবসহায় এখন বিপদ সম্মুখে দেখিয়া কালী তারা ডাকিতে লাগিলেন, ও ভাবিলেন ইহার অর্থ কি? কি অপরাধ করিয়াছেন তাহাও স্থির করিতে অক্ষম, ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইতেছেন এমত সময় তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য রামা পরামাণিক গৃহের দ্বার ধীরে ধীরে খুলিল। বৃদ্ধবাবু চমকিত হইলেন, মনে করিলেন এই ধরিল, রামা অতি মৃদু স্বরে কহিল "আমি।"

শিব। আরে আমি কে?

রামা। আজ্ঞা, আমি।

শিব। ফের আমি, নাম কি?

রামা। আমি রামপ্রসাদ।

শিবসহায় বাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন রক্ষা হউক, সংবাদ কি বলিতে পারিস্?

রাম। পারি, মহাশয়—আমি—

শিব। তুই "আমি" ছাড়িবি না?

রাম। আমিই ভগবান্ মহাশয়—তা—

শিব। আ! আরে খবর বল।

রাম। আমি যেই জাগ্রত ছিলাম তাই রক্ষা। রাত্রি দুই প্রহরের সময় শঙ্কর সর্দ্দার কহিল, যে কাদুদিদিকে হাজির করিবার জন্য স্বয়ং হুজুর আসিবেন, আমি তখনি তার উপায় করিয়াছি।" রামার এই কথা শেষ না হইতেই দ্বারে একটি আঘাত হইল, ও সঙ্গে সঙ্গে নাজির সাহেব কহিলেন "ও বাবু শিবসহায় সিংহ! আপনাকে হাজির করিবার জন্য হাকিম সাহেবের হুকুম পাইয়াছি।"

বাবু শিবসহায় সিংহ ক্ষণমাত্র কালী স্মরণ করিলেন, চক্ষু মুদিলেন, কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, ভাবিলেন, যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রক্তবিসর্জ্জন ও প্রাণদানে

রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, এখন আহ-নের গৌরবে সেই রাজ্যে উচিত প্রতি-ফললাভ সম্ভাবনা। আবার ভাবিলেন ঈশ্বরের বিড়ম্বনা, পিতৃলোক যে যবনরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন এখন সেই যবনের হস্তে তাঁহার বংশের অনিষ্ট হওয়া চাই—আবার ভাবিলেন, "আমার বল কোথায়? গ্রামে যে সহস্র যুবাপুরু-ষকে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া যুদ্ধপটু করিয়া ছিলাম, যাহাদের মধ্যে এক ষোড়শ বৎসরের ছোকরার সাহায্যে সহস্র সহস্র সড়কি ক্ষেপণে সেই অত্যাচারী নীলকর বিডেন সাহেবকে সম্মুখযুদ্ধে পরাভব করিয়া দেশচ্যুত করিয়াছিলাম সে বল কোথায়? কেহ প্লীহাগ্রস্ত, কেহ মেলে-রিয়া জ্বরাক্রান্ত, অনেকেই জীর্ণ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে—হউক, তব ইজ্জত রক্ষা করা চাই।" রামা খানসামা এই সময় কাণে কাণে কহিল বাবুমহাশয় রাদম্বিনী দিদিকে হরণ করিতে দিব না—গোপাল চৌকিদারকে বলে সেই ভোররাত্রেই জলছেঁচা মরায়ের ঘরে লুকাইয়া রাখিয়া আসি-য়াছি।"

এই সময়ে গোপাল চৌকিদার উপ-স্থিত হইল, সে শিবু বাবুকেই প্রভু বলিয়া জানে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার অন্নদাস, নাজির সাহেবের সম্মুখে উপ-স্থিত হইয়া কহিল, "আপনারা যাঁহাকে তল্লাস করেন তিনি কি আছেন?" কর্ণে যেমন এই বাক্য প্রবেশ, অমনি নাজির সাহেবের হস্ত হইতে গোপালের পৃষ্ঠে জোড়া চাবুকের আঘাত বর্ষণ।

গোপা। ওগো আছেন—আছেন, —আছেন।

নাজির সাহেব বলিলেন "পথে আয়, কোথায় বল—বল কোথায়?"

গোপা। যথায় থাকুন, বাবুদের বাটীশূন্য।

নাজি। তবে কোথায় বল্—নাজির সাহেব কিঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি হইয়া মনে করি-লেন সন্ধান পাইব।

নাজির। কোথায় আছে বল।

গোপাল করযোড় করিয়া কিঞ্চিৎকাল করমর্দ্দন করিয়া কহিল "বৈকুণ্ঠে।" আবার বেত বর্ষণ হইল। গোপালের চীৎকারে বাবু শিবসহায় অন্যমনস্ক হইয়া গৃহহইতে বাহিরে আসিলেন ও তৎক্ষণাৎ নাজির সা-হেবের ইঙ্গিতে আসামী মধ্যে গণ্য হইলেন।

শিব। আপনি মহকুমার নাজির সাহেব, আমার কন্যা জীবিত আছেন কি না তাহাই সন্ধান করিতে আসিয়া-ছেন।

নাজির সাহেব কহিলেন "আর তাঁহাকে লইয়া কাছারীতে হাজির করিতে আদেশ পাইয়াছি। তিনি কোথায়?" গোপাল চৌকিদার কহিল "জলমগ্ন।" নাজির সাহেব আবার বেত উঠাইয়া-ছেন এমন সময় একজন অশ্বারোহী পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে কহিলেন "মহাশয় একটা সন্ধান পাওয়া গেল, একটী কুলকন্যা এই

গোপাল চৌকিদারের গৃহ হইতে উহার স্ত্রীর সহিত বহিষ্কৃত হইয়া শ্রীনগরের দিকে যাইতেছে, সেই লাবণ্যময়ী যুবতী মলিনবসনা কিন্তু মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রিমার ন্যায় আরো সুন্দরী দেখাইতেছে। শুনিতেছি যাহার সন্ধানে আসিয়াছি সে কন্যা আর আমরা পাইব না।”

নাজির। শ্রীনগর? দ্রুত যাও, ও স্ত্রীদ্বয় যে হউক পথিমধ্যে ধৃত কর।

আদেশমাত্র দুইটি সজ্জিত অশ্বারোহী পুরুষ তীরবেগে ধাবিত হইল। শিবসহায়, কালীর নাম অন্তরে জপিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জলমগ্ন।

দেওয়ান গজানন হঠাৎ সিংহবাবুদের দরজায় নাজির সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত। “বলি মিথ্যা এখন ত আর মিথ্যা রহিল না, মিথ্যাই সত্য হল, কাদম্বিনী কন্যা অদ্য পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন না ছিলেন ভগবান্ই জানেন, বধূরীরই জানেন—কিন্তু যদি আজ যা দেখিলাম, যদি মহাশয়! আঁখিদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে হয়, তবে সব সন্দেহই ভঞ্জন হইল, কাদম্বিনী জলমগ্না। আমি ব্রাহ্মণী নদী পার হইয়া একশত বিঘামাত্র আসিয়াছি, দেখিলাম, জনাব নাজির সাহেব! শুনুন মহাশয় শুনুন, আপনারই অনুচর হইবেক, দুই অশ্বারোহী পুরুষ ধাবমান, বামপার্শ্বে রাস্তা ছাড়িয়া দুটি অনাথিনী অবলা নদীর ঘাটে ত্বরিত উপস্থিত ও নৌকায় আরোহিত; ঐ স্ত্রীদ্বয়মধ্যে, একজন একটি নিজ অঙ্গ হইতে কি একটী সামগ্রী পাটনির হস্তে অর্পণ করিবামাত্র খিলা নৌকা ঘাট হইতে ত্বরিত চালিত হইল। এদিকে অশ্বারোহী উভয়ে ‘নোকা রাখ রাখ’ বলিয়া গম্ভীরস্বরে পাটনিকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু আজ কাল বন্যার জলে উভয় কূল টইটম্বুর; এক টানা, নৌকা বেলের বেগে চলিল ও বাদশাহী ভগ্ন সাঁকোর নিকট যাইয়া সেই পাকা নেডা থামের উপর যেমন পড়িল একটি পতঙ্গের ন্যায় জলস্রোতে ভাসিয়া নৌকাটি নয়নপথের বাহির হইল, একটি গোল উপস্থিত হইয়া থামিল, বোধ হইল নৌকা ডুবমার হইয়া তকালঙ্কারের আশ্রমের ঘাটের নিকট জলমগ্ন হইল, ছারখার হায় রে! ছারখার!”

এই কথা গুলি শেষ না হইতেই অশ্বারোহী উভয় পুরুষ আসিয়া উপস্থিত। একজন কহিয়া উঠিল “মহাশয় সব চেষ্টা বিফল, স্ত্রীলোকের এমন বুদ্ধি? আমরা প্রায় ধরে ছিলাম একটি স্বর্ণালঙ্কার পাটনির হস্তে দিয়া পার হইতে যাইয়া নৌকা সহিত জলশায়ী হইয়াছে, নিরুপায় হইয়া মহাশয়ের নিকট প্রত্যাগত হইয়াছি।” নাজির সাহেব ভাবিয়া বসিয়া পড়িলেন। সমুদয় নারাসাই, দেখিতে দেখিতে আসামী, হস্তান্তর! কি কৈফিয়াৎ দিব! নাজির

সাহেব মনে মনে ভাবিতেছিলেন—গজানন তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছেন ও এক কথায় মোকদ্দামা ফাঁস করিবার বুদ্ধি রচনা করিতেছেন। কিঞ্চিৎ কাল সকলে নিস্তব্ধ, এমন সময় সম্বাদ আসিল যে খাঁ বাহাদুর অদ্য স্বয়ং আসিতে অক্ষম, সাহেব ঘোড়া চড়িতে হঠাৎ অপারগ হইয়াছেন। সংবাদদাতা হরকরা কহিল "মহাশয় সব প্রস্তুত, সাহেব পোষাক পরিয়া টুপি লাগাইয়া ঘোড়ার নিকট উপস্থিত হইয়া চসমা বাহির করিয়া দেখিলেন একটি পরকলা ফাটিয়া গিয়াছে, আর ঘোড়া চড়া হইল না—" অশ্বারোহণের সহিত চসমার সম্বন্ধ বিচার করিতে অনেকেই অক্ষম, কিন্তু খাঁ বাহাদুর আণ্ডা আহার করিতে প্রবৃত্ত হউন, বিচারাসনে রায় লিখিতে প্রবৃত্ত হউন, আল্বালার লম্বা নল ধারণে প্রবৃত্ত হউন, বেগম সাহেবের মহলেই যান, বা ঘোড়া চড়ুন, বা যাহাই করুন সকল কার্য্যেই তিনি চসমা ব্যবহার করিতেন কিন্তু তাহা যে কেবল শোভা বর্দ্ধনের নিমিত্ত এমত নহে, তিনি আদৌ দেখিতে পাইতেন না। শুনা যায় যে চস্মা ভিন্ন তাঁহার শয্যায় সুনিদ্রা আসিত না—চসমা ভিন্ন তাঁহার স্বপ্ন দেখিতেও কষ্ট হইত। যাহা হউক সামান্য কারণ হইতে বৃহৎ ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে—আজ চসমা ভাঙ্গাতে অনেক অবসর ও গজাননের বুদ্ধিচালনার সুসময় হইল। গজানন নাজিরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "মহাশয়ের কি অভিপ্রায়? যখন আমি আসিয়াছি যা চাহিবেন তাহাই সিদ্ধ হইবে। আমার নাম গজানন চৌধুরি, হাকিমদের খিদমতেই আমি চিরকাল কাটাইলাম।" যেমন ফ্রিমেসনারী দলভুক্ত ব্যক্তি আপন ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে ইঙ্গিতে চিনিতে পারে দেওয়ানজীর অঙ্গুলিবিক্ষেপণে ও নাক চোকের ভঙ্গিতে নাজির সাহেব তাঁহাকে নিতান্ত আত্মীয়মধ্যে গণ্য করিয়া একটী সেলাম করিয়া কহিলেন "মেহের বান হুজুরের, আপনিই বাবু সাহেবের দেওয়ান?" গজানন শুধ সমেত সঙ্গে সঙ্গে সেলাম প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন "কার্য্য পরে, এখন খানার উদ্যোগ করা যায়?" খানার নাম মাত্র "চূদ" আর "বক্রি" 'কহিমাচ' আর "তরকারী" ও গণ্ডা আষ্টেক "আণ্ডার" বরাত হইল, চারিদিকে লোক ছুটিল, কাছারি যেরূপ গরম হইতেছিল অনেক ঠাণ্ডা পড়িল। গজানন আবার কহিলেন, "মহাশয় এখানে বড চমৎকার রেসমের চারখানা হয়—আপনার যে ইজের দেখিতেছি ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্ত্র, জানানার বেগম সাহেব সে কাপড় বড় ভাল বাসিবেন। এই যে বাবুদের ঘরে আপনি আসিয়াছেন, লক্ষ্ণৌ সাসিরাম, বাণারসের মহাজনদের সঙ্গে এদের কারবার বরাবর প্রচলিত রহিয়াছে—এরা লক্ষ্ণৌয়ের টুপি ও বেনারসী মুরেটার ব্যবসা করেন, পছন্দ হয়

তো খরিদ করুন।” আবার নিম্ন স্বরে কহিলেন “বন্দাও আপনার ঘরের লোক, মর্জ্জি হয় তো দুই চারিটা দ্রব্যের নজর দিবার অধিকার রাখি—অধিকার মশাই অধিকার।” পরক্ষণেই প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব দিকের কামরাতে নাজির সাহেব গজাননের সহিত একটি গালিচার উপর তাকিয়া ঠেশ দিয়া, সযত্নে জানুদ্বয় অগ্রসর করিয়া ও তাহার তলে পদযুগল গজকাটির ন্যায় মুড়িয়া, আবার দুটি হাত উল্টাইয়া ফরাসের উপর ভর দিয়া, একটী সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোকের ন্যায় বসিলেন—একজন ভৃত্য একটি বড় তাল বৃন্ত লইয়া হেলাইতে লাগিল, বায়ু সঞ্চালন হইলে নাজির সাহেব একবার টুপিটি উঠাইলেন, দেখিলাম তাঁহার মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে যেরূপ প্রচুর কেশ, মধ্যে সেরূপ নহে—চাঁদিটিতে তীক্ষ্ণ ক্ষুর পরিভ্রমণে গোল শাদা জমি বাহির করিয়া দিয়াছে, বোধ হয় সেইটী দেখাইতে লজ্জিত হইয়া পাগড়ি ঈষৎ ঊর্দ্ধ করিবাই আবার তৎক্ষণাৎ পরিলেন, কিন্তু জটাধারী তাঁহার ফাঁকা মাথা দেখিয়া লইলেন। আবার দেখি, আমাদের চাপকাণের যে দিকে বোতাম তার বিপরীত ভাগে নাজির সাহেবের চাপকাণ আবদ্ধ। কেবল নাজির সাহেবের ও দেওয়ানজীর সহিত একটী বিষয়ে সাদৃশ্য—চসমার ডাটি উল্টে পরান নহে। নাজির সাহেবের খানসামা তাঁহার একখানি ধুতী আনিল। দেখিলাম তাহাও কাছা বিহীন। মনে করিলাম উভয়েরই কাছা নাই বলিয়া অল্প কালের মধ্যে এত সম্প্রীতির উদয় হইল, যাহা হউক এখন উভয়ে বসিয়া কাজের কথায় প্রবৃত্ত। একটী পরওয়ানা পাঠের উপক্রম করিতেছেন এমন সময় রাজকার্য্যনিষ্পাদক আর এক অবতারের আবির্ভাব হইল—ইনি বড় লোক, রাণীর বাজারের ডাকমুন্সি পূর্ণ চন্দ্র গাঙ্গুলী। ইনি বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টকে মানেন না, তদধীনের কর্ম্মচারীদের ভ্রূক্ষেপ করেন না। বলেন আমরা ওদের গ্রাণ্ড ফাদার, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যকারক। ইনিই সেই গাঙ্গুলী মহাশয় যিনি বাতার বাখারীর কলমের একপাশে ইংরেজি লিখিতেন ও অন্যদিকে ডাকঘরের থামের চূণ খসাইয়া বদনে অর্পণ করিয়া পানের ঝাল নিবারণ করিতেন। ইনিই আবার সেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জন্য ডাক্তার ইটওয়াল সাহেবের নিকট চূণ খরিদের নিমিত্ত মাসিক এক মুদ্রা বেতন বৃদ্ধি পাইয়া ছিলেন। ইঁহার প্রভুত্ব প্রতিপত্তি এক্ষণেও এ অঞ্চলে বিখ্যাত। আজ অনেক হাকিমের কথা শুনিতে ছিলেন কিন্তু নাজির সাহেবের উপরেও হাকিম আছে এই কথাটি জারি করিবার জন্য ইঁহার আগমন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিধানে একটি সামান্য ধুতী, তাহাতেই উদরের তৃতীয় অংশ বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিৎ নিম্ন পর্য্যন্ত আবৃত; তদুপর একটি মার্কিনের হাত্কাটা বেনিয়াম

—খাট খাট চুল,প্রায় বারো আনা পাকা অবশিষ্ট মাত্র কাঁচা, কপাল উন্নত—ওষ্ঠ দ্বয় পরিষ্কার ও দন্ত পাটি আরও উজ্জ্বল, চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ। নাজির সাহেবের সহিত চার চক্ষে—ররং আট চক্ষে—কারণ উভয়েরই চসমা ছিল—একত্র হইল। নাজিরের চসমা চিক্কণ—গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চসমা চৌড়া পিতলের হাসিয়াদার কলঙ্কময়। পিছনে সূত্র দিয়া টিকির নীচে আবদ্ধ। নাজির সাহেবকে দেখিবামাত্র আপনার চসমাদ্বয় মাথার চুলের উপর উঠাইলেন। তা হাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে একটী চতুর্লোচন মানুষ বোধ হইল—ও একবার গর্জ্জন করিয়া কহিলেন "আপনিই বুঝি নাজির? এ আপনার কোন দেশী নাজিরী? আমরা কি কখন নাজির দেখি নাই, নাজির! নাজির! নাজির! কাল ডাক্তর ইটুয়াল আসিবেন, আপনি আজ আমার ডাকঘরের হাতা হতে বেহারা ধরিতে পাঠাইয়াছেন, বক্রি,মুরগি,আণ্ডা এসব বুঝি আপনার জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় সংগ্রহ হতেছে? ঐ এক বিবাহের বরযাত্রীসহ দশখানি পাল্কির বেহারা আটক করিয়া দিলাম। আর আপনাকে কহিয়া যাইতেছি আমার একটি কাহার, একটি কুলি, আধখানি বাঙ্গিদার পাইবেন না। এখন,কাহারও পাল্কি চড়া হউক না হউক, ঘরে যাওয়া হউক আর না হউক আমি বলে রাখলাম।" দেওয়ান গজাননের প্রতি এতক্ষণে ডাকমুন্সি মহাশয়ের চক্ষু পড়িল। গজানন কহিয়া উঠিলেন "ও মহাশয়, ঘরের কথা, আমি এখানে আছি; আপনিও হাকিম, উনিও হাকিম।" গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন "হাকিম হলেই হয় না,হকিমতের বিচার করা চাই,ন্যায় অন্যায় প্রভেদ করা চাই কি না?"

দে। সে শক্তি কি সকলের আছে একবার অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গাঙ্গুলী "বলিবার কি অবসর আছে!" বলিয়া বেনিয়ানের জেব হইতে একটি চূণের ডিবার মত ঘড়ি খুলিয়া কহিলেন "মেল ব্যাগ প্রস্তুত করিতে হইবে আর টাইম (সময়) নাই।" আমি তত বড় ঘড়ি কখন দেখি নাই—কহিলাম ওটা ঘড়ি না তাল আঁটি?—আম পাড়া ঘড়ি?

গাঙ্গুলী "এ ছোকরা কে হে, পাকা ছেলে।" এই কথা গুলি কহিতে কহিতে প্রস্থান করিলেন।

এখন শিবসহায় সিংহের অজ্ঞাতে এই স্থির হইল কাদম্বিনীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করাই উচিত। কিন্তু কাদম্বিনী কোথায়? সাজাইতে হইবে। দেওয়ানজী নাজির সাহেবের কাণে কাণে কি কথা কহিলেন নাজির সাহেব মস্তক হেলাইয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। একটী শত মুদ্রাপূর্ণ বগলি কক্ষ হইতে বাহির করিয়া চারিদিকে চাহিয়া নাজির সাহেবের প্রতি অভয় ও সদ্ভাবপ্রকাশক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থলিটি ত্বরিত নাজির সাহেবের তাকিয়ার নীচে রাখিলেন। বাহিরে

জানালার নিকট হইতে বমুনীর তাহা দেখিল, সুস্বাদু মাংস খণ্ড দৃষ্টে লোভী কুক্কুর যেরূপ লোভদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহার নয়নে সেইরূপ লোলুপ্য দেখা গেল! ইতিমধ্যে সংবাদ আবার আসিল যে আগামী কল্য প্রাতেই খাঁ বাহাদুর সাহেব জমিনে পৌঁছিবেন ও মোকদ্দমা এই থানেই তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিবেন। পরদিন প্রাতে নাজির সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া পোষাক পরিয়া তাকিয়ার তল হইতে থলিটি লইতে যান, দেখেন তাহা অপহৃত হইয়াছে—পশ্চাদ্ভাগে জানালার বেল ভাঙ্গিয়া সিঁদ দিয়াছে—কথা প্রকাশ করিবার যো নাই চোরের টাকা বাটপাড়ে লইয়াছে হুজুরের ঘরে চুরি এক শত মুদ্রাই বা কোথা হইতে আসিয়াছিল? গজানন জানেন কে লইয়াছে, রঘু বন্ধকী জাইগির উদ্ধারের উপায় করিয়াছে—ভবিকে ভবি উঠাইয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষ।*

(বৈদেশিক চিত্র)

অনেকে বিবেচনা করেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরকাল অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে। সচরাচর ইতিহাস বলিতে লোকে যেরূপ বুঝে, তাহাতে এপ্রকার বিবেচনা করা নিতান্ত অন্যায় নহে। কোন স্থানে পর্য্যায়ক্রমে কে কে রাজা ছিলেন; প্রত্যেক রাজা কোন্ সময়ে কত বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কতকাল রাজত্ব করেন, তাঁহার কয়টী ভ্রাতা ভগিনী, মহিষী, পুত্র, কন্যা,—কত দাস, দাসী, অশ্ব, হস্তী, পদাতিক, ধন ছিল; তিনি কোন সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন, দিবারাত্রি মধ্যে কতবার নিদ্রা যাইতেন, এবং জাগরণ সময়ে কখন্ কি কার্য্য করিতেন; তিনি আহার বিহার বিষয়ে পরিমিতাচারী কি অমিতাচারী ছিলেন, কে কে তাঁহার প্রিয়পাত্র, সেনানী বা মন্ত্রী ছিল; কি পরিমাণে তিনি রাজ্যশাসন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন, কতদূর তিনি আপনার, কতদূর বা পরের বুদ্ধি অনুসারে চলিতেন; কি কারণে কতবার তিনি সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কোন্ কোন্ নগর নগরী ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ দেশ নররুধিরে প্লাবিত করিয়াছিলেন, স্বপক্ষ বিপক্ষ কতলোক

* Ancient India as described by Megasthenes and Arrian by J. W. McCrindle M A Principal of the Government College, Patna.

শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কোথায় জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, এবং কোথা হইতে বা ভগ্নমনোরথ হইয়া ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন ; ইতিহাস নামধারী অধিকাংশ গ্রন্থই এইরূপ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহা বলা বাহুল্য যে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজবংশাবলীর এ প্রকার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ, আয়তনে রুসিয়া নরওয়ে ও সুইডেন বাদে ইউরোপখণ্ডের তুল্য, এবং অতি পূর্ব্বকাল হইতে অনেক রাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক রাজবংশের প্রত্যেক রাজার কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিতে পারি, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা এরূপ উপকরণ রাখিয়া যান নাই। হয়ত, তাঁহারা নশ্বর মানবজীবনের ঈদৃশ ঘটনাবলী বর্ণনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিতেন না। যাহা হউক, কোনকোন রাজবংশের নামাবলী, এবং কোন কোন রাজার দুই একটী মহৎকার্য্যের উল্লেখ ব্যতিরেকে,এ সম্বন্ধে আমাদিগের বাসনা চরিতার্থ করিবার কোনরূপ সম্বল নাই।

কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে উন্নতবুদ্ধি জ্ঞানিগণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে রাজা বা সেনানীর জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস নহে। ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যাবলী ইতিহাসের পটে অল্পস্থান মাত্র অধিকার করিতে পারে, সমাজের পরিবর্ত্তন প্রদর্শনই ইতিহাসের প্রকৃত বিষয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রে রাজা অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের প্রাধান্য। লোকের রীতি, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প, শাস্ত্র, কৃষি, বাণিজ্য ধন, বল প্রভৃতি কালে কালে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের এরূপ ইতিহাস লিখিবার উপকরণ নাই আমরা মনে করি না। প্রথমতঃ আমাদিগের মন্ত্রময় ঋগ্বেদ আছে, ইহা হইতে তাৎকালিক সমাজের অবস্থা জানিতে পারা যায়। সে অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। তৎকালে আর্য্য দস্যু দুইবর্ণের সংগ্রাম চলিতেছিল। আর্য্যেরা শুক্লবর্ণ, দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ। আর্য্যেরা সপ্তসিন্ধু প্রদেশ (পঞ্জাব) অধিকার করিয়া গঙ্গা যমুনা ও সরযূ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গ্রাম এবং পুর বা নগরে বাস করিতেন। কোন কোন পুর শতভুজী, প্রস্তরনির্ম্মিত বা লৌহময় বলিয়া বর্ণিত। সমাজে কার্য্যবিভাগ দাঁড়াইয়াছিল। অধিকাংশ লোকে কৃষিকার্য্য করিত, অনেকে বাণিজ্য ব্যবসায় করিত, কতকগুলি যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিল, কতকগুলি দেবপূজাদি করিত। কিন্তু ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য হইত না। রাজা সমাজপতি ছিলেন। রাজাদিগের বেশভূষার ও আবাসস্থানের বিলক্ষণ জাঁকজমক ছিল। সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট ও সহস্রতোরণশোভিত রাজপ্রাসাদ ও বহুচরপরিবেষ্টিত স্বর্ণবর্ম্মি

ধারী রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়; ইহার মধ্যে কবিকল্পনা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার মূলস্বরূপ অনেকটা সত্য আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের শাসন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন পুরে ও গ্রামে পুরপতি ও গ্রামণী নিযুক্ত ছিল। দেবপূজক পুরোহিতদিগের বিশেষ সম্মান দেখা যায়। কোন কোন রাজা তাহাদিগকে বহুসংখ্যক গো, অশ্ব, রথ ও স্বর্ণ দান করিতেন। বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল, এমন কি সমুদ্রপথে যাতায়াতের বর্ণনা পাওয়া যায়, এবং জানা যায় যে এই কার্য্যে শতদাঁড়বিশিষ্ট নৌকা (শতারিত্রাম্ নাবম্) নিযুক্ত হইত। সূত্রধর, ভিষক্, পুরোহিত, কর্ম্মকার, কবি, নর্ত্তকী, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ের উল্লেখ লক্ষিত হয়। যব ও ধান্যের চাষ হইত, এবং কৃষিকার্য্যের উপকারিতা এতদূর অনুভূত হইয়াছিল যে বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করিবার নিমিত্ত কুল্যা অর্থাৎ খালও খনিত হইত। পালিত পশুমধ্যে অশ্ব, হস্তী, গো, মহিষ, মেষ, উষ্ট্র, কুক্কুর প্রভৃতি ছিল। আর্য্যগণ চিত্তোন্মাদক সোমরস বা সুরা পান করিতেন, গোমেধ, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিতেন, এবং বিলক্ষণ মাংসাশী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, পতির পরলোকান্তে বিধবা দেবরকে বিবাহ করিতে পারিতেন; এবং সুন্দরী মহিলামণ্ডলী স্বয়ংবরা হইতে পারিতেন। দাম্পত্যবিধির উল্লংঘনের কথাও মাঝে মাঝে শুনা যায়। স্ত্রীলোকের বেশবিন্যাস ও হিরণ্ময় আভরণে আনুরক্তি ছিল। পুরুষেরা দ্যূতক্রীড়া ভাল বাসিতেন। নৃত্যগীতেও তাঁহাদের আমোদ ছিল, এবং যুদ্ধ করিতেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহারা ধ্বজা উড়াইয়া সেনানীর অধীনে যুদ্ধে যাইতেন। যোদ্ধদিগের মধ্যে রথীরাই প্রধান ছিলেন। ইহারা অশ্বযোজিত রথে চড়িয়া, দেহ বর্ম্মে ঢাকিয়া, ধনুর্ব্বাণ্ হস্তে অগ্রসর হইতেন, এবং বাণী (ভল্ল), অসি, পরশু প্রভৃতি অস্ত্রও ব্যবহার করিতেন। আর্য্যেরা ইন্দ্র বা বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, ঊষা, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিতেন, এবং তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন কোন কোন ঋষি বুঝিয়াছিলেন যে সকল দেবতাই এক। তাঁহারা কৌশলময়ী ও ভাবপূর্ণা কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, এবং তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রেও কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঋক্ষ প্রভৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ জানিতেন, এবং মলমাস দ্বারা সৌর ও চান্দ্র বৎসরের সামঞ্জস্য করিতে শিখিয়াছিলেন। যে দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদিগের সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহারাও নিতান্ত অসভ্য ছিল না। যদিও তাহারা অ-ইন্দ্র, অব্রত, কৃষ্ণবর্ণ ও লিঙ্গোপাসক বলিয়া তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ আছে, তথাপি তাহাদিগের পরাক্রম ও উন্নতাবস্থার আভাস পাওয়া

যায়। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তরনির্ম্মিত বহুপুরের অধিপতি ছিল, এবং আর্য্যগণকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

কোন্ দেবতাকে তুষ্ট করিতে কি উদ্দেশে কোন্ যজ্ঞ করিতে হইবে এবং কোন্ সময়ে কি প্রকারে ঋগ্বেদের কোন্ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাপার ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এই সময়ে চতুর্ব্বর্ণভেদ ও ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়: এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের অতি সূক্ষ্ম নিয়ম হওয়াতে কিছু উপকার হয়। শুভক্ষণ বাছিয়া যজ্ঞ করিতে গিয়া জ্যোতির্বিদ্যার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন আকারের বেদী নির্দ্ধারিত হওয়াতে নিশ্চিত ফল প্রত্যাশায় জ্যামিতি ও গণিতের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। স্বরসংযোগে বেদগান করিতে গিয়া সঙ্গীতের আলোচনা বৃদ্ধি হয়। অর্থ বুঝিয়া বেদপাঠ করিতে গিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রের মূলপত্তন হয়। এ দিকে কর্ম্মকাণ্ডের বাড়াবাড়ী হওয়াতে গভীর চিন্তাশীল উপনিষৎকারগণ জ্ঞান পথে মোক্ষলাভের উপায় দেখিতে আরম্ভ করেন।

কল্পসূত্র ও স্মৃতিতে কর্ম্মকাণ্ডের এবং দর্শনে জ্ঞানকাণ্ডের বিস্তার; আর ক্ষত্রিয় শূরগণের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ যে সকল গাথায় গীত হইয়া বহুকাল হইতে জনসমাজের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছিল, সেই সকল গাথা হইতে রামায়ণ ও মহাভারতের উৎপত্তি। এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশের অবস্থা অনেক দূর জানা যায়। তৎকালে প্রায় সমুদয় আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যদিগের অধিকৃত হইয়াছে, দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে তাঁহাদিগের রাজ্য বিস্তার ঘটিয়াছে এবং অন্যান্য স্থানের বিষয় কিছু কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছে। অনার্য্যজাতীয় অনেক লোক আর্য্যসমাজের নিম্নদেশে স্থান পাইয়াছে, এবং [illegible] আর্য্যধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] বেদে সূর্য্যের নামান্তর বলিয়া [illegible] উপাসনার বিষয় ছিলেন, তিনি এখন একটী প্রধান উপাস্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যে রুদ্র বায়ু বা অগ্নির প্রচণ্ড মূর্ত্তিরূপে কখন কখন পূজিত হইতেন, তিনি লিঙ্গরূপী বলিয়া প্রাপ্ত হইয়া অতি উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন। সমাজের শ্রেণীবন্ধন পাকাপাকী হইয়াছে, এবং জ্ঞানীরা তাহা ছেদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ সময়ে বুদ্ধদেবের উৎপত্তি। তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাতে বাহ্য কার্য্য অপেক্ষা চরিত্রের উন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়ে, এবং তাঁহার অহিংসাবাদ প্রভাবে বহুব্যয়ী বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের স্রোত অনেক দূর কমিয়া যায়।

বৌদ্ধদিগের সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে থাকে; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মগধে যৎকালে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকাল পর্য্যন্ত

বৌদ্ধেরা প্রবল হইতে পারে নাই। চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সুবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী গ্রীক্ বীর আলেক্জাণ্ডর পঞ্জাবপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। অনন্তর আলেক্জাণ্ডরের মৃত্যু হইলে পর তদীয় সেনানী সেলুকস আসিয়ার পশ্চিম বিভাগের অধিপতি হইয়া ভারতবর্ষ পুনরাক্রমণ করেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া প্রস্থান করেন। সেলুকস চন্দ্রগুপ্তকে একটি কন্যাদান করেন, এবং তাঁহার সভায় মেগাস্থিনিস্ নামক একজন দূত পাঠান। মেগাস্থিনিস্ অনেক দিন পাটলীপুত্রনগরে ছিলেন, এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখেন। এই গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই, কিন্তু আরিয়ান (Arrian) এবং দিওদোরস (Diodorus) ইহার যে চুম্বক লিখিয়াছেন, তাহা পাওয়া যায়, এবং স্ত্রাবো (Strabo), প্লিনী (Pliny) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রোমক গ্রন্থকারদিগের লেখাতেও স্থানে স্থানে মেগাস্থিনিসের বর্ণনা উদ্ধৃত আছে। ডাক্তার শ্বানবেক্ নামক একজন জর্ম্মন গ্রন্থকার এই সকল একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং পাটনা কালেজের অধ্যক্ষ ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেব তাহাদিগের ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ অবলম্বন করিয়া আমরা চন্দ্রগুপ্তের সময়ের ভারতবর্ষের একটী চিত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। মেগাস্থিনিস খ্রীষ্ট জন্মিবার আন্দাজ ৩০২ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ছিলেন।

মেগাস্থিনিস বলেন ভারতবর্ষবাসীরা কখনও অন্যদেশ আক্রমণ করেন নাই, এবং আলেক্জণ্ডরের পূর্ব্বে আর কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করে নাই। পারসীকেরা ভারতবর্ষের কিয়দংশ হস্তগত করিয়াছিল, এরূপ কথা আছে। সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থিত প্রদেশের অনেকাংশ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। আরিয়ানের ভারতবিবরণ * হইতে জানা যায় যে এই প্রদেশে হিন্দুজাতীয় লোকের বসতি ছিল, এবং তাহারা পারসীকদিগের অধীন হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে কর দিত। কিন্তু তাঁহার মতে সিন্ধুনদই ভারতবর্ষের প্রকৃত পশ্চিম সীমা। হিন্দুদিগের সিন্ধুনদ পার হইতে নাই, এই প্রাচীন প্রবাদ দ্বারাও এই মতের সমর্থন হইতেছে। মহাভারতের সময়ে গান্ধার অর্থাৎ বর্ত্তমান কাণ্ডাহার ভারতবর্ষের অংশ বলিয়া গৃহীত হইত, কিন্তু গ্রীকগ্রন্থকারদিগের লেখা দেখিয়া জানা যাইতেছে যে, চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বেই হিন্দুরা সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশকে বিদেশ বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত দেখেন। এইরূপ চিরকালই দেখা যায়, এবং ইহাতেই

* The Indica of Arrian Section I.

কস্মিন্‌কালে সমগ্র ভারতবর্ষের একতাবন্ধন হয় নাই। যদি কোন ভূপতি কখনও প্রবল হইতেন, তিনি মহারাজাধিরাজ, রাজচক্রবর্ত্তী বা সম্রাট্ বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু তিনি বিজিত-রাজাদিগের নিকটে কর পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, আভ্যন্তরিক শাসনকার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং যদি পরাক্রান্ত উত্তরাধিকারী রাখিয়া না যাইতে পারিতেন, তাঁহার পরলোকান্তে সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। মেগাস্থিনিসের সময়ে চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ ছিলেন; তৎপৌত্র অশোকবর্দ্ধন তদপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য উপভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানদিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে এদেশীয় কোন রাজবংশেই বিস্তৃত সাম্রাজ্য বহুকাল স্থায়ী হয় নাই।

ভারতবর্ষের নগর অসংখ্য বলিয়া বর্ণিত। যে সকল নগর নদীতীরে বা সাগরোপকূলে অবস্থিত; সে সকল প্রায় কাষ্ঠনির্ম্মিত; যে সকল পাহাড় বা উচ্চ স্থলে অবস্থিত; সে সকল ইষ্টক ও মৃত্তিকানির্ম্মিত। মেগাস্থিনিসের সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগর পাটলীপুত্র প্রাচ্য রাজ্যে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহ (অর্থাৎ শোণ) এই দুইয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। ইহার বসতি দৈর্ঘ্যে আট মাইল ও প্রস্থে দেড় মাইল ছিল। সমুদয় নগর বেড়িয়া একটী গড় খাত ছিল, চারিশত হাত পরিসর ও ত্রিশহাত গভীর। ইহার পরে চৌষট্টী তোরণবিশিষ্ট এবং পাঁচ শত সত্তর বুরুজ (Tower) সজ্জিত প্রাচীর।

মেগাস্থিনিসের মতে ভারতবর্ষবাসীরা সাত শ্রেণীতে বিভক্ত, ... মর্য্যাদায় সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ববিদ্‌গণ (Philosophers)। তাঁহারা যাগযজ্ঞে লোকের সাহায্য করেন, এবং প্রতি বৎসরের প্রারম্ভে রাজাদিগের কর্তৃক মহাসভায় আহূত হন। তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ কোন হিতকর প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন, অথবা শস্য, পশুপালন বা সাধারণের উপকারসাধন সম্বন্ধে কোন উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা তিনি এই সভায় সর্ব্বসাধারণসমক্ষে প্রকাশ করেন। যদি কেহ তিনবার মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সাব্যস্ত হন, তাঁহাকে যাবজ্জীবন মৌনী হইয়া থাকিতে হইবে, এইরূপ দণ্ড দেওয়া হয়, আর যিনি প্রামাণিক কথা বলেন, তিনি করভার হইতে অব্যাহতি পান।

মেগাস্থিনিস্ বলেন যে তত্ত্ববিদ্‌গণ দুই দলে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ। ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা মান্য, কারণ তাহাদিগের মতের অধিকতর সঙ্গতি আছে। গর্ভ হইতেই তাহাদিগের প্রতি বিদ্বজ্জনের যত্ন আরম্ভ হয়; এবং বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহারা উত্তরোত্তর সদ্‌গুণসম্পন্ন শিক্ষকের হস্তে পড়ে। তাহারা নগরের বাহিরে পরিমিত আয়তনের উপবনে বাস করে। তাহারা কুশাসনে বা মৃগচর্ম্মে শয়ন করে। তাহারা মাং-

আহার ও ইন্দ্রিয়সুখ হইতে বিরত থাকে এবং সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়া ও জ্ঞান দান দিয়া সময় অতিবাহিত করে। এই রূপে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স্ কাটাইয়া, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও জীবনের অবশিষ্টাংশ সুখস্বচ্ছন্দে যাপন করে। তখন তাহারা চিক্কণ কার্পাস বস্ত্র পরিধান করে এবং অঙ্গুলে ও কর্ণেও স্বর্ণ-ভূষণ ধারণ করে, মাংস খায়, কিন্তু শ্রমসহায় জীবের নহে; এবং অধিকসংখ্যক সন্তানের আশায় যত ইচ্ছা তত বিবাহ করে।

পাঠকেরা দেখিবেন যে মেগাস্থিনিস হিন্দু সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শ্রমণদিগকেই অধিকতর শ্রদ্ধাস্পদ বলিয়া জানিতেন। ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধেও তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রমের ভেদ বুঝিতে পারেন নাই। যে ব্যক্তি সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে গার্হস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিল, সে যে পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ করিয়া নগরবহিঃস্থ উপবন আশ্রয় করিবে, তিনি এরূপ অনুসন্ধান রাখিতেন না। আর সকলেই যে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিত এরূপ বোধ হয় না। মনুর ব্যবস্থানুসারে ছত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের শেষ সীমা। ইহাকে মেগাস্থিনিস সাধারণ নিয়ম ভাবিয়াছিলেন।

মেগাস্থিনিস বলেন যে ব্রাহ্মণেরা এই ভাবিয়া স্ত্রীলোকদিগকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করিত না যে পাছে তাহারা গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করে, বা জ্ঞানলাভ করিয়া পরাধীন থাকিতে না চায়। মৃত্যুসম্বন্ধে তাহারা সর্ব্বদা কথোপকথন করিত। তাহাদিগের মতে এ জীবন গর্ভাবস্থাতুল্য এবং মৃত্যু তত্ত্ববিদদিগের পক্ষে প্রকৃত ও সুখময় জীবনপ্রাপ্তিরূপ জন্ম। তাহাদিগের বিবেচনায় যাহা কিছু মনুষ্যের ঘটে ভাল বা মন্দ নহে, অন্যরূপ ভাবা স্বপ্নবৎ মায়া, কারণ একই পদার্থ হইতে কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং একব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাব উদ্ভূত হয়। নৈসর্গিক ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদিগের গ্রীক্‌দিগের ন্যায় মত দেখা যায়। তাহারা বলে যে জগতের উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে, ইহার আকার গোল,এবং যে ঈশ্বর ইহার স্রষ্টা ও পাতা তিনি ইহার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। তাহাদিগের মতে বিশ্বমণ্ডলে অনেক ভূতের কার্য্য লক্ষিত হয়, এবং জলদ্বারা জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল। চারি ভূতে তাহারা আর একটি ভূত (অর্থাৎ আকাশ) যোগ করে, উহা হইতেই স্বর্গ ও তারকারাজী নির্ম্মিত। আত্মার উৎপত্তি ও প্রকৃতি এবং অন্যান্য অনেক বিষয় সম্বন্ধে, তাহাদিগের মত গ্রীক্‌দিগের সদৃশ। আত্মার অমরতা, ভবিষ্যৎ বিচার, এবং ঈদৃশ বিষয়ে, তাহারা প্লেটোর ন্যায় আপনাদিগের মত গল্পচ্ছটায় নিবদ্ধ রাখে।

শ্রমণদিগকে মেগাস্থিনিস দুই দলে বিভক্ত করিয়াছেন। একদল বনে বাস করিত, পত্র ও ফল আহার করিত, গাছের বাকল পরিত, মদ্য ও ইন্দ্রিয়সুখ হইতে বিরত থাকিত। কোন বিষয়ের কারণ জানিতে ইচ্ছা হইলে রাজারা তাহাদিগের নিকটে দূত পাঠাইত। অন্যদল ভিষক্। তাহারা যদিও বনবাসী নহে, তথাপি মিতাচারী। তাহাদিগের খাদ্য ভাত বা যবের মণ্ড, উহা যেখানে চায় অথবা যেখানে অতিথি হয়, সেইখানেই পায়। তাহাদিগের ঔষধের গুণে লোকের সন্তান হয়, এমন কি, পুত্র কি কন্যা হইবে, তাহাও স্থির হয়। তাহারা ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথ্যের নিয়ম করিয়া রোগ আরাম করে। তাহারা তৈল ও প্রলেপকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ জ্ঞান করে।

প্রথম দলের শ্রমণদিগের আচরণ বানপ্রস্থ হিন্দুদিগের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, ইহাতে বোধ হইতে পারে যে হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে আচারগত কোনরূপ বিশেষ বৈলক্ষণ্য ছিল না, অথবা মেগাস্থিনিস উভয়ের বিভেদ ভাল করিয়া জানিতেন না। শ্রমণ ভিষক্গণ যে প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেন, অদ্যাপি ভারতবর্ষে সেই প্রণালীই চলিতেছে। ইহাতে অনুমান হয় যে প্রচলিত চিকিৎসাপ্রণালী চন্দ্রগুপ্তেরও পূর্ব্বে এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস যাদৃশ দার্শনিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বেদান্তের আভাস স্পষ্ট প্রতীত হয়।

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষবাসীদিগকে যে সাতশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কৃষকেরা দ্বিতীয়শ্রেণী। দেশের অধিকাংশ লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা ধীর ও নম্রস্বভাব। ইহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না। যুদ্ধকালেও ইহাদিগের চাষের ব্যাঘাত হয় না। যেখানে দুইদলে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, তাহার নিকটেই কৃষকদিগকে নিরাপদে ভূমি কর্ষণ করিতে দেখা যায়। রাজাই ভূস্বামী, কৃষকেরা উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ পায়।

তৃতীয় শ্রেণী গোপাল ও শিকারী। ইহারা শিকার করে, পশুপালন করে, পশু বিক্রয় করে, ইত্যাদি। ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। চতুর্থশ্রেণী কারুকর ও বাণিজ্যব্যবসায়ী। ইহাদিগের রাজকর দিতে হয়। কিন্তু যাহারা যুদ্ধাস্ত্র ও জাহাজ নির্ম্মাণ করে, তাহারা রাজার নিকট হইতে বেতন পায়। পঞ্চম শ্রেণী যোদ্ধা। ইহারা সংখ্যায় কেবল কৃষকদিগের অপেক্ষা কম। রাজকোষ হইতে ইহাদিগের ভরণপোষণ হয়, এবং যুদ্ধের উপকরণ ইহারা রাজসংসার হইতে পায়। এজন্য যখন আবশ্যক হয়, তখনই ইহারা সমরাঙ্গণে নামিতে প্রস্তুত। শান্তির সময়ে তাহারা সুরাপানাদি করিয়া আমোদ প্রমোদে কালযাপন করে। ষষ্ঠ শ্রেণী চর, ইহারা

সকল বিষয়ে রাজাকে গোপনে সংবাদ দেয়। সপ্তমশ্রেণী মন্ত্রিবর্গ। বিচারাসন, রাজকীয় উচ্চ উচ্চ পদ, এবং সাধারণ শাসনকার্য্য ইহাদিগের হস্তে, এবং ইহাদিগের দ্বারাই শাসনকর্ত্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনানী প্রভৃতি নির্ব্বাচিত হয়। একশ্রেণীর লোকের সহিত অন্যশ্রেণীর লোকের বিবাহ হয় না। একশ্রেণীর লোক অন্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না, বা অন্যশ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না। কেবল যে সে শ্রেণীর লোক তত্ত্ববিৎ হইতে পারে।

এই শ্রেণীবিভাগ দেখিয়া বোধ হয় যে ব্যবসায়ের সহিত জাতির প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া মেগাস্থিনিস কয়েকটি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণদিগকে ও জাতিভেদরহিত শ্রমণদিগকে এক তত্ত্ববিৎশ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বজাতীয় লোক শ্রমণ হইতে পারিত বলিয়া যে সে শ্রেণীর লোক তত্ত্ববিৎ হইতে পারিত লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে চর ও মন্ত্রিবর্গ ব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্তর্গত। জ্ঞানচর্চ্চা তাহাদিগের ব্যবসা নহে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণদলের লোক বলিয়া জানিতে পারেন নাই। এই কয়েকটী ভ্রম সংশোধন করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে মনু হিন্দুসমাজের যেরূপ শ্রেণীবন্ধনের বর্ণনা করিয়াছেন, মেগাস্থিনিসের সময়ে প্রায় সেইরূপই ছিল। কৃষকেরা শূদ্র; কারুকর ও ব্যবসায়ীরা বৈশ্য, যোদ্ধারা ক্ষত্রিয়; চর, মন্ত্রীবর্গ ও তত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ, শিকারীরা চণ্ডালাদি নীচজাতি। মেগাস্থিনিস চমৎকৃত হইয়া লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষবাসীরা সকলেই স্বাধীন, কেহই দাস নহে।* ইহাতে বোধ হয় যে মনুর সময়ে শূদ্রদিগের যেপ্রকার অবস্থা ছিল, মেগাস্থিনিসের সময়ে তাহার অনেক পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছিল। অন্যজাতির দাসত্ব করা আর তাহাদিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদিগের বিবেচনায় তাহারাই কৃষকশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল।

মেগাস্থিনিস এতদ্দেশীয় লোকদিগকে কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা একখানি নিম্নবাস পরিতেন, উহা হাঁটুর নীচে কিছুদূর পর্য্যন্ত পড়িত, এবং আর একখানি উত্তরীয় কতক কাঁধে ফেলিতেন, কতক মাথায় জড়াইতেন। আমাদের বর্ত্তমান ধুতীচাদর এই পোষাক বলিলেই হয়; তবে কি না আমরা চাদর হইতে মাথাটা ছাড়াইয়া লইয়াছি, এবং প্রয়োজনমত অন্যরূপ শিরস্ত্রাণ এবং কাটা কাপড় পরিতে শিখিয়াছি।

কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সময়েও যাহাদিগের অবস্থা ভাল ছিল, তাহাদিগের পোষাকের জাঁকজমক ছিল। লিখিত আছে,

* Arrian's Indica Sec. X.

তাহারা বেশভূষা ভালবাসে। তাহাদিগের পোষাক স্বর্ণজড়িত ও মনিমাণিক্য খচিত, এবং তাহারা সুচিক্কণ ফুলকাটা বস্ত্র পরিধান করে। অনুগমনকারী অনুচরবর্গ তাহাদিগের মস্তকের উপর ছত্রধারণ করে, কারণ তাহারা সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত আদর করে, এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পায়।

রুচিভেদে তাহারা দাড়ির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রং করিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই আতপত্র ব্যবহার করিত। তাহারা শ্বেতচর্ম্মের পাদুকা পায়ে দিত, পাদুকাগুলি চিত্র বিচিত্র ও উচ্চখুরবিশিষ্ট ছিল।*

সাধারণ লোকে উষ্ট্রে, অশ্বে ও গর্দ্দভে চড়িত; রাজা এবং ঐশ্বর্য্যশালী লোকে হস্তীতে আরোহণ করিত। বাহনের মধ্যে গজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত, তাহার নীচে চতুরশ্বযুক্ত রথ, তৎপরে উষ্ট্র; এবং একাশ্বযানে চড়া কোনরূপ সম্ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হইত না।† বর্ত্তমান এক্কা বোধ হয় এই একাশ্বযানের প্রতিনিধি।

মেগাস্থিনিসের সময়ে ভারতবর্ষীয় পদাতিগণ সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিত। ধনুক মানুষসমান এবং বাণ প্রায় তিন গজ লম্বা। মাটীতে ধনুক স্থাপন করিয়া বামপদদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া তাহারা বাণত্যাগ করিত,—এবং এমন কোনরূপ ঢাল বা কবচ ছিল না যাহা সে বাণে ভিন্ন হইত না। পদাতিকদিগের বামহস্তে গোচর্ম্মের ঢাল থাকিত। কেহ কেহ ধনুকের পরিবর্ত্তে বর্শা ব্যবহার করিত, কিন্তু সকলেই অসিধারণ করিত। অসি তিনহাতের অধিক লম্বা হইত না, এবং অত্যন্ত কাছাকাছি যুদ্ধ করিতে হইলে উহা দ্বিহস্তদ্বারা সঞ্চালিত হইত। অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ চর্ম্ম ও দুইগাছা বর্শা ব্যবহার করিত। তাহাদিগের জিন ছিল না, লৌহ বা পিত্তলের কাঁটাবিশিষ্ট চর্ম্মের লাগামদ্বারা অশ্বসঞ্চালনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।‡ রথে সারথী ছাড়া দুইজন রথী থাকিত, এবং মাতঙ্গে মাহুত ছাড়া তিনজন যোদ্ধা থাকিত।

মেগাস্থিনিস ভারতবাসীদিগকে মিতাচারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদিগের খাদ্য সাধারণতঃ ভাত, যজ্ঞভিন্ন তাহারা মদ্য ব্যবহার করিত না। চৌর্য্য তাহাদিগের মধ্যে অল্পই হইত। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে চারিলক্ষ লোক ছিল, কিন্তু প্রতিদিন তথায় দেড় শত টাকার অধিক চুরি হইত না। লোকে মামলা মোকর্দ্দমা কদাচ করিত। দলিল বা সাক্ষী না রাখিয়া কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অন্যের নিকটে কিছু বন্ধক বা গচ্ছিত রাখিতে সঙ্কুচিত হইত না। তাহারা সচরাচর গৃহ ও

* Arrian's Indica Sec XVI.

† Arrian's Indica Sec. XVI.

‡ Arrian's Indica Sec. XVI.

সম্প্রতি অবক্ষিত অবস্থায়ই বাখিত। তাহাবা সত্য ও ধর্ম্মের আদব করিত। এজন্য বৃদ্ধলোক জ্ঞানী না হইলে কোন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইত না। তাহাবা অনেক স্ত্রী ক্রয় কবিয়া বিবাহ কবিত, কাহাকে ধর্ম্মপত্নী এবং কাহাকে বা কাম পত্নী কবিত। কোন পণ না দিয়া বা না লইয়াও অনেকে বিবাহ কবিত, একপস্থলে পিতা কন্যাকে সাধাবণসমক্ষে উপস্থিত কবিতেন, এবং যে ব্যক্তি মল্লযুদ্ধে বা অন্য কোনরূপ শক্তিপ্রকাশ কার্য্যে বিজয়ী হইতেন, তিনিই কন্যাব পাণিগ্রহন কবিতেন।* ইহা আমাদিগেব দেশেব পুবাতন স্বয়ংবরা। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে এদেশে লিখিত আইন ছিল না। বোধ হয় এতদ্দেশীয় ব্যবস্থা গ্রন্থেব নাম স্মৃতি শুনিয়া তাঁহার এইরূপ ভ্রম জন্মিয়াছিল।

বাজা যুদ্ধের সময়ে এবং বিচাবকালে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেন, এবং বিচাব কবিতে গিয়া তিনি সারাদিন বিচাবালয়ে থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন যজ্ঞ ও মৃগয়া কবিতেও তিনি বাহিব হইতেন। বাজাব শবীববক্ষিণী রমণীদল ছিল, মৃগয়াকালে তাহাবা তাঁহাকে ঘেবিযা যাইত। শবীরবক্ষিনীবা কেহ বথে, কেহ অশ্বে, কেহ গজে, সর্ব্বপ্রকাব অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উঠিত, এবং বাজা হস্তীতে চডিয়া যাইতেন।

দুইটী দেবতাব উপাসনাব বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়, সমতলপ্রদেশে বিশেষতঃ মথুবাব নিকটে হিবাক্লিসেব, এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে দিওনিসুসেব। হিবাক্লিশ বোধ হয় আমাদিগেব অদ্ভুত কীর্ত্তিশালী কৃষ্ণ, এবং দিওনিসুস প্রমত্ত মহাদেব।

কমলাকান্তের পত্র।

বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব।

মহাশয়! আপনাকে পত্র লিখিব কি —লিখিবাব অনেক শত্রু। আমি এখন যে কুঁড়ে ঘবে বাস কবি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই তিন ফুলগাছ পুঁতিয়াছি। মনে কবিয়াছিলাম কমলাকান্তের কেহ নাই—এই ফুল গুলি আমাব সখা সখী হইবে। খোষামোদ কবিয়া ইহাদেব ফুটাইতে হইবে না— টাকা ছড়াইতে হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, মন যোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না, আপনাব সুখে উহাবা আপনি ফুটিবে। উহাদের হাসি আছে—কান্না নাই, আমোদ আছে—রাগ নাই। মনে করিলাম যদি প্রসন্ন গোয়ালিনী

* Arrian's Indica Sec. XVII

গিয়াছে তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব।

তা, ফুল ফুটিল—তারা হাসিল। মনে করিলাম—মহাশয় গো! কিছু মনে করিতে না করিতে, ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল,—লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা বোল্‌তা মৌমাছি—বহুবিধ রসক্ষেপা রসিকের দল, আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন গুণ্ গুণ্ ভন্ ভন্ ঝন্ ঝন্ ঘ্যান্ ঘ্যান করিয়া হাড় জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম, যে হে মহাশয়গণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশান, লীগ, সোসাইটি, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে—কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান ঘ্যান করিতে হয় অন্যত্র গমন করুন—আমি কোন বিজ্‌নিউশ্যনই দ্বিতীয়িত করিতে প্রস্তুত নহি, আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। গুণ গুণের দল, তাহাতে কোনমতে সম্মত নহে—বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটীরের ভিতর জমা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই মাত্র আপনাকে এক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম—(আফিঙ্গ ফুরাইয়াছে)—এমত সময়ে এক ভ্রমর—কুচকুচে কালো, আসল বৃন্দাবনী কালাচাঁদ, ভোঁ করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কাণের কাছে ঘ্যান ঘ্যান আরম্ভ করিলেন—লিখিব কি মহাশয়?

ভ্রমর বাবাজি নিশ্চিত মনে করেন তিনি বড় সুরসিক—বড় সমজ্দার—তাঁহার ঘ্যান্ ঘ্যানানিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া যাইবে। আমারই ফুলগাছের ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া আসিয়া আমারই কাণের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্? আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল, আমি তালবৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্রগতিতে তালবৃন্তাস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম, ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাড্ডীন প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল দেখাইতে লাগিল। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—দপ্তর মুক্তাবলীর প্রণেতা, আমি কখনই ক্ষুদ্রবীর্য্য নহি। কিন্তু হায় মনুষ্যবীর্য্য! তুমি অতি অসার! তুমি চিরদিন মনুষ্যকে প্রতারিত করিয়া শেষ আপন অসারতা প্রমাণিত কর! তুমি ক্যানার ক্ষেত্রে হানিবলকে, পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওয়াটর্লুর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে, এবং আজি এই ভ্রমর-সমরে কমলাকান্তকে বঞ্চিত করিলে! আমি যত পাখা ঘুরাইয়া বায়ু সৃষ্টি করিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে লাগিলাম ততই সে দুরাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মাথামুণ্ড বেড়িয়া বেড়িয়া ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। কখনও সে আমার বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, মেঘের আড়াল হইতে ইন্দ্রজিতের ন্যায় রণ করিতে লাগিল, কখনও কুম্ভকর্ণ নিপাতী রামসৈন্যের ন্যায় আমার বগলের নীচে দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল, কখনও

স্যাম্পসনের ন্যায় শিরোরুহমধ্যে আমার বীর্য্য সংন্যস্ত মনে করিয়া, আমার নীরদ-নিন্দিত কুঞ্চিতকেশদামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভেরী বাজাইতে লাগিল। তখন দংশনভয়ে অস্থির হইয়া আমি রণে ভঙ্গ দিলাম। ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। আমি সেই সময়ে চৌকাঠ পায়ে বাঁধিয়া—পপাত ধরণীতলে।!। এই সংসারসমরে মহারথী শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—যিনি দারিদ্র্য, চিরকৌমার এবং অহিফেণ প্রভৃতির দ্বারাও কখন পরাজিত হয়েন নাই—হায়! তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। যুক্ত করে বলিলাম "হে দ্বিরেফসত্তম! কোন্ অপরাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে তুমি তাহার লেখা পড়ার ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ? দেখ, আমি এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখিতে বসিয়াছি—পত্র লিখিলে আফিঙ্গ আসিবে—তুমি কেন ঘ্যান্ ঘ্যান করিয়া তাহার বিঘ্ন কর?" আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতেছিলাম —তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম—"হে ভৃঙ্গ! হে অনঙ্গরঙ্গতরঙ্গবিক্ষেপকারিন্! হে দুর্দ্দান্তপাষণ্ডভণ্ডচিত্তলণ্ডভণ্ডকারিন্! হে উদ্যানবিহারিন্—কেন তুমি ঘ্যান ঘ্যান করিতেছ? হে ভৃঙ্গ! হে দ্বিরেফ! হে ষটপদ! হে অলে! হে ভ্রমর! হে ভোমরা! হে ভোঁ ভোঁ!—"

ভ্রমর ঝুপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল। তখন গুণ গুণ করিয়া গলা দুরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল—আমি অহিফেণ প্রসাদে সকলেরই কথা বুঝিতে পারি—আমি স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলাম।

ভৃঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্র! আমার উপর এত চোট কেন? আমি কি একাই ঘ্যান ঘেনে! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান ঘ্যান করিব না ত কি করিব? বাঙ্গালি হইয়া কে ঘ্যান ঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাঙ্গালির ঘ্যান ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে? তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেলভিডিয়রে ঘ্যান ঘ্যান আরম্ভ করিলেন। যিনি হইবেন ওম্মেদ রাখেন, তিনি গিয়া রাত্রিদিবা রাজদ্বারে ঘ্যান ঘ্যান করেন। যিনি কেবল একটী চাকরির উমেদওয়ার —তাঁর ঘ্যান ঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। বাঙ্গালি বাবু যিনিই দুই চারিটা ইংরেজি বোল শিখিয়াছেন তিনি অমনি উমেদাররূপে পরিণত হইয়া, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান ঘ্যান —ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, বসবার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে, দিনে, রাত্রে, প্রাহ্নে, অপরাহ্নে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে—ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান! যিনি উমেদওয়ারি ছাড়িয়া স্বাধীন হইয়া

উকীল হইলেন, তিনি আবার সনদী ঘ্যানঘ্যানে! সত্য মিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়া, যেখানে দে-খেন কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকারি জুজু বসিয়া আছে—বড় জজ, ছোট জজ, সবজজ, ডিপুটি মুন্সেফ—সেই খানে গিয়া সেই পেশাদার ঘ্যান-ঘেনে, ঘ্যান ঘ্যানানির মোহানা খুলিয়া দেন। কেহ বা মনে করেন ঘ্যান-ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যান ঘ্যান করিতে থাকেন। কোন দেশে বৃষ্টি হয় নাই—এসো বাপু ঘ্যান ঘ্যান করি; বড় চাকরি পাই না—এসো বাপু ঘ্যান ঘ্যান করি—রামশর্ম্মার মা মরিয়াছে—এসো বাপু স্মরণার্থ ঘ্যান ঘ্যান করি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না—তাঁরা কাগজ কলম লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে,দিন দিন ঘ্যান ঘ্যান করেন। আর তুমি যে বাপু আমার ঘ্যান ঘ্যানা-নিতে এত রাগ করিতেছ তুমিও কি করিতে বসিয়াছ? বঙ্গদর্শনসম্পাদকের কাছে কিছু আফিঙ্গের যোগাড় করিবে বলিয়া ঘ্যান ঘ্যান করিতে বসিয়াছ। আমার চোঁ বোঁই কি এত কটু?

তোমায় সত্য বলিতেছি কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যান ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ আমিও শুধু ঘ্যান ঘ্যান করি না—মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে—কেবল ঘ্যান ঘ্যান পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই—কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবারাত্রি ঘ্যানঘ্যান। একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মানুষ মরে না; আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত! স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্যে ইংরেজের কামান, আর আকাশমার্গে আমাদের হুল! সে যাক, মধু কর, কাজে মন দাও। নিতান্ত যদি দেখ, রসনাকণ্ডূয়ন রোগ জন্য কাজে মন যায় না—জীবে কাষ্টকি দিয়া ঘা কর—অগত্যা কাজে মন যাইতে পারে। আর শুধু ঘ্যান ঘ্যান ভাল লাগেনা।”

এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল।

আমি ভাবিলাম, যে এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ। শুনা আছে মনু-ষ্যের পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্য দ্বিপদ মনুষ্য হইতে চতুষ্পদ পশু—পক্ষান্তরে যে সকল মনু-ষ্যের পদবৃদ্ধি হইয়াছে—তাহারা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য। এই ষট্পদের—একখানি না দুখানি না—ছয় ছয় খানি পা! অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে—ইহার অসামান্য পদবৃদ্ধি দেখা যায়। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহে-

মন করি কি প্রকারে? অতএব আপাতত ঘ্যান ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম—কিন্তু মধু সংগ্রহের আশাটা রহিল। বঙ্গদর্শন পুষ্প হইতে অহিফেণ মধু সংগ্রহ হইবে এই ভরসায় প্রাণ ধারণ করে—

আপনার আজ্ঞাবহ

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সার সংগ্রহ। প্রথম খণ্ড। অর্থাৎ নানা গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থানের অনুকরণ অনুবাদ ও ভাব। শ্রীআবদুল হামিদ খাঁ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ময়মনসিংহ, ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য /১০ আনা মাত্র।

গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র, ২০ পৃষ্ঠা। ইহার অধিকাংশ ধর্ম্মবিষয়ক বাক্যাবলী। আর ৫ পৃষ্ঠা নীতিকথা। ধর্ম্মবিষয়ক সকল কথাগুলি আমরা বুঝিতে পারি নাই, তাহা সংগ্রহকারের দোষ কি আমাদের দোষ তাহা ঠিক বলিতে পারি না। ভরসা করিয়া বলা যায় না কিন্তু বোধ হয় কতকটা বিষয়ের দোষও আছে। এক স্থলে লিখিত হইয়াছে "হে ধার্ম্মিক! যদি তুমি ঈশ্বরের দ্বারে যাইতে চাও, তবে হীনতার অসি হাতে লইয়া, মান সম্ভ্রমের মস্তক ছেদন কর।" এ ধর্ম্ম উপদেশ সংগ্রহকার কোথা হইতে পাইলেন আমরা তাহা জানি না, মানসম্ভ্রম বিসর্জ্জন করিয়া হীনতা অবলম্বন করিলে যে কিরূপে লোকে ধার্ম্মিক হয় তাহা আমরা বুঝি না। চোর ডাকাতেরা মান সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়াছে অথচ তাহারা ঈশ্বরের দ্বারে যায় নাই ধার্ম্মিকও হয় নাই। আমরা জানিতাম যে মানসম্ভ্রম বরং ধর্ম্মের সহায়তা করে। মানী ও সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে অনেকে একান্ত ধর্ম্মভয়ে না হউক, আপনাদের মান ও সম্ভ্রমের ভয়েও, নীচ বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারেন না। তাহা পারেন না বলিয়া কি তাঁহাদের মান সম্ভ্রম ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে? যে ধর্ম্মাত্মা হইবে সে ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্মাচরণ করিবে, পাছে কেহ মান সম্ভ্রমের নিমিত্ত ধর্ম্মাচরণ করে এই ভয়ে কি মান সম্ভ্রমের মস্তকচ্ছেদ করিতে বলা হইয়াছে? নীতি কথাগুলি ভাল, বালকদের জানা উচিত।

ভগিনীবিলাপ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাঁ কর্ত্তৃক বিরচিত। গ্রন্থখানির মর্ম্ম এই যে এক গৃহস্থ আপন কন্যাকে এক অপাত্রে সম্প্রদান করেন, সম্প্রদানের পূর্ব্বে গৃহস্থ পাত্রের দোষ গুণ সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করেন নাই, পাত্রকে একবার

চক্ষেও দেখেন নাই। কাজেই সম্প্রদানান্তে গৃহস্থ কাঁদিলেন ঃ—

"না দেখি আপন চক্ষে
বিশ্বাসি পরের বাক্য
পিতা হয়ে কন্যাটিরে
সঁপিলাম দুঃখ নীরে
হায় মোর কেন হেন দুর্ম্মতি ঘটিল।"

কিন্তু আর কি হইবে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কন্যা পতির আলয়ে, সুখেই হউক দুঃখেই হউক, কালযাপন করিতে লাগিল। কিছু কাল পরে এক দিবস প্রাতে কন্যাটির দেহ এক পুষ্করিণীর জলে ভাসিয়া উঠিল। ভগিনীর মৃত্যু হওয়ায়, বিশেষতঃ অপঘাত মৃত্যু হওয়ায়, ভ্রাতা এই গ্রন্থে বিলাপ করিতেছেন। যদি এই বিলাপ প্রকৃত ঘটনামূলক হয় তবে ইহা মুদ্রাঙ্কন না করিলেই ভাল হইত। ইহা রুচিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ শোক পবিত্র, তাহা যত্নে গোপনে রাখাই ভাল। আপনার শোকের কথা মুদ্রিত করিয়া সকলের হাতে হাতে দিলে প্রথমেই বুঝায় যে তোমরা সকলে দেখ আমি কেমন শোক করিয়াছি। এস্থলে শোক অপেক্ষা বাহাদুরি অধিক দেখান হয়। গ্রন্থকার বলিতে পারেন বিলাপ দেখাইবার নিমিত্ত ভগিনীবিলাপ লিখিত হয় নাই, অন্য উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য বোধ হয় বাল্যবিবাহ প্রথাকে তিরস্কার করা। এবং সেই জন্য সমীরণ, বিহঙ্গ, স্রোতস্বতী, সুধাংশু, সুন্দরী, নিশাদেবী প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া কবি বলিতেছেন ;—

৩৭

"সন্ধ্যা সমীরণ। এই যে পরশ দানে,
তুষি'ছ তাপিত মন, সঞ্চালি' পল্লবগণ,
রাখ এক কথা, বলি ধরিয়া চরণে :
কুসুম সম্পদ হরি,' সৌরভে আমোদ করি,'
পশিবে জগতে যবে, সবার শ্রবণে
কৌমার বিবাহ গুণ, কহিও যতনে।

৩৮

ওহে বিহঙ্গমকুল, এই যে বসিয়া,
ধরি'ছ মধুর তান, কাড়িয়া লই'ছ প্রাণ,
কল্লোলিনী কল কল সাথে মিলাইয়া,
মোর এক কথা মান, যখন করিবা গান,
জাগাবে জগত জনে, করিয়া যতন,
কহিও সকলে, বাল্যবিবাহ কেমন।

৩৯

স্রোতস্বতি। ভুবনবাহিনি। তুমি যবে
আনি'দিবে ঘরে ঘরে,রত্নরাজি ভারে,ভারে,
বঙ্গবাসী জনে সবে যতনে কহিবে—
"তোদের দুর্দ্দশা যত, নিশ্চয় হইবে গত,
কৌমার বিবাহ প্রথা যদি দূর হয় ;
নতুবা মজিবে দেশ, নাহিক সংশয়।"

৪১

নিশা দেবি। অবশেষে নিবেদি তোমায়,
অসিত বরণে ঘন, করি' সব আবরণ,
পশিবে জগতে যবে, করি, তমোময় :
বঙ্গকাল কুলাঙ্গারে, কহিও যতন করে,'
"কৌমার বিবাহে হয়, বঙ্গ অন্ধকার";
প্রচার করিও সবে, এই সমাচার।"

যত দোষ কৌমার বিবাহের। পিতা অপাত্রে কন্যা দান করিলেন সে দোষ

বাল্যবিবাহের। পিতা বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র একবারে দেখিলেন না সে দোষ কৌমার বিবাহের। এ দোষারোপে একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িল। একজন বৃদ্ধ মুনসেফের একটী পুষ্করিণী ছিল, বাটীর অতি নিকটে বলিয়া তথায় তাঁহার সন্তানেরা স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে সর্ব্বদাই যাইত। ঘাটের নিকটে একটি চালিতা গাছ ছিল তথায় বসিয়া স্ত্রীলোকেরা কখন কখন বিশ্রাম করিত, চারি পার্শ্বে বালকেরা খেলিয়া বেড়াইত, এক দিন খেলাইতে খেলাইতে একটি শিশু জলে পড়িয়া গেল। তাহার শোকে মুনসেফ বড় অধীর হইলেন। কিছুকাল পরে আর একটি সন্তান সেই স্থানে আবার জলমগ্ন হয়। এই সম্বাদ মুনসেফ লোকমুখে শুনিলেন। ক্ষণেক পরে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন পুষ্করিণীর কোনদিকে সন্তান ডুবিয়াছে? ভৃত্য বলিল চালিতা তলার ঘাটে। বৃদ্ধ মুনসেফ রাগত ভাবে বলিলেন "সেই চালিতা তলায়! সেই চালিতা গাছ আমায় দুইবার দাগা দিল, এবার বাটী যাইব, চালিতা গাছ কাটিব, ঢেঁকি বনাইব, দুই পায়ে দলিব, তবে ছাড়িব।" চালিতা গাছের অপরাধ যেরূপ, বাল্যবিবাহের অপরাধ এ স্থলে সেইরূপ!

তত্ত্বদর্শন। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

প্রথমে গ্রন্থের নাম দেখিয়া আমাদের ভয় হইয়াছিল। কিন্তু পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া আর সে ভয় রহিল না, বরং অনেকটা আমোদ হইল। প্রথম ৩৫ পৃষ্ঠার রহস্য কিঞ্চিৎ বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে তত্ত্বদর্শনের মর্ম্ম বুঝা যাইবে।

গ্রন্থকার প্রথমেই লিখিতেছেন, "সন ১২৭১ অব্দে ৯ ভাদ্রে আমি একবার ঘোরতর ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে প্রায় আট দিবস পর্য্যন্ত আমার কলেবর দারুণ দুঃসহ যন্ত্রণায় দগ্ধ ও অস্থির হইয়াছিল, তদবস্থায় একজন সুচিকিৎসক বহুযত্নসহকারে নানা ঔষধ প্রয়োগে ঐ দুঃসহ যন্ত্রণা নিবৃত্তি করিলে পর নবম দিবসের প্রত্যূষে আমি নীরোগ মনুষ্যের ন্যায় শয়নাগারে শয্যোপরি শয়ন করিয়া রহিয়াছি, এমত সময় * * * সহসা দিব্যাকৃতি কোন যোষিৎ দেহনিঃসৃত তেজঃপুঞ্জে আমার অঙ্গ মুকুলিত, নেত্রযুগল প্রতিহত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আমি চকিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তিনি কোথা যাইলেন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না, কিন্তু যেরূপ পূর্ণশশধর উদয়াচলশিখরে উদিত হইলে তমস্বিনীর গাঢ় তমিস্রা অপসারিত হয় সেইরূপ সেই ত্রিভুবনবিমোহিনী কামিনীর ক্ষণপ্রভাসদৃশ প্রভাজালে আমার হৃদয়াকাশের সমুদয় মোহান্ধকার বিনষ্ট হইয়া যাইল, সহসা মোহাপগমে সুবিশদচিত্তে জগতের সমুদয় কার্য্যকারণতা

পরিস্ফূরিত হইতে লাগিল। তখন অদ্বৈতবাদ আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, জগৎ ব্রহ্মের ভেদ জ্ঞান অপনীত হওয়াতে আমি ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া পড়িলাম।"

কিঞ্চিৎ পরে গ্রন্থকার লিখিতেছেন "আমার বোধ হইল, আমি যেন পরব্রহ্মানন্দে লীন হইতেছি ও আমিই ব্রহ্ম নিশ্চয় জানিয়া,ব্রহ্ম কথা বলিতে বলিতে আমি নিস্তব্ধ মূর্চ্ছাগত হইলাম, সেই সময়ে আমার এইরূপ বোধ হইল যেন আমি একটি পাক ঘুরিয়া সূর্য্যমণ্ডলে সূর্য্যরূপে অবস্থিত হইয়াছি সমুদয় জগৎ আমার নয়নগোচরহইতে লাগিল। আমি যেন সর্ব্বভূতের বহিরন্তর ব্যাপী হইয়া রহিয়াছি, পদার্থ সকল অতি বিমল ও লোচনানন্দদায়ক, স্থানে স্থানে বিবিধ মধুরস্বরে আনন্দধ্বনি হইতেছে পশু পক্ষী জলচর প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাণী এই জগতে আছে যে সকল আমি,ভেদাভেদ কিছুই নাই। আমি ব্রহ্মানন্দময়, আমা ভিন্ন এই অনন্ত মহাবিশ্বে আর কিছুই নাই, এই বিশ্ব আমারই স্বভাব, আমি কালেতে পুনঃ পুনঃ বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইতেছি সকলই আমি। আমার এই প্রকার নিশ্চয় বোধ হইবামাত্র এই সংসারের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও পুত্র কলত্র, প্রভৃতির প্রতি যে মায়া তাহা একেবারে নিমিষ মধ্যে তিরোহিত হইয়া যাইল সুতরাং দ্বৈত বস্তু না থাকায় আমিই অদ্বৈতরূপে অবস্থিত রহিলাম।"

দুই এক পৃষ্ঠা পরে গ্রন্থকার তাঁহার আর এক ঘটনার কথা বলিতেছেন। "পৃথিবী ছাড়িয়া পৃথ্বী হইতে অতি দূরবর্ত্তী মরুৎ পথে উঠিতে উঠিতে শূন্যমধ্যে একটি বৃহৎ অট্টালিকা আমার দর্শনপথের অতিথি হইল।" গ্রন্থকার দেখিলেন যে যে সকল মনুষ্য বিগতায়ু হইতেছে তাহারা এই অট্টালিকার পৃথক্ পৃথক্ কক্ষায় রক্ষিত হইতেছে কাহার সহিত কাহার সাক্ষাৎ হয় না। প্রলয় পর্য্যন্ত তাহারা ঐরূপে থাকিবে ও প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি হইলে ঈশ্বর ইচ্ছায় ঐ মনুষ্য সকল আপন আপন কর্ম্ম ফলে নরকে বা সুরধামে গমন করিবে। গ্রন্থকারও ঐ অট্টালিকার এক কক্ষ পাইয়াছিলেন। তাহার পর অকস্মাৎ কোথা হইতে তিনটা ঈষৎ নীল ও রক্তাদি বর্ণ অতি তেজোময় জ্যোতিঃপ্রবাহ রজ্জুবৎ তাঁহার গাত্র বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে কক্ষ হইতে লইয়া চলিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন "শেষ এক তরল সুবিস্তীর্ণ অনিবার অতি ভীষণ প্রবাহে তরঙ্গিত জ্বলন্ত পাবকময় মহাসিন্ধু মধ্যে নিক্ষেপ করিল, আমি সেই অগ্নিময় সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া অতিশয় যন্ত্রণায় কাতর হইতে লাগিলাম, সেই স্থানটি অতি ভয়াবহ, অস্বচ্ছ, আলোকিত অথচ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না সকলই বহ্নিবর্ণ ও তরলস্পর্শ। সেই নিদারুণ অনলে আমার দেহ যত দগ্ধ হইতে লাগিল আমি ততই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার

ভূতাবাস ভস্মসাৎ না হইয়া পূর্ব্ববৎ অবিকৃত রহিল, আমি সেই কঠোর অবস্থায় নিপতিত হইয়া এই চিন্তা করিলাম, বোধ হয় পরমেশ্বর এই অনন্ত নরক পাপিলোকদিগের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।"

তাহার পর সেই তিনটী জ্যোতিঃপ্রবাহ গ্রন্থকারকে নরক হইতে তুলিয়া আর একস্থানে ফেলিয়া গেল। গ্রন্থকার লিখিতেছেন "তথায় এক সুরম্য হর্ম্যে উপস্থিত হইলাম। গৃহটী সন্তানক কুসুমমালাসনাথ অরবিন্দপরিমলবাহী মৃদুমন্দ গন্ধবহের নিয়ত সঞ্চারে অতি সুখসেব্য, নয়নপ্রীতিকর সুস্নিগ্ধ মসৃণ মরকত প্রস্তরে নির্ম্মিত কুট্টিম, তাহার অভ্যন্তরে দুগ্ধফেণসন্নিভ পুষ্পপ্রকরাবকীর্ণ কোমল পর্য্যঙ্কোপরি উত্তান শয়নে এক দিব্যাকৃতি পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। ব্রহ্মা, রুদ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি মণ্ডল তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি মুখব্যাদান করিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রবেশ করিলাম প্রবেশ মাত্র আমার দিব্যজ্ঞান জন্মিল।"

যাহা উপরে উদ্ধৃত করা গেল বোধ হয় তাহাই যথেষ্ট, পরে ৩৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যাহা আছে তাহার সর্ব্বত্র এইরূপ। এই সকল অংশ পাঠ করিয়া যিনিই যাহা বলুন, আসল এই সকল ঘটনাই গ্রন্থের মূল। গ্রন্থকার ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "সমুদয় ধর্ম্মের প্রতি আমার সংশয় হওয়াতে, আমি কে, কোথা হইতে আগত হইলাম, ও পরিণামে কোথায় গমন করিব, এই প্রপঞ্চ সংসার কোথা হইতে আগত হইল, তাহাও পরিণামে কোথায় যাইবে, অতএব, এই বিশ্ব কিরূপে কোথা হইতে আসিল? এই চিন্তা আমার মনোমধ্যে নিরবধি থাকিত, তদনন্তর আমি আমার গত পীড়িত অবস্থায় ঐ বিস্ময়জনক ব্যাপার দর্শনাবধি এ পর্য্যন্ত কোন বিতর্ক না দেখিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঐ প্রকারে হইতেছে, তাহা নিশ্চয় বোধ হওয়ায়, স্বভাব নামে মহা পুস্তকের সহিত আমি ঐক্য করত, আমার সামান্য বুদ্ধির কৌশলে যাহা স্থির করিয়াছি তাহা আমি সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাতকরণ জন্য প্রকাশ করিতেছি।"

গ্রন্থসূচনা এই। এক্ষণে গ্রন্থ কিরূপ তাহা না পড়িয়া অনেকে অনুভব করিতে পারেন! গ্রন্থকার পীড়ার পরিচয় দিয়া ভাল করেন নাই, প্রশংসা কবিরাজ একা লইল, তাঁহার ঔষধ অতি আশ্চর্য্য!

বঙ্গদর্শন।

ষষ্ঠ বৎসর।

গঙ্গাধর শর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"রাম না হতে রামায়ণ"

অনধিকারচর্চ্চা করিতে আমরা কখন ক্রটি করি না। যদি কণ্টকাকীর্ণ বন্য তরু ও বন্য লতাজালে আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ বেষ্টন করে, যদি সর্প ভেকে আমাদিগের গৃহে ভাগাভাগী করিয়া বাস করে, যদি জলবদ্ধ হইয়া সেৎসেঁতে সেওলার বিছানা হইতে দুর্গন্ধ বিস্তার হয়, যদি দিনে দুই প্রহরে, হেঁতে জোঁক ও শিলেটি হাঁড়ির মত মশা রক্ত শোষণ করে, তথাপি হস্ত বাহু পরিচালনা করিয়া কুঞ্জের জীবকে বিনষ্ট করিতে বড় মায়া হয় ও সরে বসিতেও ক্লেশ বোধ হয়। সসর্প গৃহে বাস, দুর্গন্ধ ভোগ ও জরের জ্বালা সহ্য হয়, তবু আলস্য পরিত্যাগ করিতে কাতর, আবাস ভূমি পরিষ্কার করিতে কাতর, সকল কার্য্যেই কাতর; কিন্তু বাক্যব্যয়ে, অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, আমা-দের তুল্য অকাতর কে আছে? মিথ্যা বাক্যে যে আমাদের নিজ কার্য্য বিশৃঙ্খল হয়, ন্যায়বিচার ক্ষমতা ও চিন্তাশীল-তার হ্রাস হয়, গুরুতর পরিশ্রমলব্ধ কার্য্যসম্পন্নশক্তি শিথিল হয়, সমাজের অনিষ্ট হয়, হলইবা, অম্বুরি তামাক মিশা-ইয়া বৃথা গল্প করার তুল্য মধুর আর কি আছে? বৃথা গল্প বড় ভাল লাগে, তাহাতে, নিজ উপকার হউক না হউক, যাহারে ভাল না বাসি তাহারও কখন কখন অনিষ্ট হয়, না হয়, তাহার নিন্দা,

বাদও তো প্রচার হয়? সে বড় কম কর্ণ-সুখ নহে।

আমাদের খঞ্জভীম স্কুলমাষ্টার ও বিখ্যাত হাকিম ডাকমুন্সি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া ডাকঘরের মেজেতে পাটি পাড়িয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। মাষ্টার বাবু গজাননের বিরুদ্ধ। গজানন ইংরেজি শিক্ষার শত্রু, গজানন নিঃসন্তান, চক্ষু মুদিলে তাঁহার ধন কে ভোগ করে? কাহাকেও ধন দান করিবার ইচ্ছা নাই কিন্তু তিনি মহান্ হিন্দু। পরলোকে পিণ্ডি পাইয়া নরক হইতে উদ্ধারের আশা রাখেন। এই জন্য বহু যত্নে একটি দূর দেশস্থ জ্ঞাতির সন্তান লইয়া পালিতেছেন, তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন—ও পোষ্যপুত্র করিয়া পিণ্ডাধিকারী ও ধনাধিকারী করিবার বিশেষ প্রয়াস রাখেন, আশুতোষ বাবুর অনুরোধে এই নীলমণিকে তিনি খঞ্জভীমের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন; সুশিক্ষার জন্য মাষ্টার বাবুও অনেক যত্ন করিতেছেন। কিন্তু যাহাকে প্রকৃতি দেবী প্রতিকূল, মানব চেষ্টায় তাহার কি হইতে পারে! নীলমণি আজ যাহা বহু কষ্টে শিখিয়া গৃহে যান, কাল প্রাতে ক্ষীর, ননি, সন্দেশের সহিত বেমালুম "জলপান" করিয়া আসেন। তিনি "লোককে" "নোক" রসিককে "অহিক" রাঙ্গাকে "নাঙ্গা" ভিন্ন কহিতে পারেন না—এ দিকে রাঙ্গকে 'লাঙ্গ"—অভয়কে"রভয়" বলিয়া থাকেন। "লোকোমোটীব" কে "নৌকো মাটী" কহিতেন ও একদিন "কামসকাটকা" উচ্চারণ করিতে উদ্যম করায় দন্তপাটীতে খিল লাগাইয়া মাষ্টার বাবুকে বিশেষ তিরস্কৃত করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি পরীক্ষার সময়ে (প্রাইজ) পারিতোষিক পান না বলিয়া গজানন মাষ্টার বাবুর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে গজানন মাষ্টার বাবুর কাছে প্রস্তাব করিয়া থাকেন, "বাপু! পরীক্ষককে কিছু বেশরত দিলে আমার নীলমণি প্রাইজ্ পেতে পারে না? না হয় আশুতোষ বাবু দ্বারা পরীক্ষককে একখানি অনুরোধপত্র লিখাইলে ছাত্রবৃত্তির পাশ আসিতে পারে না?" আবার কখন কখন বলেন, "বাবা, আমি উহার তত লেখা পড়া চাই না—যাহাতে মতভ্রষ্ট না হয়, পিণ্ডটী বজায় থাকে তাহাই করুন।" মাষ্টার বাবু একদিকে এই সকল মতের অনুমোদন করিতে অন্যদিকে নীলমণির শিক্ষার কিছু মাত্র উন্নতি দেখাইতেও পারিতেন না। তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া নূতন মাষ্টার আনাইবার জন্য গজানন দুই একবার আশুতোষ বাবুর নিকট অনুরোধ করেন। মাষ্টার সেই সব কথা শুনিয়া দেওয়ানজির বিশেষ বিদ্বেষী হন। আজ মাষ্টার বাবু সুসময় পাইয়াছেন। দেওয়ানজি যে নাজির সাহেবের যোগে মিথ্যা করিয়া সুরসিকা ললনা সুন্দরী গোপিনীকে ক্কাদম্বিনী সাজাইয়া বিচারস্থলে আনয়ন করিবেন, তাহা

মাষ্টার বাবুর কর্ণগোচর হইয়াছে। সুন্দরীর সঙ্গে তাঁহার অনেক কথা হইত—ও সেই সকল কথা ব্যক্ত করিবার জন্য পূর্ণবাবুর বৈঠকে আসিয়াছেন।

এ দিকে পূর্ণ বাবু নাজিরের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছেন, গ্রামে একজনই হাকিম থাকিতে পারে—এক কম্বলে চার জন দরবেস্ বসিতে পারে, কিন্তু এক রাজ্যে দুইজন রাজার স্থান হইতে পারে না—নাজির আবার কোথাকার হাকিম, দুই দিবস পর্য্যন্ত গ্রামে প্রভুত্ব করিতেছে অথচ ডাকমুন্সী মহাশয়কে একটি কথা, একটী পরামর্শও জিজ্ঞাসা করে না। ভাল, কেমন তার হাকিমী, কেমন তার পরামর্শ দেখা যাইবে।

ডাকঘরের কার্য্য পরিদর্শনাভিপ্রায়ে অদ্য ডাক্তার ইট্‌ওয়াল্ সাহেব আগতপ্রায়; তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, জজ লুস্থল্ সাহেব সকল কথা শুনিবেন। একজনের মনোবাদ সোণা, আর এক জনের বিদ্বেষ সোহাগা—মাষ্টার বাবু ও ডাকমুন্সী মহাশয়ের গল্প শেষ হইল—পরস্পর হস্তস্পর্শ করিয়া বিদায় হইলেন—পরক্ষণেই একজন হরকরা আসিয়া কহিল, সাহেব বাহাদুরের ঘোড়া নদীর বাঁধের উপর দেখা গেল।

সাহেবের নাম শুনিবামাত্র ডাকমুন্সী মহাশয় পার্শ্বস্থিত ডাকবাঙ্গলায় উপস্থিত হইলেন। আজ ডাকবাঙ্গলা পোষাকী বেশ পরিয়াছে, সকল দ্রব্য মার্জ্জিত; দেয়ালে খানসামা সাহেব পান চিবাইতে চিবাইতে শ্লেষ্মা বর্জ্জনে যে চিত্র বিচিত্র অঙ্কপাত করিয়াছিলেন, রাখারির কলমের আঘাতে ডাকমুন্সী মহাশয় যে থামের চূণ খসাইয়া পানের ঝালের লাঘবতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা সকল সংস্কার হইয়াছে, সকল শ্বেত খড়িতে মার্জ্জিত হইয়াছে, বড় মেজের উপর শুভ্র চন্দ্রজ্যোতির ন্যায় চাদর বিছান হইয়াছে, বেলাওয়ারি বাসন, চীনের প্লেট গিল্টির জলে আজ খাঁনার কামরা ঝক্ ঝক্ করিতেছে, দ্বারে দুইটি পূর্ণ কলসী ও কলার গাছ রোপণ করা হইয়াছে, টেবিলের উপর গরম ডবল ডিসে বড় হাজরির জাতিবিনাশিনী পিবিলিকুলকলঙ্কিনী ভ্যাপ্সা গন্ধ বিস্তার করিতেছে। খানসামার বয়স প্রায় অশীতি বৎসর, গৌরবর্ণ, গোলাম আলি, দন্তগুলি পরিষ্কার ফাঁক ফাঁক, পরিধানে অতি শুভ্র চাপকান, তাহার বামপার্শ্বে শ্বেতলোমবিকীর্ণ বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিদংশ দেখাইয়া ও উপর হইতে প্রচুর শুভ্রশ্মশ্রুকেশরাশি দোলাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, মাথার পাগড়ি বন্ধনে ৩০ গজ মলমল পর্য্যবসিত হইয়াছে—হাতে একখানি মান্দ্রাজি রুমাল ও বগলে একটী সার্টিফিকেটের তাড়া লইয়া আছেন; আবশ্যক হইলে আপন কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত। এই তাড়ায় ভারতবর্ষের নব পুরাবৃত্ত পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধ হইতে পঞ্জাব অধিকারের সময়তালিকা এই

তাড়া হইতে নির্দ্ধার্য্য হইতে পারে—উহা পাঠ করিলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের পুরাবৃত্ত, বা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস সংগ্রহের পরিশ্রম লাঘব হইতে পারে—লর্ড নেপিয়রে ছুটীমাত্র আধপোড়া চিকিন ভক্ষণ করিয়া এই পথে সিন্ধুযাত্রা কোন কালে করেন,প্রথম নেটিব ইঞ্জিনিয়ার বৈকুণ্ঠবাসী বেচারাম হালদার মহাশয় স্বাধীন বিভাগের ভার কোন সময় প্রাপ্ত হন,ও কোন দিনে সার কলিন কেম্বেল মিউটিনি নিবারণ জন্য মরিচমিশ্রিত অলোণা কাঁচা আণ্ডা ৫ গণ্ডা আহারান্তে এই পথে প্রয়াগদুর্গে গমন করেন, সকল তারিখ এই তাড়া হইতে স্থির হইতে পারে। কোন্ সাহেব কি খাইতে ভাল বাসেন ও কোন বাবু প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মনিষিদ্ধ দ্রব্য ঐ হাতের গুণে নিজগ্রামে গ্রহণ করিয়া আনন্দলাভ করেন—সকল কথা গোলাম আলি বলিতে পারেন। কিন্তু আপাততঃ গম্ভীরপ্রকৃতি ধীর লোকের ন্যায় সম্পূর্ণ ভক্তিসহকারে ডাক্তার সাহেবকে একটি সেলাম করিবার আশয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

ইতিমধ্যে অশ্বপদের দড়বড়ি শব্দ শুনা গেল, ও পরক্ষণেই ঘোড়া বারাসতের মধ্যে দেখা দিল, একজন বেহারা কহিয়া উঠিল "ও! তীর আস্‌ছে!" সাহেবকে দেখা যায় না কেবল অশ্বপৃষ্ঠে একটী ক বর্গের পঞ্চম অক্ষর ঙ ঠাকুরের ন্যায় মস্তকে বৃহৎ টুপিধারী পাদদ্বয় সম্মুখ ভাগে হেলান দেখা যাইতেছে, চতুষ্পদের ঘর্ষণে ধূলা বজ্রপাকের ন্যায় ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছে। কথা কহিতে কহিতে গাড়ির বারান্দায় ঘোটক উপস্থিত, সাহেব বাহাদুর চকিতে অবরোহণ করিলেন, সেলামের উপর সেলাম চতুষ্পার্শ্ব হইতে বর্ষণ হইল। সাহেব বাহাদুর কেবল টুপিটি চকিত মাত্র উঠাইয়া বৃহৎ মস্তকের টাক সকলে দেখিতে না দেখিতেই আবার টুপি মাথায় রাখিলেন, কারণ সরদির ভয়ে সাহেব টুপি খুলিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বারেণ্ডা হইতে সোপানের দিকে দেখিলেন ও পূর্ণ বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া "ওয়েল" "Well" মাত্র কহিয়া দ্রুতপদে কামরায় প্রধান চৌকিতে উপবিষ্ট হইলেন—পাখা অমনি শন্ শন্ করিয়া চলিতে লাগিল।

ডা, সা। "All right with you, Purna?" (সব ভাল ত?)

পূ। Sir, master, your Blessing (হুজুর খামিন্দি। আপনার আশীর্ব্বাদ।)

ডা, সা। My Blessing!

পূ। You master! you are my most obedient Servant এখন পূর্ণ বাবু বিহ্বল হইয়াছেন, কি বলিতে কি বলিলেন। ও কহিয়া উঠিলেন forgote, forgote sir—!

ডা। Am I your most obedient servant?

পূ। No sir.

ডা, সা। No sir.

পূ। তবে Yes sir.

ডা,সা। I am your most obedient servant, either you or I must be fool.

পূর্ণ। Both, my Lord.

সরলচিত্ত ডাক্তার সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। তিনি পূর্ণবাবুর ইংরেজি বিদ্যায় যতদূর ব্যুৎপত্তি তাহা বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্তু খুঁট আখরের প্রতি তাহার স্নেহ ছিল, তাহার কার্য্যবিভাগ ঐরূপ খুঁট আখরেতেই পরিপূর্ণ ছিল, ও যখন বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় পত্র পাইতেন, নিশ্চয় জানিতেন, তাহা অপর হাতে লিখিত। পূর্ণ বাবুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া আবার কহিলেন, "What's the news" খবর কি ?

পূ। খবর—Sir Ghost's father's verb done ! (ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া হইতেছে।)

ডাঃ। What do you mean ?

পূ। The cake of Udo on the neck of Budho (উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে) Horses evil on monkey's head (ঘোড়ার বালাই বানরের ঘাড়ে।) পূর্ণ বাবু এই কথা গুলি উচ্চারণ করিয়া দেখিলেন সাহেব তাহার অর্থ সংগ্রহে অক্ষম ; তখন খানসামাকে ইঙ্গিত করিলেন, সে বাহিরে গেল কিঞ্চিৎ নিম্নস্বরে গাঙ্গুলি মহাশয় ডাক্তার সাহেবের নিকট নাজিরের অত্যাচার ও গজাননের ফেরেপি বুদ্ধি ও জালকন্যা সাজাইবার অভিসন্ধি সমস্ত ব্যক্ত করিয়া দিলেন, ও যাহাতে তাহা জজ সাহেব বাহাদুরের কর্ণগোচর হয় তাহাই যাচ্ঞা করিলেন। ডাক্তার সাহেব কেবল মাত্র কহিলেন "এ সকল অনধিকারচর্চ্চা, তোমাদের সমাজে এ সকল মিথ্যা রচনা অভ্যাসের কর্ম্ম, বিশেষ এ বিষয়ের বিচার পরে জজ সাহেবের নিকট হইতে পারে, তাঁহাকে পূর্ব্বাহ্নে কোন কথা জ্ঞাত করান সঙ্গত হইতে পারে না"—এই সময় পকেট হইতে ঘড়ি লইয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, "Hang them !" আমাকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—নগরে আপন কুটীতে পৌঁছিতে হইবেক। জজ সাহেবের মেমের সহিত খানা খাইতে হইবেক "বহি লাও" "বহি লাও।" তিলেক সময়মধ্যে আপিসের পুস্তক সকল আসিল; ও কোন রেজিষ্টারির উপরিভাগে, কাহার তলদেশে, কাহার মধ্যদেশে, যেখানে প্রথমে হাত পড়িল প্রায় দুই মিনিট মধ্যে শত স্বাক্ষর ছড়াইয়া পরিদর্শন কার্য্য সমাপ্ত করিলেন ও খাম মেরামত দেখিয়া এবং পূর্ণ বাবুর দন্ত ও ওষ্ঠাধর খদিররাগবিবর্জ্জিত দেখিয়া "I am satisfied" (বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি)কহিলেন। পরক্ষণেই কাঁটা ছুরী অস্ত্রধারী হইয়া খানসামার প্রতি ইঙ্গিত করিবামাত্র ডিসের ঢাকুনি খোলা হইল,ও কাটাকাটি ছেঁড়াছিঁড়ি আরম্ভ হইল। প্লেট হইতে ধুঁয়া উঠিতে আরম্ভ হইল, পূর্ণ বাবু দুই নাকে দুটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। "you eat

nothing ? your stomach very small sir।" (মহাশয় কিছুই খান না, এতটুকু পেট।)

ডা। Can you eat more of this meal.

পূ। Ram Ram, sir, my caste go, I worship stone every day. (রাম রাম। জাত যাবে, আমি প্রতি দিন শালগ্রাম পূজা করিয়া থাকি)—but say "rice"—two seers every time, mind sir, I am old

ডাক্তার সাহেব চা ও জল ভিন্ন অপর কোন দ্রব্য পান করিতেন না—কহিলেন, "এই গ্রীষ্মপ্রধানদেশে স্নিগ্ধ বরফবারির তুল্য আর উপাদেয় কি আছে ?"

পূ। তপশি মাছ আর আম বড় মন্দ নহে। মদ্যপান ডাক্তার সাহেব সর্ব্বদা নিষেধ করিতেন। অতএব কহিলেন, "মদেই তোমার দেশ ডুবিবে।" পরে আহার সাঙ্গ করিয়া সাহেব বড় প্রফুল্ল হইলেন, অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন ও কহিলেন, "আমরা আহার করিয়া নিদ্রা যাই না। Well Gangooly what do you want ?"

পূ। I want, thank sir, nothing sir, but pension next October and—

ডা। And what ? (এবং কি ?)

পূ। My son well learned English, missionary School Daff sahib scholar, Inspectori wants.

ডা, সা। I shall see what I can do for him, Purna, I give you no promise.

তখন সাহেবরা অনুগত লোক প্রতিপালনে সর্ব্বদা সুখী হইতেন।

পূর্ণ বাবু সেলাম করিলেন। সাহেব দুটি মাত্র আধপোড়া পক্ষী রুমালে বান্ধিয়া পকেটে ফেলিলেন। পথে টিফিনের উদ্যোগ রহিল, পরক্ষণেই বারেন্দায় আসিলেন। খানসামার হস্তে ঝনাৎ করিয়া মুদ্রা দিবামাত্র অশ্বারোহী হইলেন, আবার ক্ষণমধ্যে অশ্ব ধাবিত হইল।

দ্বিতীয় আড্ডায় ঘোড়া প্রস্তুত আছে কিনা পূর্ণ বাবু তাহাই চিন্তা করিতে করিতে সাহেবের ঘোড়ার গতি সর্ব্বাগ্রে দেখিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বেসরাবী।

গজানন ব্যয়কুণ্ঠ। পয়সাটি যার ব্রহ্ম, সুখদ পদার্থ তাহার চক্ষের শূল। যাহাতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, যাহাতে শিল্পের শ্রীসাধন, যাহাতে বিজ্ঞনের উন্নতি, যাহাতে মানবের শক্তিবৃদ্ধি তাহা কৃপণের অসাধ্য ও অসহ্য। নৃত্য গীতে যাহারা আশক্ত তাহারা গজাননের পরম শত্রু। সাধারণ প্রমোদের চিহ্নমাত্র তাঁহার ক্রোধের কারণ। কোথাও তাস যোড়া দেখিলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, শতরঞ্চি বা পাশা খেলার

আয়োজন দেখিলে বলের থলিটী পর্য্যন্ত তাঁহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিতে দেখা গিয়াছে। কাহারও তানপুরা দেখিলে তারটি খুলিয়া রাখিতেন ও আবশ্যক মতে আপনার জীর্ণ দন্ত বান্ধাইতেন। তাঁহার ভয়ে গান বাজনা অতি সংগোপনে করিতে হইত; কেবল ঢোল ভাঙ্গিয়া দিতেন না, তবলার ছাওনিটি ছুরি লইয়া কাটিয়া দিতেন না, তাহার চর্ম্মতন্ত্রী খুলিয়া লাঙ্গলের যুয়ালে লাগাইতেন ও যার ঘরে বৈঠকি গীত হইয়াছে শুনিতেন, তাহার সঙ্গিন জরিমানা লাগাইতেন ও স্ত্রীলোক হইলে গোপনে উত্তম মধ্যম দেওয়াইয়া গ্রামত্যাগিনী করাইতেন। কোন ব্রাহ্মণযুবার স্কন্ধে অনেকগুলি যজ্ঞসূত্র দেখিলে লাম্পট্য চিহ্ন জ্ঞান করিতেন ও ক্রোধভরে কাঁচি দিয়া অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলিতেন।

এই সকল কারণে সুন্দরী গোপিনী গজাননের বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন না, কিন্তু প্রজাবৎসল আশুতোষ বাবুর আশ্রয়ে সুন্দরীর বাস। আশুবাবু গুণ-রাশী হইলেও তাঁহার দুই একটি বিলক্ষণ মনভ্রান্তি ছিল। তিনি সৌন্দর্য্যপ্রিয়। প্রকৃতি মধ্যে হউক, উষার গগনে বা হরিত পল্লবক্ষেত্রে বা নীলিমর জলস্রোত-মিশ্রিত চন্দ্রকিরণে বা চন্দ্রমুখীদের চন্দ্রবদনে বা বিচিত্র চিত্র পটে, বা প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তিতে বা কবিতাকলাপে যে থানে হউক কমনীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেই তাহাতেই তাঁহার পক্ষপাত সৃষ্টি হইত, যাহাকে ভাল বাসিতেন তাহার শত দোষ থাকিলেও অন্ধ, এই তাঁহার লোকানুরাগের এক কারণ। তিনি গুণই দেখিতেন এবং এই গুণগ্রাহিতা জন্য তিনি অভাগিনী সুন্দরী গোপিনীর নিকট যোগী ঋষি হইতে ভক্তিভাজন ছিলেন। তাঁহার নামের দোহাইয়েই গজানন সকলকার্য্যে সুসিদ্ধ হইতেন, অদ্য সন্ধ্যার পর সেই নাম উচ্চারণ করিয়া গজানন সুন্দরী গোপিনীর দেখা পাইয়াছেন।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার, গবাক্ষ দিয়া দৃষ্টি করিলে নিকটের বৃক্ষকায়া গুলি ঘনীভূত অন্ধকারে চাপ মাত্র বোধ হইতেছে। আকাশের উপর একটি ঘন মেঘখণ্ড মন্দ মন্দ গতিতে উড়ে যাইতেছে। আলোকের পরিচয় দিতে কেবল খদ্যোতিকার দীপ্তি, শব্দের পরিচয় দিতে শত শত ভেককণ্ঠনিঃসৃত সপ্ত গ্রাম, মধ্যে মধ্যে একটী কট্ কট্ শব্দ হইতেছে, যেন ভূত দলে বর্ষায় বাতের আশঙ্কায় অঙ্গ চালনা করিতেছে আর হাড় মটকাইতেছে। এমন রাত্রে কি অবলা স্ত্রীলোক ঘরের বাহির হয়? তবু আশুবাবুর নামে ও দেওয়ানজীর ভয়ে একটি ভৃত্যসহ সুন্দরী গোপিনী দোতালার উপর একটি ক্ষুদ্র কামরায় গজাননের নিকট আসিয়া উপস্থিত। গৃহের এক কোণে একটি বাঁশের ছেঁচা নির্ম্মিত ঘেরার মধ্যে এক তাল গোময়ের উপর এক নির্ব্বাণপ্রায় ক্ষীণপ্রভা মিহি পলিতা

দীপ্তিমান্। দীপটি মিটমিট করিতেছে। গজানন একটা ক্লিষ্ট তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন ও মধ্যে মধ্যে দংশন জ্বালায় বজ্জাত ছারপোকাকুলের উপর ক্রোধ করিতেছেন। পার্শ্বে নীলমণি—তাঁহার প্রাণাধিক নীলমণি—শয়ন করিয়া একটি একটি কথা কহিতেছে। গজানন কহিতেছেন, "ও বাপু, রাত্রি হল, বাড়ী চল, ঘুমাও, ব্যামো হবে।"

নী। কি বাবা? জ্বর?

গ। বালাই। অমন কথা বল্‌তে নাই। তুমি না ঘুমাও, চুপ করে থাক।

নী। কেন বাবা চুপ কর্‌লে জ্বর হয় না।

সুন্দরী নিকটে বসিয়াছিল। কহিল, ক্ষেপাছেলে।

নী। হুঁ তুই ক্ষেপি—

সু। অমন কথা বল্‌তে আছে? আমি—তোমার—

নী। কে, খুড়ি? সুন্দরী কহিল খুড়ি হলে কি তোমার জ্যেঠার কাছে আসি।

নী। তবে কি পিসি?

গ। তা নয় ক্ষেপা ও দিদি হয়।

নী। ঠাকরুণ দিদি?

এই কথা কহিতে কহিতে প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায় হইল। গজানন কহিল, "ওরে উসকাইয়া দে।" নীলমণি কহিল, "নিবে যায় ত বেশ হয়, সকলের ঘুম হবে—"

সুন্দরী কহিল, তোমার জ্যেঠার যে প্রদীপ, নির্ব্বাণ, দীপ্তিমান্ উভয় সমান—

নী। আমি বড় লোক হই—পিডিম ভেঙ্গে বাতি লণ্ঠন জ্বালাব।

গজানন অমনি সজলনয়নে কহিলেন, "কে বলে এর বুদ্ধি নাই। রঘুবীর করুন তুমি বড় লোক হবে।"

কথা কহিতে কহিতে নীলমণির তন্দ্রা আসিল। সুন্দরী কহিল "আমাকে কেন স্মরণ করিয়াছেন।"

গজানন কহিলেন "পার্‌বি?"

সু। আমি কি না পারি? কারও যোগ ভঙ্গ করিতে হইবে?

গ। তা নয়, ভ্রম দর্শাইতে হইবে। সেই যে কথা সে দিন বলিয়াছি, কাদম্বিনী সাজিতে হইবে।

সু। কি মেঘমালা? কারও গলায় কি জড়াইতে হইবেক?

আজ গজানন রসিক হইয়াছেন, তাঁহার কেবল কেটো রস কার্য্যসিদ্ধির পন্থা—কহিলেন, "জড়াও ত হাকিমের গলায়।"

সু। ও মা জাত যাবে! সে যে গো-খাদক! ও হরি!

গ। এখন যে কথা গুলি বল্‌ছি বুঝেছ কি না? বুঝ ত বল, না বুঝ তাও বল—বল গো বল।

সু। সব বুঝেছি, কাপড় আর অলঙ্কার চাই।

আমাকে নীলমণি "জটা ডাডা" বলিয়া বড় ভক্তি করে! আমি তার পাশে শুইয়া এতক্ষণ কপটনিদ্রায় ছিলাম। এখন কহিয়া উঠিলাম, "সুন্দরীর কাপড়

আর গয়না আর সোনা।” আমার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল ও কহিল, “গঙ্গা দাদা ! ঘুমাও নাই ? যে আমায় সোনা দেয়,গহনা দেয়,আমি তার; তুমি দিবে ?” আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুবুদ্ধি মান্ নীলমণি ভবিষ্যৎবাণীর স্বরূপ কহিল, “ছিছি। আমি দিব।”

গজানন কহিয়া উঠিলেন, “ক্ষেপা-ছেলে।”—নীলমণি আবার কহিল, “ আমার যে দু টাকার ডুয়ানি আছে—টোনা খরিদ কর্ব।”

আমি কহিলাম, “ ভাই নীলমণি, দুই টাকায় কটা দুয়ানি হয় ?”

নী। সাড়ে নয়টা—জটা ডাডা।

গ। ভীমে মাষ্টারটা অতি বেল্লিক, শিখাইবার প্রণালী আদৌ জানে না।

সু। একটা বন্দবস্ত করুন—আমার কাপড় অলঙ্কার ?

গ। সব প্রস্তুত।

সম্মুখে একটী হাতবাক্স ছিল। দুইটি গিল্টির বাগ্মুখো চক্চকে বালা দেওয়ান্জী সুন্দরীকে দিলেন। সেও সঙ্গে সঙ্গে পরিল ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আবার একটি পার্শ্বস্থিত বস্তা হইতে একখানি সাড়ি ও উড়ানি ও পাদভূষণ পশ্চিমে পাইজর সুন্দরীকে দেওয়া হইল।

সুন্দরী বারেণ্ডার দিকে গেল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রাজপুতানী কাদম্বিনী হইয়া প্রবেশ করিল। বাস্তবিক তাহাকে তাদৃশ রাজপুতানীর মত দেখাইত না, সে তাদৃশ গৌরাঙ্গী স্থূল উন্নতকায় নহে। তাহার আঁখির ও ভ্রূযুগলের ভাবভঙ্গি সেরূপ প্রশস্ত পরিমাণের নহে; সে উজ্জ্বল-শ্যাম, কৃষাঙ্গী, কোমলাঙ্গী,পঞ্চদশবর্ষীয়া বঙ্গ গোপকন্যা মাত্র, তথাপি যে দিন হইতে সে রাজপুতানী সাজিল, সেই দিন হইতেই তাহাকে ঠিক রাজপুতানী বলিয়াই অনেকে দেখিতে লাগিল, ও গ্রামে দুই একটি বৃদ্ধ লোক ভ্রূ উত্তোলন করিয়া কহিতে লাগিল, “না হবে কেন, এ কে জান ?” আর এক বৃদ্ধ কহিল, “ এ বাবুর বাটীর জমাদার ভবানী সুকুলের ঔরসজাত কন্যা,সেই জন্য ও কেমন লোচ হিন্দিতে কথাবার্ত্তা কহে শুনেছ ?” এখন সজ্জা পরিবর্ত্তন করিয়া গজাননের সম্মুখে দাঁড়াইবা মাত্র গজানন কহিলেন,“বেশ সেজেছ —সুন্দরি !”

সুন্দরী কহিলেন, “এ আপনার ভ্রম—আমি কাদম্বিনী।”

নীলমণি কহিয়া উঠিল—

“দিদি! তুমি জান কত রঙ্গ,
ধানভান, চিঁড়ে কোট—
বাজাও মৃদঙ্গ।”

দুর্গোৎসব।*

১

বর্ষে বর্ষে এসো যাও এ বাঙ্গালা ধামে
কে তুমি ষোড়শী কন্যা, মৃগেন্দ্রবাহিনি ?
চিনিয়াছি তোরে দুর্গে, তুমি নাকি ভব দুর্গে,
দুর্গতির একমাত্র সংহারকারিণী॥
মাটি দিয়ে গড়িয়াছি, কত গেল খড় কাছি,
সৃজিবারে জগতের সৃজনকারিণী।
গড়ে পিটে হলো খাড়া, বাজা ভাই ঢোলকাড়া,
কুমারের হাতে গড়া ঐ দীনতারিণী।
বাজা—ঠমকি ঠমকি ঠিকি, খিনিকি ঝিনিকি ঠিনি॥

২

কি সাজ সেজেছ মাতা রাঙ্গতার সাজে।
এদেশে যে রাঙ্গই সাজ কে তোরে শিখালে ?
সন্তানে রাঙ্গতা দিলে, আপনি তাই পরিলে,
কেন মা রাঙ্গের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে ?
ভারত রতন খনি, রজত কাঞ্চন মণি,
সেকালে এদেশে মাতা, কত না ছড়ালে ?
বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা, আজি তুমি রাঙ্গতা পরা,
ছেঁড়া ধুতি রিপু করা, ছেলের কপালে ?
তবে—বাজা ভাই ঢোল কাঁশি মধুর খেমটা তালে॥

৩

কারে মা এনেছ সঙ্গে, অনন্ত রঙ্গিনি।
কি শোভা হয়েছে আজি, দেখরে সবাই।
আমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষ্মী খাড়া,
ঘরে হতে খাই তাড়া, ঘর খরচ নাই॥
হয়েছিল হাতে খড়ি, ছাপার কাগজ পড়ি,
সরস্বতী তাড়াতাড়ি, এলে বুঝি তাই ?

* এই কাব্যে ছন্দের নিয়ম পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘিত হইয়াছে—ব্যাকরণের ত কথাই নাই।—লেখক।

করো না মা বাড়াবাড়ি, তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি,
চড়েনা ভাতের হাঁড়ি, বিদ্যায় কাজ নাই ।
তাক্ তাক্ ধিনাক্ ধিনাক্ বাজানা বাজাবে ভাই ॥

৪

দশভুজে দশায়ুধ কেন মাতা ধর ?
কেন মাতা চাপিয়াছ সিংহটার ঘাড়ে ?
ছুরি দেখে ভয় পাই, ঢাল খাঁড়া কাজ নাই,
ও সব রাখুক গিয়ে বামদীন পাঁড়ে ।
সিংহ চড়া ভাল নয়, দাঁত দেখে পাই ভয়,
প্রাণ যেন খাবি খায়, পাছে লাফ ছাড়ে ॥
আছে ঘরে বাঁধা গাই, চড়তে হয়ত চড় তাই,
তাও কিছু ভয় পাই, পাছে সিঙ্গ নাড়ে ।
সিংহ পৃষ্ঠে মেয়ের পা ! দেখে কাঁপি হাড়ে হাড়ে ॥

৪

তোমার বাপের কাঁধে—নগেন্দ্রের ঘাড়ে
তুঙ্গ শৃঙ্গোপরে সিংহ—দেখ গিরিবালে ।
শিমলা পাহাড়ে ধ্বজা, উড়ায় কারিয়া মজা,
পিতৃসহ বন্দী আছ, হর্য্যক্ষের জালে ।
তুমি যারে কৃপা কর, সেই হয় ভাগ্যধর—
সিংহেরে চরণ দিয়ে কতই বাড়ালে ।
জনমি ব্রাহ্মণ কুলে, শতদল পদ্ম তুলে
আমি পূজে পাদপদ্মে, পড়িনু আড়ালে !
রুটি মাখন খাব মাগো ! আলোচাল ছাড়ালে !

৬

এই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন,
সিংহের গভীর কণ্ঠ, ইংরেজ কামান ।
দুড়ুম দুড়ুম দুম, প্রভাতে ভাঙ্গায় ঘুম,
দুপুরে প্রদোষে ডাকে, শিহরয় প্রাণ !
ছেড়ে ফেলে ছেঁড়াধুতি, জলে ফেলে খুঙ্গী পুঁথি,
সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ সন্তান ।

লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বসো মটন খাই।
দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান।
সোলা-টুপি মাথায় দিয়ে পাব জগতে সম্মান॥

৭

এনেছ মা বিঘ্ন-হরে কিসের কারণে?
বিঘ্নময় এ বাঙ্গালা, তাকি আছে মনে?
এনেছ মা শক্তিধরে, দেখি কত শক্তি ধরে?
মেরেছ মা বারে বারে দুষ্টাসুরগণে॥
মেরেছে তারকাসুর, আজি বঙ্গ ক্ষুধাতুর,
মার দেখি ক্ষুধাসুর, সমাজের রণে?
অসুরে করিয়া ফের, মাযেপোয়ে মারুলে ঢের।
মার দেখি এ অসুরে, ধরি ও চরণে॥
তখন—"কত নাচ গো রণে!" বাজাব প্রফুল্ল মনে॥

৮

তোমার মহিমা মাতা বুঝিতে নারিনু,
কিসের লাগিয়ে আন কাল বিষধরে?
ঘরে পরে বিষধর, বিষে বঙ্গ জর জর,
আবার এ অজগর দেখাও কিঙ্করে?
হই মা পরের দাস, বাঁধি আঁটি কেটে ঘাস,
নাহিক ছাড়ি নিঃশ্বাস, কালসাপ ডরে।
নিতি নিতি অপমান, বিষে জর জর প্রাণ,
কত বিষ, কণ্ঠ মাঝে, নীলকণ্ঠ ধরে?
নিরন্তর বিষের জ্বালায় প্রাণ ছট ফট করে!

৮

দুর্গা দুর্গা বল ভাই দুর্গা পূজা এলো
পুঁতিয়া কলার তেড় সাজাও তোরণ।
বেছে বেছে তোল ফুল, সাজাব ও পদমূল,
এবার হৃদয় খুলে পূজিব চরণ॥
বাজা ভাই ঢাক ঢোল, কাড়ানাগরা গণ্ডগোল,
দেব ভাই পাঁটার ঝোল, সোনার বরণ॥

ন্যায়বত্ন এসো সাজি,	প্রতিপদ হলো আজি,
জাগাও দেখি চণ্ডীরে বসায়ে বোধন ?

১০

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু—ছায়া রূপ ধরে!
কি পুঁথি পড়িলে বিপ্র! কাঁদিল হৃদয়।
সর্ব্বভূতে সেই ছায়া,	পবিত্র হইল কায়া,
ঘুচিবে সংসাব মায়া, যদি তাই হয়॥
আবাব কি শুনি কথা!	শক্তি নাকি যথা তথা ?
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, শক্তিরূপে রয় ?
বাঙ্গালি ভূতেব দেহ—	শক্তি ত না দেখে কেহ,
ছিলে যদি শক্তিরূপে, কেন হলে লয় ?
আদ্যাশক্তি শক্তি দেহ!	জয় মা চণ্ডীব জয়!

১১

পরিল এ বঙ্গ বাসী, নূতন বসন,
জীবন্ত কুসুম সজ্জা, যেন বা ধরায়
কেহ বা আপনি পরে,	কেহ বা পবায় পরে,
যে যাহাবে ভালবাসে, সে তাবে সাজায়।
বাজারেতে হুড়াহুড়ি,	আপিসেতে তাড়াতাড়ি,
মিঠাই মণ্ডাব ছড়াছড়ি, ভাত কেবা খায় ?
সুখের বড় বাড়াবাড়ি,	টাকার বেলা ভাঁড়াভাঁড়ি
এই দশা ত সকল বাড়ী, দোষিব বা কায় ?
বর্ষে বর্ষে তুমি, মাগো, বড়ই টাকার দায়!

১২

হাহাকার বঙ্গদেশে, টাকার জ্বালায়।
তুমি এলে শুভঙ্করি! বাড়ে আরও দায়।
কেন এসো কেন যাও,	কেন চাল্ কলা খাও,
তোমার প্রসাদে যদি টাকা না কুলায়।
তুমি ধর্ম্ম তুমি অর্থ,	তাঁর বুঝি এই অর্থ,
তুমি মা টাকা-রূপিনী, ধরম-টাকায়।
টাকা কাম, টাকা মোক্ষ,	রক্ষ মাতঃ রক্ষ রক্ষ,
টাকা দাও লক্ষ লক্ষ, নৈলে প্রাণ যায়।

টাকা ভক্তি টাকা নতি, টাকা, মুক্তি টাকা গতি,
না জানি ভকতিস্তুতি, নমামি টাকায়!
হা টাকা যো টাকা দেবি, মরি যেন টাকা সেবি,
অন্তিমকালে, পাই যেন রূপার চাকায়?

১৩

তুমিই বিষ্ণুর হস্তে সুদর্শন চক্র,
হে টাকে। ইহ জগতে তুমিই সুদর্শন।
শুন প্রভু রূপচাঁদ, তুমি ভানু তুমি চাঁদ,
ঘরে এসো সোনার চাঁদ, দাও দরশন॥
আমরি কি হেরি শোভা, ছেলে বুড়ার মনোলোভা,
হৃদে ধর বিবির মুণ্ড, লতায় বেষ্টন।
তব ঝন্ ঝন্ নাদে, হারিয়া বেহালা কাঁদে,
তম্বুরা মৃদঙ্গ বীণ কি ছার বাদন!
পসিয়া মরম-মাঝে, নারীকণ্ঠ মৃদু বাজে,
তাও ছার, তুমি যদি কর ঝন্ ঝন্।
টাকা টাকা টাকা টাকা! বাক্সতে এসোরে ধন!

১৪

তোর লাগি সর্ব্বত্যাগী, ওরে টাকা ধন!
জনমি বাঙ্গালী-কুলে, ভুলিনু ও রূপে!
তেয়াগিনু পিতা মাতা, শত্রু যে ভগিনী ভ্রাতা,
দেখি মারি জাতি গোষ্ঠী, তোরে প্রাণ সুঁপে!
বুঝিয়া টাকার মর্ম্ম, ত্যজিছি যে ধর্ম্ম কর্ম্ম,
করেছি নরকে ঠাঁই, ঘোর কৃমিকূপে॥
দুর্গে দুর্গে ডাকি আজ, এ লোভে পড়ুক বাজ!
অসুরনাশিনি চণ্ডি, আয় চণ্ডী রূপে!
এ অসুরে নাশ, মাত! শুম্ভে নাশিলে যেরূপে!

১৫

এসো এসো জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী উমে!
হিসাব নিকাশ আজি, করি তব সঙ্গে।
আজি পূর্ণ বারমাস, পূর্ণ হলো কোন্ আশ?
আবার পূজিব তোমা, কিসের প্রসঙ্গে?

সেই ত কঠিন মাটি, দিবা রাত্রি দুখে হাঁটি,
সেই রৌদ্র সেই বৃষ্টি, পীড়িতেছে অঙ্গে।
কি জন্য গেল বা বর্ষ? বাড়িয়াছে কোন হর্ষ?
মিছামিছি আয়ুঃক্ষয়, কালের ভ্রূভঙ্গে।
বর্ষ কেন গণি তবে, কেন তুমি এসো ভবে,
পিঞ্জর যন্ত্রণা সবে, বনের বিহঙ্গে?
ভাঙ্গ মা দেহ-পিঞ্জর! উড়িব মনের রঙ্গে।

১৬

ওই শুন বাজিতেছে শুম্ গাম্ শুম্
ঢাক ঢোল কাড়া কাঁশি, নৌবত নাগরা।
প্রভাত সপ্তমী নিশী, নেযেছে শঙ্করী পিশী,
রাঁধিবে ভোগের রান্না, হাঁড়ি মাল্‌শা ভরা।
কাঁদি কাঁদি কেটে কলা, ভিজাইযাছি ডাল ছোলা,
মোচা কুমড়া আলু বেগুন, আছে কাঁড়ি করা॥
আর মা চাও বা কি? মট্‌কিভরা আছে ঘি,
মিহিদানা সীতাভোগ, লুচিমনোহরা!
আজ এ পাহাড়ে মেযের, ভাল করো পেট ভরা

১৭

আর কি খাইবে মাতা? ছাগলের মুণ্ড?
রুধিরে প্রবৃত্তি কেন হে শান্তিরূপিণি।
তুমি গো মা জগন্মাতা, তুমি খাবে কার মাথা?
তুমি দেহ তুমি আত্মা, সংসারব্যাপিনি।
তুমি কার কে তোমার, তোর কেন মাংসাহার?
ছাগলে এ তৃপ্তি কেন, সর্ব্বসংহারিণি?
করি তোমায় কৃতাঞ্জলি, তুমি যদি চাও বলি,
বলি দিব সুখ দুঃখ, চিত্তবৃত্তি জিনি:
ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাং! নাচ গো রণরঙ্গিণি।

১৮

ছয় রিপু বলি দিব, শক্তির চরণে
ঐশিকী মানসী শক্তি! তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ি!

বলি ত দিয়াছি সুখ, এখন বলি দিব দুখ,
শক্তিতে ইন্দ্রিয় জিনি হইব বিজয়ী।
এ শক্তি দিতে কি পার ? ঠুসে তবে পাঁটা মার,
প্রণমামি মহামায়ে তুমি ব্রহ্মময়ী।
নৈলে তুমি মাটির ঢিপি, দশমীতে গলা টিপি,
তোমার ভাস্‌বে গাঁজা টিপি, সিদ্ধি রস্ত কই।
ঐটুকু মা লাভ দেখি, পুজি তোমায়, মৃণ্ময়ি।

১৯

মন বোতলে ভক্তি-ধেনো বাধিয়াছি তাবা,
এঁটেছি সন্দেহ-ছিপি বিদ্যার গালাতে।
শিখিয়াছি লেখা পড়া, ঠাকুর দেবতায় মেজাজ্ কড়া,
হইয়াছি আধ পোড়া, সংসার জ্বালাতে।
সাহেবের হুকুম চড়া, গৃহিণীব নথনাড়া,
ঋণে কর্‌লে দেশ ছাড়া, পাবি না পালাতে।
তাতে আবার তুমি এলে, টাক ব হিসাব না কবিলে,
এতে কি মা ভক্তি মেলে সংসার লীলাতে ?
বোতলে এঁটেছি ছিপি ! পার কি তুমি খোলাতে ?

২০

কাজ নাই সে কথায় ; পূজা কব সবে।
দেশের উৎসব এ যে ঠেলিতে কে পারে ?
কর সবে গণ্ডগোল, দাও গোলে হবিবোল,
সাপুটি পাঁটার ঝোল ফিরি দ্বারে দ্বারে—
যাত্রার লেগেছে ধুম, ছেলে বুড়ার নাহি ঘুম,
দেখ না জ্বলিছে আলো বঙ্গের সংসারে।
দেখ না বাজনা বাজে, দেখ না রমণী সাজে,
কুসুমিত তরু যেন কাতারে কাতারে।
তবু ত এনেছ সুখ মাতা বঙ্গ-কারাগারে।

২১

বর্ষে বর্ষে এসো মা'গো, খাও লুচি পাঁটা
সোনা কলা কচু ঘেঁচু যা যোটে কপালে,

যে হলো দেশের দশা,　　নাই বড় সে ভরসা,
আস্‌বে যাবে খাবে নেবে, সম্বৎসর কালে।
তুমি খাও কলা মূলো,　　তোমার সন্তান গুলো,
মারিতেছে ব্রাণ্ডি পানি, মুর্গী পালে পালে।
দীন কবি আমি মাতা,　　পাতিয়া আঙ্গট পাতা,
তোমার প্রসাদ খাই, ঘৃত আলো চালে॥
প্রসীদ প্রসীদ দুর্গে, প্রসীদ নগেন্দ্র বালে।

অহং কমলাকান্তস্য ছাত্র
ভীষ্মদেবস্য খোষনবীশ জুনিয়র। M A B L

বাঙ্গালীর বীরত্ব।

আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে একজন বাঙ্গালী গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্বের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ লেখক সয়ের মতাক্‌খরীণ হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।* কিন্তু তিনি হাস্যরসের অনুচিত অবতারণা করিতে যাইয়া দুর্লভ রামের চিত্র অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। মূল ইতিহাসের সহিত তাঁহার কোন কোন কথার ঐক্য নাই। দুর্লভরামের সেনাপতির নাম আতাউল্লা খা নহে, মির আবদুল আজিজ। মারহাট্টারা আসিয়া উপস্থিত হইলে, মির আবদুল আজিজ দুর্লভ রামের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আপনার লোকদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলেই দুর্লভরাম দৌড় মারেন নাই। তিনি বাহিরে আসিয়া দুর্গে যাইবার জন্য পাল্কিতে আরোহণ করেন। মির আবদুল আপনার লোক লইয়া সেই পাল্কির সঙ্গে যাইতে থাকেন। কিছু দূর গেলে মারহাট্টা সৈন্য আসিয়া পড়াতে দুর্লভ রাম পাল্কি ছাড়িয়া কোন ভগ্নগৃহে পলাইতেছিলেন, এমন সময় সেনাপতি আবদুল তাহাকে ধরিয়া ফেলেন, এবং অশ্বে আরোহণ করিতে কহেন। দুর্লভরাম অশ্বারোহণে আবদুল আজিজও তাঁহার সৈন্যদলের সহিত দুর্গে উপনীত হয়েন। তিনি দুর্গমধ্যে বন্দী হয়েন নাই। দুর্লভরাম সন্ন্যাসীদের কথায়, আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। সৈন্যসংক্রান্ত অনেক কর্ম্মচারী দুর্লভরামের প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। কিন্তু মির আবদুল

* Seir Mutaqherin. II. 511—514.

ইহাতে নিতান্ত অসম্মতি প্রকাশ করেন। সন্ন্যাসীদের কুপরামর্শে দুর্লভরামের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল, সুতরাং তিনি সন্ধি করিতেই উদ্যত হয়েন। কয়েক দিন কথাবার্ত্তার পর, দুর্লভরাম গড় হইতে বাহিরে আসিয়া মারহাট্টাপতি রঘুজী ভোঁসলার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের পর তিনি বাসস্থানে ফিরিয়া আসিতে চাহেন, কিন্তু মারহাট্টাপতি তাঁহাকে প্রচণ্ড সূর্য্য তাপের সময় বাসায় যাইতে বারণ করিয়া, সেইখানে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করেন। দুর্লভরাম ও তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রঘুজীর শিবিরে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। এই অবসরে মারহাট্টাগণ তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলে।. আবদুল আজিজের ভ্রাতা, দুর্লভরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও বন্দী হয়েন। কেবল মির আবদুল আজিজ দুর্গে আসিয়া, আপনাদের স্বাধীনতা ও নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সম্মান রক্ষা করেন।

দুর্লভরামের এই পরিচয়ে, বাঙ্গালার ইতিহাসানভিজ্ঞ পাঠক, উদ্দেশে সমস্ত বাঙ্গালীর প্রতি তর্জ্জনী সঞ্চালন করিতে পারেন; সেই জন্য এই স্থলে বাঙ্গালীর বীরত্ব সম্বন্ধে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছা হইতেছে। বাঙ্গালার সকলেই দুর্লভরামের ন্যায় ছিলেন না অদৃষ্টদোষে বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস নাই; বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা করিতেও অনেক বাঙ্গালীর প্রবৃত্তি নাই। এক দুর্লভরামের বিবরণ বঙ্গদর্শনের স্তম্ভে দেখিয়া, অনভিজ্ঞ পাঠক উচ্চ করতালিধ্বনির সহিত বলিয়া উঠিতে পারেন "হো। হো! বাঙ্গালী কবে মানুষ ছিল?"

বাঙ্গালার পূর্ব্ব গৌরব অনেক ছিল, বাঙ্গালীর পূর্ব্ববীরত্বও অনেক ছিল, আপনাদের পূর্ব্ব গৌরবকাহিনী শুনিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, এবং উপকার ভিন্ন অপকার নাই। যাঁহাদের মনোবৃত্তি বিকারগ্রস্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইহাতে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য আমাদের এই প্রয়াস নয়।

রঘুবংশে কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় বাঙ্গালীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥(১)

ইহাতে বোধ হইতেছে, কালিদাস যখন রঘুবংশ লিখেন, তখন বাঙ্গালী নৌযুদ্ধে পটু ছিল এবং তখন বাঙ্গালী স্বাধীন ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, বালী ও

(১) সেনানায়ক সেই রঘু, রণতরী আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত বঙ্গবাসিদিগকে পরাজয় করিয়া গঙ্গার মধ্যস্থ দ্বীপে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিলেন।

যবদ্বীপেও বাঙ্গালীর জয়পতাকা উড়িয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক বাজ্য জয়ে বাঙ্গালী যেমন যোগ্যতা দেখাইযাছে, এমন ভারতবর্ষেব আব কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই।

পাল ও সেনবংশেব বীবত্বেব বিববণ আজও বাঙ্গলা উজ্জ্বল কবিয়া বাখিরাছে। মুঙ্গেরে যে একখানি তাম্রশাসন পত্র পাওযা যায়, তাহাতে লিখিত আছে, গৌড়েব অধিপতি দেবপাল দেব মুদ্গগিবিতে (মুঙ্গেরে) শিবির সন্নিবেশ কবিয়া অবস্থান কবিযাছিলেন, তাঁহাব যুদ্ধাশ্ব কাম্বোজ দেশে (২) উপনীত হইযাছিল। (৩) বাজসাহীব অনুসাসন পত্রেও মহারাজ লক্ষ্মণসেনেব এইরূপ দিগ্বিজয় বর্ণনা দেখা যায়।* ইতিহাসেব পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, উড়িষ্যাব গঙ্গাবংশীয রাজারা অত্যন্ত পবাক্রান্ত ছিলেন ; এই গঙ্গাবংশীয়দিগেব আদিপুরুষ বাঙ্গালী। তমোলুক ও মেদিনীপুব প্রদেশে ইহাদেব আবাস ছিল (৪) হণ্টর সাহেব লিখিযাছেন,বিষ্ণুপুবের বাজাগণ মুসলমান হইতে আপনাদেব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন (৫) অতএব বাঙ্গালী পূর্ব্বে নিতান্ত ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।

আবার আমাদেব একজন সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে যাইযা, বাঙ্গালীর সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, পাঠক তাহাও শুনুন। বাঙ্গালাব ইতিহাসে ইঁহাব সবস লেখনী হইতে এই বাক্য নির্গত হইযাছে :—

"পাঠানেবাই এতদ্দেশে মুসলমান জযপতাকা উড্ডীন কবেন। ৩৭২ বৎসব পবে তাঁহাদিগেব বাজত্বেব শেষ সময়ে, এ দেশেব কতদূব তাঁহাদিগেব অধিকৃত ছিল, একবাব বিবেচনা কবিযা দেখা মন্দ নহে। পশ্চিমে বিষ্ণুপুব ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগেব ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই , দক্ষিণে সুন্দববনসন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দু বাজা ছিল , পূর্ব্বে চট্টগ্রাম নোযাখালী এবং ত্রিপুবা, আবাকানরাজ ও ত্রিপুবাধিপতিব হস্তে ছিল ; এবং উত্তবে কুচবিহার স্বতন্ত্রতা বক্ষা করিতেছিল। সুতবাং যে সময়ে পাঠানেবা উড়িষ্যা জয় কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহাবা ১,৪০,০০০ পদাতিক ৪০,০০০ অশ্বাবোহী এবং ২০,০০০ কামান

(২) কাম্বোজ দেশ সিন্ধুনদেব উত্তরপশ্চিমদিক্‌বর্ত্তী বলিয়া বোধ হয। ইহা অশ্বের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বামায়ণ, পদ্মপুবাণ ও রঘুবংশাদিতে এই দেশের উল্লেখ আছে।

(৩) As. Res. vol. I. 125.

* Journ. As. Soo. Beng. 1865. Part I.

(৪) Wilson's Preface to Mackenzie Collection. CXXVIII.

(৫) Hunter's Annals of Rural Bengal. ১২৮১ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনের ঐতিহাসিকভ্রম শীর্ষক প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের সবিস্তার বিবরণ

দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও এ দেশের অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই।"(৬)

এ গুলি প্রকৃত ইতিহাসের কথা। বাঙ্গালার সুবিজ্ঞ সমালোচক ও সুপ্রসিদ্ধ লেখক এই কথা উদ্ধৃত করিয়া অভিমানের সহিত বলিয়াছিলেন,"বাঙ্গালার অধঃপতন একদিনে ঘটে নাই।" (৭) চারি বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশবৎসল বাঙ্গালি, স্বদেশের পূর্ব্বতন গৌরবে উন্নত হইয়া বঙ্গদর্শনে যে সরল ভাবে সে সবল বাক্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, চারি বৎসর পরেও আজ আমরা সেই বঙ্গদর্শনে সেই সরলভাবে সেই সরল বাক্যের পুনরুল্লেখ করিতেছি :— "বাঙ্গালার অধঃপতন একদিনে ঘটে নাই।"

পাঠানেরা যে কেবল সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র লইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছে, এ কথা মিথ্যা। বাঙ্গালায় পাঠানের উদয়, স্থিতি ও বিলয় হইয়াছে তথাপি অনেক স্থানে অনেক বাঙ্গালী আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে। ইহার পর মোগলের আধিপত্য সময়েও বাঙ্গালীর বীর্য্যবহ্নি নিবিয়া যায় নাই। যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নাম আমাদের দেশের সকলেই জানেন। প্রতাপাদিত্য কখনও কাপুরুষের ন্যায় আপনার স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই, এবং কখনও কাপুরুষের ন্যায় দিল্লীর সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। আমাদের দেশে যে সকল পরাক্রান্ত বার ভুঁইয়ার বিবরণ শুনা যায়, প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের অন্যতম। প্রতাপাদিত্য ব্যতীত আরও অনেক পরাক্রমশালী ভুঁইয়ার নাম করা যাইতে পারে, ইহাদের দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল, যুদ্ধপোত ছিল। ইহারা যুদ্ধস্থলে বীরত্ব দেখাইতেন, সাহস দেখাইতেন। ইহারা সৈন্য দিয়া, অস্ত্র দিয়া, যুদ্ধপোত দিয়া বাদসাহের সাহায্য করিতেন।* ইহারা গৌড়ের অধিপতির অধীনে থাকিয়া, শেষে আপনাদের ক্ষমতাবলে স্বাধীন হয়েন। ইহাঁরা কাহাকেও কর দিতেন না, বা কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ইহাঁরা আপনা আপনি স্বাধীন

আছে। কুতূহলপর পাঠক ঐ প্রবন্ধটী পড়িয়া দেখিবেন। যাঁহারা উহা পড়েন নাই আমরা এ স্থলে কেবল তাঁহাদের জন্য কয়েকটি মোটামুটি কথা ঐ প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিলাম।

(৬) শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস। ৩৬।৩৭ পৃষ্ঠা

(৭) বঙ্গদর্শন। তৃতীয় খণ্ড, (১২৮১)। ৪৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

* আইন আক্‌বরীতে লিখিত আছে বাঙ্গালার জমীদারেরা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী ৮,০১,১৫৮ পদাতিক ১,১৭০ গজ, ৪,২৬০ কামান ৪,৪০০ নৌকা যোগাইতেন। Gladwin's Aini Akbari vol. II, ও রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ৩৮ পৃষ্ঠ দেখ।

রাজা হইয়া, যুদ্ধের জন্য এবং পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যুদের আক্রমণ নিবারণ জন্য সৈন্য ও সামরিক পোত রাখিতেন।* অতএব বাঙ্গালী পূর্ব্বে বীরত্বশূন্য ছিল না।

আমরা এস্থলে এই বলবীর্য্যশালী বাঙ্গালী ভূস্বামীদিগের আরও দুই এক জনের নাম করিব। খিজিরপুরের (৮) ঈশাখাঁর বীরত্বের বিবরণ আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর লিখিত কোন বাঙ্গালা ইতিহাসে উঠে নাই। ঈশাখাঁ এই নাম শুনিয়াই অনেকে মনে করিতে পারেন, এব্যক্তি পাঠান ছিল, সুতরাং ইহার কথা তুলিয়া বাঙ্গালার বীরত্বের গৌরব করা অসঙ্গত। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি ঈশাখাঁর পিতা হিন্দু ছিলেন। তাঁহার নাম কালিদাস। হুসেন সার রাজত্ব সময়ে (খ্রীঅব্দে ১৪৯৩—১৫২০) কালিদাস মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং ঈশাখাঁ পাঠান নহেন, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর সন্তান, বিশেষ বাঙ্গালী।

ঈশাখাঁ সুবর্ণগ্রামে আধিপত্য করিতেন, সমস্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা তাঁহার অধীনে ছিল। তিনি আসামের অন্তর্গত বাঙ্গামাটীতে, বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের অপর পারস্থ ত্রিবেণীতে, এবং যেস্থানে লাক্ষ্যানদী ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়াছে সেইস্থানের নিকটবর্ত্তী এগারসিন্ধুতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৫৮৩ খ্রীঅব্দে রালফ ফিচ নামে একজন ভ্রমণকারী সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হয়েন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই সমস্ত দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশাখাঁ। তিনি অন্যান্য অধিপতিদিগের মধ্যে প্রধান, এবং খ্রীষ্টানদিগের পরমবন্ধু (৯)। ১৫৮৫ খ্রীঅব্দে দিল্লীশ্বরের সেনানী সাহাবাজ খাঁ অনেক সৈন্য সামন্তের সহিত পূর্ব্ব বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন, কিন্তু ঈশাখাঁর পরাক্রমে তাঁহার এই দেশ জয়ের চেষ্টা বিফল হয়। সাহাবাজ খাঁ পরাভূত হইয়া প্রস্থান করেন। ঈশাখাঁর স্বাধীনতা অটল থাকে। এই সময়ে ঈশাখাঁর জয়পতাকা গোবাঘাট হইতে সমুদ্র তট পর্য্যন্ত উড়িয়াছিল।

---

* "The Bhuyas * * had been dependants of the king of Gour, but had acquired independence by force of arms. They refused to pay tribute, or to acknowledge allegiance to any one. From being prefects appointed by the king, they had become kings, with armies and fleets at their command, ever ready to wage war against each other or to oppose the invasion of Portuguese pirates and Mag freebooters."—Journ. As. Soc. Beng. XLV. 182—183.

(৮) খিজিরপুর বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের প্রায় এক মাইল উত্তরে অবস্থিত।

(৯) "In 1586, Ralph Fitch visited Sunargon and remarked that the chief king of all these countries was called Isacan, and he was the chief of all the other kings, and was a great friend to the Christians." Ibid XLIII. 210.

১৫৯৫ খ্রীঅব্দে সম্রাট্ আকবরের আদেশে ক্ষত্রিয়বীরশ্রেষ্ঠ রাজা মানসিংহ আবার বাঙ্গালা জয় করিতে উপস্থিত হয়েন। তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া ঈশাখাঁর এগারসিন্ধুর দুর্গ অবরোধ করেন। ঈশাখাঁ, তখন উপস্থিত ছিলেন না, দুর্গের অবরোধ সংবাদ শুনিয়া, অবিলম্বে সৈন্যগণের সহিত এগারসিন্ধুতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ কোন কারণ বশতঃ অসন্তুষ্ট হইয়া, যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইল। ঈশাখাঁ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি রাজা মানসিংকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিয়া কহিলেন, এই যুদ্ধে যে জীবিত থাকিবে, সেই বাঙ্গালা একা ভোগ করিবে। মানসিংহ ঈশাখাঁর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু ঈশাখাঁ অশ্বারোহণে যুদ্ধস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী একজন তরুণবয়স্ক যুবক, রাজা মানসিংহ নহেন। মানসিংহের জামাতা। ইহার সহিতই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মানসিংহের জামাতা নিহত হইলেন। ঈশাখাঁ মানসিংহকে ভীরু বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া, শিবিরে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু শিবিরে আসিতে না আসিতেই সংবাদ আসিল, রাজা মানসিংহ "সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ" হইয়াছেন। সম্বাদ পাওয়া মাত্র ঈশাখাঁ অশ্বারোহণে তড়িৎ গতিতে সমর ভূমিতে উপস্থিত হইয়া, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, যাবৎ তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাজা মানসিংহ বলিয়া ভালরূপ চিনিতে না পারিবেন, তাবৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। শেষে ঈশাখাঁ ভাল করিয়া চিনিলেন যে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী যথার্থই রাজা মানসিংহ, সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম আক্রমণেই মানসিংহের তরবারি বিনষ্ট হইয়া গেল। ঈশাখাঁ আপন তরবারি রাজাকে দিলেন, কিন্তু রাজা তাহা গ্রহণ না করিয়া অশ্ব হইতে নামিলেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ ঈশাখাঁও অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া, নিরস্ত্র রাজার সহিত মল্ল যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। মানসিংহ আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বীর উদারতা সাহস ও বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ক্ষত্রিয় বীর, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। ঈশাখাঁকে আপ্যায়িত করিয়া অনেক উপহার দিয়া বিদায় দিলেন (১০)।

ঈশাখাঁ ইহার পর রাজা মানসিংহের

(১০) "When Man Sing invaded Bengal about 1595, he advanced to Igarasindhu and besieged the garrison of the fort. Isakhan hastened to its relief, but his troops were disaffected and refused to fight. He, however, challenged Man Sigh to single combat, stipulating that the survivor should recieve peaceable possession of Bengal. Man Singh accepted the challenge and its conditions but when Isakhan rode into the lists, he recognized in his apponent a young man, the son-in-law of the Raja. They fought and the latter was slain. Upbrading Man Singh for his cowardice, Isakhan returned to his

সহিত আগ্রাতে সম্রাট্ আক্বরের নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে এই স্থানে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হইল। শেষে সম্রাট্ যখন এগার সিন্ধুর দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণ শুনিলেন, তখন কালবিলম্ব না করিয়া ঈশাখাঁকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে "দেওয়ান" ও "মসনদই আলি" উপাধি দিয়া বাঙ্গালার অনেক পরগণা দিলেন (১১) ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একজন বাঙ্গালীর এইরূপ বীরত্ব ও সাহসের বিবরণ পাওয়া যায়। এক্ষণে ঈশাখাঁর বংশধরেরা পূর্ব্ব বাঙ্গালার সম্ভ্রান্ত জমীদার বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাঁহাদের বংশের সে সাহস সে বীর্য্য এক্ষণে অনন্ত কালের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

ঈশাখাঁকে ছাড়িয়া দিলেও বলবীর্য্যশালী খাটি হিন্দু বাঙ্গালীর অভাব হইবে না। বিক্রমপুরের কায়স্থবংশীয় চাঁদ রায় ও কেদার রায় পরাক্রান্ত ভূস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। যে ঈশাখাঁর বীরত্বে মোগল সেনানী বিস্মিত হয়েন সেই ঈশাখাঁর সহিত এই দুই ভ্রাতার সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইত। ঈশাখাঁর সহিত যুদ্ধ চাঁদরায় ও কেদার রায় দীর্ঘকাল আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। বাক্লা চন্দ্রদ্বীপের (বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলা) কন্দর্প নারায়ণ রায়, ও সুন্দরবনের সন্নিহিত প্রদেশের মুকুন্দরামও বীরত্বে বিখ্যাত ছিলেন। ১৫৮৬ খ্রীঅব্দে রালফ ফিচ বাক্লাচন্দ্রদ্বীপ দর্শন করেন, তাঁহার লিখিত বিবরণে স্পষ্ট বোধ হয়, বাক্লা চন্দ্রদ্বীপ বর্ত্তমান স্বাধীন রাজাদিগের শাসিত রাজ্য অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। কন্দর্প নারায়ণের অনেক সমরপোত ছিল। অদ্যাপি তাঁহার একটী পিত্তলের কামান চন্দ্রদ্বীপে আছে। ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী "চরমুকুন্দিয়া" নামক স্থানে মুকুন্দরামের অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম দিল্লীশ্বরের

---

camp. Scarely had he done so, when word was brought to him that Man Singh himself was in the field. He again mounted and galloped to the ground but refused to engage with his opponent until satisfied of his identity. Being assured that Man Singh was opposed to him, the combat began. In the first encounter Man Singh lost his sword. Isakhan offered his, but without accepting it Man singh dismounted. His adversary did the same, and desired him to have a wrestling bout. Instead of acceding to his wish, Man Singh, struck by the generosity and chivalry of the man embraced him as a friend. After entertaining Isakhan, he loaded him with presents on his taking leave."—J. A. S. Bengal XLIII. 213—214.

(১১) "On their arrival at Agrah, Isakhan was thrown into prison but when the story of the combat at Igarasindhu was told the Emperor ordered his immediate release, conferred on him the titles of Diwan and Masnad i Ali, and gave him a grant of numerous parganas in Bengal."—Ibid 214.

একজন সেনানীকে যুদ্ধে নিহত করেন। তাঁহার পুত্র শত্রুজিৎও দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বাঙ্গালীদিগের এইরূপ প্রতাপ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা যশোহরের রাজা সীতারামকে দেখিতে পাই। কেহ কেহ সীতারামকে একজন ডাকাইত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা ইহাতে সায় দিই না। সীতারাম এক জন পরাক্রান্ত হিন্দু জমীদার। সে সময়ে বাঙ্গালায় আর কেহই সাহসে ও বীরত্বে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর নামে অদ্যাপি যশোহরের লোকের হৃৎকম্প হইয়া থাকে। সীতারামের পরাক্রম যখন বাড়িয়া উঠে, তখন বাহাদুরসা ও ফিরোখ সাহা যথাক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন। এই সময়ে যশোহর জেলা দ্বাদশ চাক্‌লায় বিভক্ত ছিল। এই সকল চাক্‌লার অধিস্বামিগণ বাদশাহকে কর দিতেন না। বাদশাহ সীতারামের পরাক্রমের কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকেই এই অবাধ্য জমীদারদিগকে বশীভূত করিতে অনুরোধ করেন। সীতারাম বাদশাহের আদেশ লিপি পাইয়া, অবিলম্বে অবাধ্য জমীদারদিগকে দমন করিয়া দ্বাদশ চাক্‌লার অধিকারী হয়েন এবং বাদশাহ হইতে এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ রাজা উপাধি লাভ করেন। ইহার পর সীতারাম বাঙ্গালার নবাবের অধীনতা উচ্ছেদ করিলে, নবাব তাঁহার শাসন জন্য অনেকবার সৈন্য পাঠান, কিন্তু সীতারামের বীরত্বে নবাবের সৈন্য বারম্বার পরাভূত হয়। নবাব অবশেষে অনেক সৈন্যের সহিত স্বীয় জামাতা আবুতরাবকে প্রেরণ করেন, মহাপরাক্রম মেনাহাতী সীতারামের অনুপস্থিতিতেই, এই সৈন্যদল পরাজয় করেন, এবং নবাব জামাতা আবুতারাবের ছিন্ন মস্তক আনিয়া, সীতারামকে দেখান। পূর্ব্বে বাঙ্গালি শত্রুর আক্রমণে দৌড় মারিত না।

যে সময়ে দুর্লভরাম বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ে রাজা কীর্ত্তিচাঁদ ও রাজা রামনারায়ণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। মস্তাফার্খা যখন বিদ্রোহী হইয়া অলিবর্দ্দিখাঁর সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আজিমাবাদ আক্রমণ করেন, তখন তথাকার দেওয়ান জৈন উদ্দীন, কীর্ত্তিচাঁদ ও রামনারায়ণের হস্তে সৈন্যাধ্যক্ষতা সমর্পন করেন*। ইহারা অন্যান্য মুসলমান সেনাপতির ন্যায় মস্তাফাখাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকের মতে সিরাজউদ্দৌলার

* "The command of the army was divided into several brigades, and every one of them put under the orders of a commander that could be depended upon, the first was Abdool-allyqhan, * * the second Ahmed-qhan Coreishy, the third Raja Kritichand * * the

সেনাপতি দেওয়ান মাণিকচাঁদ ও মোহন লাল বাঙ্গালি। সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতায় ইংরেজদের দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন মাণিকচাঁদ, আক্রমণকারী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ ছিলেন†। পলাসির যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মিরজাফর বিশ্বাসঘাতক হইয়া সিরাজউদ্দৌলাকে কুপরামর্শ না দিলে, পলাসির যুদ্ধে জয়ী হওয়া ক্লাইবের ভার হইত। বাঙ্গালি এক সময়ে বিটীষ তেজের নিকটেও অবনত হয় নাই।

আমরা আর অধিক উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইতে চাহি না। যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতে বাঙ্গালি ব্রিটিষ অধিকারের পূর্ব্বে কিরূপ ক্ষমতাপন্ন ছিল, বুঝা যাইবে। আমরা এস্থলে বাঙ্গালির সাহসের একটি উদাহরণ দিব। ইতিহাস নির্দ্দেশ করে যে, সুরবংশীয় ফরিদ স্বহস্তে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া 'সেরশাহ' নাম ধারণ করেন। একাকী একটা বাঘকে মারিয়া ফেলাতে ইতিহাসে সের আফগানের সাহসের কতই প্রশংসা করে। ফরিদ যে সাহস দেখাইয়া ইতিহাসে নাম রাখিয়াছেন, হতভাগ্য বাঙ্গালার একজন হিন্দু যুবকও এক সময়ে সেই সাহস দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসের পত্রে আজ পর্য্যন্তও তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। এই বাঙ্গালি যুবকের নাম উদয়নারায়ণ, বাসস্থান ঢাকার অন্তঃপাতী উলাইল পরগণা। উদয়নারায়ণের মজুমদার উপাধি, মিত্রবংশীয়। বাক্লাচন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প নারায়ণের বংশের সহিত ইঁহার নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে কন্দর্প নারায়ণের বংশ লোপ হইলে, তাহাদের সমস্ত ভূসম্পত্তি উদয়নারায়ণের হস্তগত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে মুর্সিদাবাদের নবাব বংশের এক ব্যক্তি উদয়নারায়ণকে এই সম্পত্তির অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন, উদয়নারায়ণ মুর্সিদাবাদে যাইয়া নবাবের দরবারে ইহা জানাইলে, নবাব কহেন, যদি উদয়নারায়ণ স্বহস্তে একটি ব্যাঘ্র বধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি দেওয়া যাইবে। উদয়নারায়ণ বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন, নবাবের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। অবিলম্বে একটী ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং অস্ত্রসঞ্চালনকৌশলে তা-

---

fourth Raja Ramnarayan, the fifth Ahadan Husenkhan, and the sixth Nasar Alykhan. Seir Mutaqherin. II. 487.

† "* * * Manikchand, the governor of Hugli, who commanded a considerable body of troops in the army before the fort * * *."— Orm's Hindustan II. 72.

হাকে হত্যা করিয়া আপন সম্পত্তির অধিকারী হইলেন (১১)। বাঙ্গালি পূর্ব্বে বেস বলশালী ছিল, সাহসী বলিয়াও বিখ্যাত ছিল।

এক্ষণে যাঁহারা আপনাদের বাসগ্রামে বানরের পাল আসিলে, মহাভীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্তির আশায় সংবাদ পত্রে আর্ত্তস্বরে চীৎকার আরম্ভ করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদের ন্যায় অপদার্থ ছিলেন না। আর যাঁহারা দুর্ল্লভরামের অদ্ভুত বীরত্বে উচ্চ হাস্যের সহিত করতালি দেন, তাঁহাদিগকে বলি, বাঙ্গালি পূর্ব্বে সাহসশূন্য ও বীরত্বশূন্য ছিল না, এবং বাঙ্গালা এক দিনেই অধঃপাতে যায় নাই।

রাগনির্ণয়।

নারদ সংহিতায় নিম্নলিখিত রাগ রাগিণীর নাম পাওয়া যায় যথা—

"মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগাঃ
প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

মালব, মল্লার, শ্রীরাগ, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাট এই ছয় রাগ। ইহাদের ভার্য্যা যথা—ধমনী, মালসী, রামকিরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী, ভৈরবী। (মালব ভার্য্যা) বেলাবলী, পূরবী, কনড়া, মাধবী, গোড়া, কেদারিকা, (মল্লারের স্ত্রী) গান্ধারী, সুভগা, গৌরী, কৌমারী, বল্লবী, বৈরাগী, (শ্রীরাগের ভার্য্যা) তুড়া, পঞ্চমী, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুর্জ্জরী, বিভাষা, (বসন্ত রাগের প্রিয়া) ইত্যাদি। মালবী, দীপিকা, দেশকারী, পাহাড়ী, বরাড়ী, মারহাটী, (হিন্দোলের ভার্য্যা) নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী, কল্যাণী, (কর্ণাটের ভার্য্যা)

হনুমন্মতে রাগ রাগিণীর অনেক প্র-

(১১) 'With the grandson of this Basideb Rai the line of the Bose Rajas of Chandradip become extinct. He was succeeded by a cousin Udayanarayan of the Mitter Mazumder family of Ulail, in the neighbourhood of Dhaka, whose descendants still represent the Raja's of Chandradip Shortly after his accession, Udayanarayan was expelled from his estates by a relative of the Nawab of Murshidabad. Udaya proceeded to the court, but the Nowab refused to reinstate him, unless he fought and overcame a tiger. Udaya young and fearless, accepted the terms, and being skilled in the use of weapons he encountered the brute and killed it. In this way he regained his ancestral property.' —J. A. S. B. XLIII. 209.

ভেদ দেখা যায় যথা— ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘরাগ, এই ছয় পুরুষ রাগ যথা—

ভৈরবঃ কৌশিক শ্চৈব হিন্দোলো দীপ-
কস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষা
স্মৃতাঃ॥

ইহাদের স্ত্রীগণ—

মধ্যমাদী, ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটিকা, সৈন্ধবী, (ভৈরবের স্ত্রী) তোড়ী, খাম্বাবতী, গৌরী, গুণক্রী, ককুভা, (কৌশিকের ভার্য্যা) বেলবলী, রামকিরী, দেশা, পটমঞ্জরী, ললিতা, (হিন্দোলের ভার্য্যা) কেদারা, কানড়া, দেশী, কামোদী, নাটিকা, (দীপকের ভার্য্যা) বাসন্তী, মালবী, মালশ্রী, ধনাসী, আশাবরী, (শ্রীরাগের স্ত্রী) মল্লারী, দেশকারী, ভূপালী, গুর্জ্জরী, টঙ্গ, পঞ্চমী, (মেঘরাগের পত্নী।)

এই সকল মতভেদ থাকায় বুঝা যায় না যে, কোন ছয় রাগ এবং কোন ছয় রাগিণী প্রথমে প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীরাগটি সকল মতেই আছে। বস্তুতঃ—"ন তালানাং ন রাগাণাং অন্তঃ
কুত্রাপি বিদ্যতে।"

হনুমান্, বলিয়াছেন যে, রাগরাগিণীর ও তালের অন্ত নাই। তাহার পরেই বলিয়াছেন,

"ইদানীং রাগ রাগিণ্যোরুদাহরণ-
মুচ্যতে॥

তথাপি সম্প্রতি রাগ রাগিণীর উদাহরণ ব্যক্ত করিতেছি। হনুমান্ এইরূপ ভূমিকা করিয়া বহুতর রাগ রাগিণীর লক্ষণ, স্বর, অলঙ্কার, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি বলিয়াছেন। এই মতে রাগ রাগিণীর স্বরঘটিত অবয়বের পূর্ব্বাপেক্ষা তারতম্য আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল সুরগুলি যে পরিপাটীক্রমে বিন্যাস করা হইয়াছে, এ মতে তাহার কোন কোনটিতে ব্যতিক্রম আছে। তাহা দেখান উচিত, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে তাহা সম্ভবে না। হনুমান্ ভৈরবকেই আদি রাগ বলিয়াছেন যথা—

"শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদি রাগঃ।"

হনুমতে এই ভৈরব রাগ ওড়ব। এতদ্ভিন্ন আর এক ভৈরব আছে, রাগার্ণব মতে তাহাকে "শুদ্ধ ভৈরব" বলে। এই শুদ্ধ ভৈরব সম্পূর্ণ। যথা—

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসযুক্তঃ স্যাৎ শুদ্ধ-
ভৈরবঃ।
সকম্প মন্দ্র গান্ধারো গেয়ো মধ্যাহ্নতঃ
পুরা।"

ইহার অংশ, গ্রহ ও ন্যাস স্বর ধৈবত, সকম্পা সুগভীর গান্ধারপ্রধান, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গেয়। যদি ওড়ব জাতীয় ভৈরব রাগ একটী না থাকিত, তাহা হইলে হনুমানোক্ত নিম্নলিখিত ভৈরবীর লক্ষণে সঙ্গতি হইত না। যথা—

"সম্পূর্ণা ভৈরবী জ্ঞেয়া গ্রহাংশ ন্যাস
মধ্যমা।
সৌবেরী মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যম গ্রামচারিণী॥

কশ্চিদেষা ভৈরবরবং স্বরা জ্ঞেয়া বিচ-
ক্ষণৈঃ ॥”

ভৈরবরবং বলিয়া ধ নি স গ ম ইতি ভৈরব স্বর।

এতদ্ভিন্ন রাগার্ণব নামক গ্রন্থেও অনেক মতভেদ এবং অধিক রাগ রাগিণীর কথা আছে।

এখন আর কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মতে গান দেখা যায় না। সকল ব্যক্তিই নানা মত মিশ্র করিয়া গান করেন, এখন যেমন যে সে রাগ, যে সে রসে গীত হয় পূর্ব্বে তাহা হইত না। এক এক প্রকার রাগের এক একটি অনুগত রস আছে। পূর্ব্বকালে যে যে রাগ যে যে রসে গীত হইত, এবং এক্ষণেও হওয়া উচিত তাহা বলা যাইতেছে। সঙ্গীত নারায়ণে ব্যক্ত আছে যে নট্টরাগ সাংগ্রামিকা। দেব—গুপ্তরাগ বীররসে গেয়।

বসন্ত রাগ বসন্ত সময়ে যথা—

ন গেয়ো বসন্তরাগোঽয়ং বসন্তসময়ে
বুধৈঃ।”

ভৈরব রাগ প্রচণ্ড রসে, বঙ্গাল রাগ করুণ ও হাস্যরসে গেয় যথা—

“প্রচণ্ডরূপঃ কিল ভৈরবোঽয়ম।”

“গেয়ঃ করুণ হাস্যয়োঃ” ইত্যাদি।

সোমরাগ বীররসে এবং মেঘোদয় সময়ে গেয় যথা—

“রসে বীরে প্রযুজ্যতে।

মেঘচ্ছায়াগমে গেয়ঃ সোমরাগো মতঃ
সতাম্॥”

কামোদ করুণ ও হাস্যরসে গেয় এবং ইহার কাল প্রথম প্রহরার্দ্ধে যথা—

“কামোদঃ করুণে হাস্যে।

যামার্দ্ধে গীয়তে সতা।”

মেঘের সময়ে এবং বীররসে মেঘরাগ গেয় যথা—

“ধারে ধাংশগ্রহন্যাসঃ—

গেয়ো ঘনাগমে মেঘরাগোঽয়ং
মন্ত্রহীনকঃ।”

গৌড় অনেক প্রকার। তুরষ্ক গৌড় ও দ্রাবিড় গৌড় প্রভৃতি। তন্মধ্যে দ্রাবিড় গৌড় রাত্রে এবং বীর ও শৃঙ্গার রসে গেয় যথা—

গেয়ো দ্রাবিড় গৌড়োঽয়ং বীরশৃঙ্গারয়ো
র্নিশি।”

তুরষ্ক গৌড় ওড়ব রাগ।

গুর্জ্জরী রাত্রে এবং শৃঙ্গাররসে গেয় যথা—

“গুর্জ্জরী—

—রাত্রৌ গেয়া শৃঙ্গারবর্দ্ধিনী।”

তোড়িকা বা তোড়ী মধ্যাহ্ন সময়ে এবং বীর ও শৃঙ্গার রসে গেয় যথা—

“—তোড়িকা শুদ্ধ ষাড়বা—

জ্ঞাতা মধ্যাহ্ন সময়ে গেয়া শৃঙ্গার
বীরয়োঃ।”

মালবশ্রী শরৎকালের রাগ (ইহাকেই মালসী বলিয়া থাকে,) শরৎকালেই ইহা গেয়। যথা—“মালব স্ত্রী শরদ্যোগ্যা—”

সৈন্ধবী বা সিন্ধুড়া, মধ্যাহ্নের পর ও শৃঙ্গার এবং করুণ রসে গেয় যথা—

"সৈন্ধবী—
মধ্যাহ্নাদূর্দ্ধতো গেয়া শৃঙ্গারে রুক-
ণেঽপিচ।"

দেবকৃতি রাগ সকল ঋতুতে বীররসে গেয়। কৃষ্ণদত্ত বলেন এইটি শুদ্ধ বসন্তের জাতি যথা—

"—দেবকৃতির্মতা।
অসারৃতুষু সর্ব্বেষু গাতব্যা সময়েষু চ।"

রামকিরী ১ প্রহরের মধ্যে গেয়। যথা—

"—প্রহরাভ্যন্তরে গেয়া।
—তজ্‌জ্ঞৈ রাগকিরী মতা।"

প্রথম মঞ্জরী বা পটমঞ্জরী প্রাতঃকালে এবং শৃঙ্গার রসে ও উৎসবকালে-গেয় যথা—

"শৃঙ্গারে চোৎসবে গেয়া প্রাতঃ প্রথম
মঞ্জরী।"

নট্টরাগ রাত্রে, মঙ্গল কার্য্যে, শৃঙ্গার, হাস্য, ও অদ্ভুত, ৩ রসে গেয় যথা—

"নট্টা নট্টবদাখ্যাতা—
হাস্যেঽদ্ভুতে চ শৃঙ্গারে গাতব্যা নিশি
মঙ্গলে।

বেলাবলী শৃঙ্গার ও করুণ রসে গেয়। নারদ সংহিতায় ইহা ওড়ব রাগ বলিয়া উক্ত আছে। যথা—

"শৃঙ্গারে করুণে চৈব গেয়া বেলাবলী
বুধৈঃ।"

গৌড়ী বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"—গৌড়ী মালবকৌশিকা।
বীরশৃঙ্গারয়ো র্গেয়া সকম্পান্দোলিত
স্বরা॥"

নাট রাগ রাত্রে এবং শৃঙ্গার ও বীর *রসে গেয় যথা—*

"নাটো নিশি শুচৌ বীরে।"

নট্ট নারায়ণ দিবাতে গেয যথা—

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো নট্টনারায়ণো
দিবা।"

শঙ্করাভরণ বীররসে এবং রাত্রে গেয়। যথা—

"বীরে নিশি নিষাদাংশঃ শঙ্করাভরণঃ
সদা।"

ষট্‌ স্বরের কতকগুলি রাগ হরি নায়কের সম্মত ছিল তাহা এই—

গৌড, কর্ণাট, দেশা, ধন্নাশিকা, কোলাহলা, বল্লারী, দেশাখ্যা, শৌরীরী, সুস্থাবতী, হর্ষপুরী, মল্লারী, হুঞ্জিকা, "ইত্যাদ্যাঃ ষট্‌স্বরা রাগাঃ হরিনায়ক সম্মতাঃ।"

গৌড়বীর ও শৃঙ্গার রস ও দিনান্ত সময়ে গেয। যথা—

"—গৌড়ঃ স্যাৎপঞ্চমোজ্‌ঝিতঃ।
বীরশৃঙ্গারয়ো র্গেয়ো দিনান্তে বির-
লর্ষভঃ॥"

দেশী ১ প্রহরের মধ্যে এবং শান্ত ও করুণ রসে গেয় যথা—

"রেবগুপ্তোদ্ভবা দেশী।
প্রহরাভ্যন্তরে গেয়া শান্তে চ করুণে
রসে॥"

ধন্নাসিকা, বীর ও শৃঙ্গার রস এবং সকল সময়ে গেয় যথা—

"এষা ধন্নাসিকা জ্ঞেয়া।
রসে বীরে চ শৃঙ্গারে গাতব্যা সর্ব্বদা
বুধৈঃ॥"

বল্লারী ১ প্রহরের পর শৃঙ্গার রসে গেয় যথা—

"ররাটুাপাঙ্গা বল্লারী—
শৃঙ্গারাখ্যো রসে গেয়া হরিনায়ক সম্মতা।"

গৌড় আরও আছে। কর্ণাট গৌড ও মালব গৌড। মালব গৌড বীররসে গেয যথা—"বীরে মালবগৌডকঃ।"

সঙ্গীতসারের মতে মল্লার রাগ মেঘাগমে এবং শৃঙ্গার রসে গেয় যথা—

"মল্লারঃ স-প-হীনোঽয়ং—।
শৃঙ্গারে চ রসে গেয়ঃ পবোদাগমনে
বুধৈঃ।"

কেদারা সায়ংকালে এবং বীর ও শৃঙ্গার রসে গেয় যথা—

" রসে বীরে চ শৃঙ্গারে গেয়া সায়মিযং
বুধৈঃ।"

ইহাকে কোন কোন গ্রন্থে দেশকারী ও দেশপালী বলা হইযাছে।

মালব অপরাহ্নে, রাত্রে ও বীর, এবং শৃঙ্গার রসে গেয়। যথা—

"——মালবোঽপিঁবি-পোজ্ঝি তঃ—।
বীর শৃঙ্গারয়োর্গেয়ো দিনান্তে নিশি বা
বুধৈঃ।"

হিন্দোল—সকল কালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"——হিন্দোলো রি-প-বর্জিতঃ।
——বীরশৃঙ্গারয়োঃ সদা।"

ভৈরব—মঙ্গল কার্য্যে গেয় ও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গেয়। প্রমাণ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

ললিতা—রাত্রিশেষে, দিনের প্রথম ভাগে ও বীর, শৃঙ্গাররসে গেয।

"——ললিতা ললিতস্বরা।
শৃঙ্গারবীরয়োর্গেয়া নিশান্তে চ দিনা-
দিকে॥"

ছায়াতোড়ী—দিবাতে (তোড়ীর ন্যায)

গান্ধার—সকল কালে ও করুণরসে গেয়।

"করুণে সদৈব"

বিহঙ্গড়া—মঙ্গল বিষয়ে ও অর্দ্ধরাত্রে গেয়। যথা—

"গেয়া বিহঙ্গড়া চৈষা নিশীথে মঙ্গলা-
র্থিভিঃ।"

গৌড সারঙ্গী—মধ্যাহ্নের পরে বীর ও শান্তিরসে গেয়। যথা—

"——বীরশান্তিরসাশ্রিতা।
সম্পূর্ণা গৌডসারঙ্গী গেয়া মধ্যাহ্নতঃ
পরম্।"

শ্যাম—প্রদোষকালে গেয়। যথা

" সম্পূর্ণঃ শ্যামরাগঃ স্যাৎ—
প্রদোষো গানকালোঽস্য নির্নীতো গান-
কোবিদৈঃ।"

শঙ্করা—অর্দ্ধরাত্রের পর হাস্যরসে গেয় যথা

"——শঙ্করাভিধা।
নিশীথাচ্চ পরং গেয়া রসে হাস্যে
প্রযুজ্যতে॥"

জয়তশ্রী—রাত্রিতে শৃঙ্গার ও করুণ রসে। যথা

"জয়তশ্রীশ্চ সম্পূর্ণা———।
তমস্বিন্যাং প্রগাতব্যা শৃঙ্গারে করুণে
রসে ॥"

সংগীতদর্পণের মতানুসারে যে যে রাগ যে সময়ে গেয় তাহা বলা যাইতেছে।

মধুমাধবী, দেশী, ভূপালী, ভৈরবী, বেলাবলী, মল্লারী, বল্লারী, সামগুজ্জরী, ধনাশ্রী, মালবশ্রী, মেঘরাগ, পঞ্চম, দেশকারী, ভৈরব, ললিতা, বসন্ত এই সকল রাগ নিত্য প্রাতঃকালে গেয়। যথা

"মধুমাধবী চ দেশাখ্যা ভূপালী ভৈরবী
তথা।
বেলাবলীচ মল্লারী বল্লারী সামগুজ্জরী।
ধনাশ্রীর্মালবশ্রীশ্চ মেঘরাগশ্চ পঞ্চমঃ।
দেশকারী ভৈরবশ্চ ললিতা চ বসন্তকঃ।
এতে রাগা প্রগীয়ন্তে প্রাতরারভ্য
নিত্যশঃ ॥"

গুজ্জরী, কৌশিক, সাবেরী, পটমঞ্জরী, রেবা, গুণকিরী, ভৈরবী, রামকিরী, সৌরাটী, এইগুলি ১ প্রহরের পর গেয়। যথা

"গুজ্জরী কৌশিক শ্চৈব সাবেরী পট
মঞ্জরী।
রেবা গুণকিরী চৈব ভৈরবী রামকির্য্যপি।
সৌরাটী চ তথা গেয়া প্রথম প্রহরো-
ত্তরম্ ॥"

বৈরাটী, তোড়ী, কামোদী, কুড়ারিকা, গান্ধারী, নাগশব্দী, দেশী, শঙ্করাভরণ, ইহা ২ প্রহরে গেয়। যথা

"বৈরাটী তোড়িকা চৈব কামোদী চ
কুড়ারিকা।
গান্ধারী নাগশব্দী চ তথা দেশী বিশে-
ষতঃ।
শঙ্করাভরণো গেয়ো দ্বিতীয় প্রহরাৎ
পরম ॥"

শ্রীরাগ, মালব, গৌড়ী, ত্রিবণী, নট্ট-কল্যাণ, সারঙ্গ, নট্ট

সকল নাট, কেদারী, কর্ণাটী, আভারী, বড়হংসী পাহাড়ী, এই সকল ৩ প্রহরের পর এবং অর্দ্ধ রাত্র পর্য্যন্ত গেয়। যথা

"শ্রীরাগো মালবাখ্যশ্চ গৌড়া ত্রিবণ-
সঞ্জিকা।
নট্টকল্যাণসঞ্জশ্চ সারঙ্গ নট্টকৌ তথা।
সর্ব্বে নাটাশ্চ কেদারা বর্ণাট্যাভীরিকা
তথা।
বড়হংসী পাহাড়ীচ তৃতীয় প্রহরাৎ
পরম্ ॥"

যথা নির্দ্দিষ্ট কালেই গান করিবেক, রাজাজ্ঞাস্থলে কালবিচার করিবে না, সকল সময়েই গাইবেক। যথা

" যথোক্ত কাল এবৈতে গেয়াঃ পূর্ব্ব
বিধানতঃ।
রাজাজ্ঞয়া সদা গেয়া ন তু কালং বিচা
রয়েৎ ॥"

(পঞ্চম সার সংহিতা নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত)

বিভাষা, ললিতা, কামোদী, পটমঞ্জরী, রামকেলী রামকিরা (এই ২টা পরস্পর ভিন্ন, কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ রামকিরাকেই রামকেলী বলিয়া থাকেন) বড়ারী, গুজ্জরী,

দেশকারী, সুভাগ', ভারী, পঞ্চমী, গড়া, ভৈরবী, কৌমারী, এই পঞ্চদশ রাগিণী পূর্ব্বাহ্নকালেই গান করিবেক। যথা

"বিভাসা ললিতাচৈব কামোদী পট মঞ্জরী। রামকেলী রামকিরা বড়ারী গুজ্জরী তথা। দেশকারী চ সুভগাভী-রীচ পঞ্চমী গড়া। ভৈরবী চাপি কৌমারী রাগিণ্যো দশ পঞ্চচ। এতাঃ পূর্ব্বাহ্নকালে তু গেয়া স্তদ্গানকোবিদৈঃ।"

বরাটী, মালবী, কৌদ্রা, রেবতী, ধানসী, বেলাবলী, মারহাট্টী, এই ৭ স্ত্রীরাগ বা রাগভার্য্যা মধ্যাহ্নকালে গান করিবে। যথা—

"বরাটী মালবী কোদ্রা রেবতী চাপি
ধানসী।
বেলাবলী মারহাট্টা সপ্তৈতা রাগ
যোষিতঃ।
গেয়া মধ্যাহ্নকালে চ যথা ভাবঞ্চ
ভাষিতম্।"

গান্ধারী, দীপিকা, কল্যাণী, প্রবরাবরী আশাবরী, কান্দুলা, গৌরী কেদারী, পাহাড়ী, এই সকল রাগিণী পণ্ডিতেরা সায়াহ্নে গান করিয়া থাকেন। যথা—

"গান্ধারী দীপিকাচৈব কল্যাণী প্রব-
রাবরী।
আশাবরী কান্দুলাচ গৌরী কেদার
পাহিড়া।
সায়াহ্নে রাগিণী হেতাঃ প্রগায়ন্তি
মনীষিণঃ।"

মেঘরাগ ও মল্লার কিম্বা মেঘমল্লার বর্ষাকালের সকল সময়েই গেয়। রাত্রে ১০ দণ্ডের পর অন্য সকল রাগের গান হইতে পারে। যথা—

"মেঘ মল্লার রাগস্য গানং বর্ষাসু সর্ব্বদা। দশ দণ্ডাৎ পরং রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গান
মীরিতম্।"

এস্থলে দাক্ষিণাত্য অর্থাৎ কর্ণাট প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিতেরা বা গায়কেরা বলেন—দেশাখ্যা, ভৈরবী, দোবক্তদংশী মাহুলা, এই কয়েকটি রাত্রে মনোরঞ্জন হয় না, সায়ংকালে বিশেষ নিন্দিত। যথা—

"দেশাখ্যা ভৈরবী দেচ বক্তদংশী চ
মাহুলা।
ন নক্তরঞ্জিকা এতা সায়ংকালে চ
নিন্দিতা॥
প্রভাতে যেন গীয়ন্তে স নরঃ সুখ
মেধতে।"

যে ব্যক্তি প্রভাতে গান করে সে গান করিয়া সুখী হয়।

শুদ্ধ নট্ট, সাবঙ্গী, নট্ট বরাটিকা, ছায়া গৌড়ী, অন্যান্য গোড়ী, ললিতা, মালবগৌড়, মল্লারিকা, ছায়া গৌরী, তোড়ী, গৌড়ী, রামকিরী, ছায়া রামকিরী, সকল প্রকার ছায়া বড়ারিকা, কর্ণাট, বঙ্গালী এই সকল রাগ প্রাতঃকালে বিশেষ নিন্দিত।

এই সকল সায়ংকালে গাইলে লক্ষ্মী ভাগ্য হয়। যথা—

শুদ্ধ নট্টাচ সাবঙ্গী তথা নট্ট বরাটিকা। ছায়া গৌড়ী তথা চান্যা ললিতাচ তথা মতা। মল্লারিকা তথা ছায়া গৌরীতু

ছোড়িকাহ্বয়া। গৌডী মালব গৌডীচ রামকিরী তথৈবচ। ছায়া রামকিরী চৈব ছায়া সর্ব্ব বরাডিকা। এতে রাগাঃ বিশেষেণ প্রাতঃকালে চ নিন্দিতাঃ। সায় মেষাস্তু গানেন মহতাং প্রিয় মাপ্নুয়াৎ।”

গীত গোবিন্দ টীকাতে লক্ষণ ভট্ট বলিয়াছেন।

গৌণ্ডকীরী, মহামলহরা, দেশী গুজ্জরী, প্রাতঃকালে। মধ্যাহ্নে রামকিরী (২ প্রকার) কর্ণাট, নাট বা নট্ট, সন্ধ্যাকালে। মালব ও সারঙ্গ শেষ সন্ধ্যায়। গৌড় ও ভৈরবী প্রত্যূষে। যথা—

“প্রাতঃ গৌণ্ডকিরী মহামলহরী দেশাখ্যিকা গুজ্জরী।
মধ্যাহ্নেপি রামকৃচ্ছ্বয়থো কর্ণাট নাটাদয়ঃ।
সায়ং মালবিকাকুতেতি সুধিয়ো গায়ন্তি সায়ন্তনে।
সারঙ্গং পুনরেব গৌড় মপরং প্রত্যূষতো ভৈরবী’॥

কৌমুদী নামক সংগীত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

শ্রীপঞ্চমীতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব কাল পর্য্যন্ত বসন্ত রাগ গীত হইতে পারে। ভৈরব প্রভাতে বরাটি প্রভৃতি মধ্যাহ্নে, কর্ণাট, ও নাট সায়ংকালে, শ্রীরাগ ও মালব প্রভৃতির গান করিলে দোষ নাই। যথা—

“শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবদ্দুর্গা মহোৎসবম্।
ভাবদ্বসন্তো গীয়েত প্রভাতে ভৈরবাদিকঃ।
মধ্যাহ্নেতু বরাট্যাদেঃ সায়ং কর্ণাট নাটয়োঃ।
শ্রীরাগ মালবাদেস্তু গানে দোষো ন বিদ্যতে।”

ইন্দ্র পূজার কাল হইতে (শ্রাবণমাস) দিক্‌পতি পূজার সময় পর্য্যন্ত মালব রাগ গেয়। যথা—

ইন্দ্রপূজাং সমাসাদ্য যাবদ্দিক্পেবতার্চ্চনম্।
তাবদেব সমুদ্দিষ্টং গানং বৈ মালবাশ্রয়ম্॥

সংগীতাচার্য্যেরা এইরূপ বহু প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, নানা গান কালের নিয়ম বলিয়াছেন, পরন্তু যে দেশে যে সময়ে প্রধান সংগীতাচার্য্যেরা যাহা গান করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেশে সেই সময়ে তাহাই গান করিবেন। যথা—

“এবন্তু বহুধাচার্য্যৈ গানকালঃ সমীরিতঃ।
যস্মিন্ দেশে যথা শিষ্টৈ গীতং বিজ্ঞস্তথা চরেৎ।”

অকাল বা অসময়ে গাইলে দোষ হয় যথা—

“সময়োল্লঙ্ঘনং গানে সর্ব্বনাশকরং ধ্রুবম্।
শ্রেণীবন্ধে নৃপাজ্ঞায়াং বঙ্গভূমৌ ন দোষদম্।

গানের সময় মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু শ্রেণীবন্ধ, রাজাজ্ঞা, ও বঙ্গভূমিতে দোষ হয় না।

কোহলীয় গ্রন্থে ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। যথা—

লোভাৎ মোহাচ্চ যো কেচিৎ গায়ন্তি চ
বিরাগতঃ।
সুবসা গুজ্জরী সো দোষং হন্তীতি
কথ্যতে॥

লোভ বা মোহ বশতঃ যদি বিরাগে গান করে তবে সুবস গুজ্জরী গাইলেই তজ্জন্য দোষ নষ্ট হয়।

রত্নমালাগ্রন্থে উক্ত আছে, বসন্ত, রামকিরী, সুবসা, গুজ্জরী, এই কয়েকটী সকল সময়ে গাইতে পারে, কিছু দোষ হয় না। যথা—

বসন্তো রামকিরী চ গুজ্জরী সুবসাপি চ।
সর্ব্বস্মিন্ গীয়তে কালে নৈব দোষো-
ভিজায়তে॥

নারদের একটী বিশেষ উক্তি আছে। যথা—

"দশদণ্ডাৎ পরং রাত্রৌ সর্ব্বেষাং
গানমীরিতম॥"

১০ দণ্ড রাত্রের পর সকল গানই করিতে পারে।

অবশেষে রাগ সকলের ঋতু বিভাগ বর্ণন করা যাইতেছে।

"শ্রীরাগো রাগিণী যুক্তঃ শিশিরে
গীয়তে বুধৈঃ।

ভার্য্যাসহ শ্রীরাগ শিশির ঋতুতে গীত হইয়া থাকে।

"বসন্তঃ সসহায়স্তু বসন্তর্ত্তৌ প্রগীয়তে॥"

সসহায় বসন্তরাগ বসন্তকালে গীত হয়।

ভৈরবঃ সসহায়স্তু ঋতৌ গ্রীষ্মে প্রগীয়তে।
পঞ্চমস্তু তথা গেয়ো রাগিণ্যা সহ
শারদে॥

সসহায় ভৈরব গ্রীষ্ম ঋতুতে গীত হয়। ভার্য্যাসহ পঞ্চমরাগ শরৎকালে গেয়।

মেঘরাগো রাগিণীভির্যুক্তো বর্ষাষ্
গীয়তে।

রাগিণীর সহিত মেঘরাগ বর্ষাকালে গান হইয়া থাকে।

নট্টনারায়ণো রাগো রাগিণ্যাসহ হৈমকে।

রাগিণীসহ নট্টনারায়ণ রাগ হিম ঋতুতে গেয়।

যথেচ্ছয়া বা গাতব্যা সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদাঃ।

সুখপ্রদ রাগ সকল যথেচ্ছা অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে সকল ঋতুতে গাইতে পারে।

সঙ্গীত বিদ্যা এত বিস্তীর্ণ যে এমন বহুকাল লিখিলেও সকল ব্যাপার পাঠকগণকে গোচর করান যায় কি না সন্দেহ। সুতরাং স্থূল বিষয় গুলি লিখিলাম।

সঙ্গীত বিদ্যার গ্রন্থ সকলের আর দুইটী অংশ আছে, তাহা প্রকীর্ণক এবং অপর একটি অংশ তাহা প্রবন্ধ নামে অভিধেয়। প্রত্যেক গ্রন্থের প্রকীর্ণক অংশে গীতের উপযোগী, আলপ্তি, গমক, প্রভৃতির নিরূপণ আছে। প্রবন্ধ নামক অংশে স্বর এবং গীতের যে কিছু উপকরণ (বস্তু, রূপক প্রভৃতি) সমস্তই নির্ণীত আছে।

শ্রীরামদাস সেন।

জুরীর বিচার।

এক সময়ে কাজির বিচার এ দেশে যেরূপ উপহাস্য হইয়াছিল, এক্ষণে জুরীর বিচার সেইরূপ হইয়াছে। যাহাদিগের উপকার হইবে বলিয়া এই বিলাতি বিচার বাঙ্গালায় আনীত হইয়াছে, তাহারা সে উপকার স্বীকার করে না, বরং মধ্যে মধ্যে সেই বিচার লইয়া উপহাস করে। কেন জুরীর বিচারে লোকের শ্রদ্ধা নাই তাহা একবার আলোচনা করা যাউক।

বহুকাল হইল এক সময়ে জুরীর বিচার ইংলণ্ডদেশে লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তৎকালে ভূম্যাধিকারী লার্ড ও সাধারণ কমনারদিগের মধ্যে পরস্পর বড় বিদ্বেষভাব ছিল। কাজেই একের বিচার অপরে করিলে সুবিচার হইত না। তৎকালে বিচারকার্য্য কেবল লার্ডদিগের হস্তে ছিল, অতএব সাধারণের প্রতি সর্ব্বদাই অত্যাচার হইত। এই অবস্থায় রাজাজ্ঞা হইল, যে আসামীরা স্বশ্রেণীস্থ লোকের দ্বারা বিচারিত হইবে, অর্থাৎ কোন জমিদার লার্ড সাহেব অপরাধ করিলে অন্য লার্ড সাহেবেরা তাঁহার বিচার করিবেন এবং কোন সাধারণ লোক অপরাধী হইলে সাধারণ লোকে তাহার বিচার করিবে। এই রাজাজ্ঞায় সাধারণ লোকের বড় সন্তোষ হইল; তাহারা বিদ্বেষী বিচারকগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। এক্ষণে তাহাদের বিচার তাহারা আপনারা করিবে। জুরীর বিচারে কাজেই সাধারণের মনোরঞ্জন হইল। মনোরঞ্জন হউক, কিন্তু তাহাতে অবিচার রহিত হইল না, পুরুষানুক্রমে যে ব্যক্তি আসামীর সহিত একত্রে অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে সে ব্যক্তি বিচারক হইলে স্বগণের স্বপক্ষ হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? স্বপক্ষতা হেতু নূতন বিধি অনুসারে অপরাধীরা অব্যাহতি পাইতে লাগিল। পূর্ব্বে বিপক্ষবিচারক দ্বারা আসামীরা বিনা অপরাধে দণ্ড পাইত, এক্ষণে স্বপক্ষবিচারকদ্বারা অপরাধীরা নির্ব্বিঘ্নে খালাস পাইতে লাগিল। অবিচার রহিল, কিন্তু অত্যাচার গেল। অপরাধীরা খালাস পাইতে লাগিল, কিন্তু নিরপরাধীরা আর দণ্ড পাইল না। তাৎকালিক অবস্থায় এই যথেষ্ট হইয়াছিল। এই বিচার পদ্ধতির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে অপর সাধারণের সংস্কার জন্মিয়া গেল এবং সেই সংস্কার পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে লর্ড ও অপর ব্যক্তিদিগের পরস্পর বৈরিতা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি এই বিচারপদ্ধতি আর পরিবর্ত্তিত হইল না। যাহা পুরাতন তাহা অনেকের ভাল লাগে বলিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, জুরীর বিচার চলিয়া আসিতে লাগিল।

যাহা ইংলণ্ডে এক সময় উপকার

করিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষে সকল সময়ে অবশ্য উপকার করিবে বিবেচনায়, হয় ত জুরীর বিচার ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে, এইরূপ অনেকের সংস্কার। অতএব তাঁহারা আক্ষেপ করেন, যে দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার সারাংশ ইংলণ্ডে পড়িয়া আছে অদ্যাপি তাহার চালান পৌঁছে নাই। ইহার সারাংশ (Trial by peers or equals) স্বশ্রেণীস্থ লোকের দ্বারা আসামীর বিচার। আমাদের দেশে সেটী নাই। কেন নাই, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। ইংরেজের দেশে লোকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, লার্ড ও কমনার। আমাদের দেশেও সেই রূপ ছিল, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ইংরেজের দেশের লোকবিভাগ এ পর্য্যন্ত বলবৎ রহিয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে তাহা উঠিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভেদ আর বড় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে আর একরূপ বিভাগ হইতেছে, সেটি শেষ কি দাঁড়াইবে তাহা এখনও নিশ্চয় হয় নাই। বিদেশীরা অনুভব করেন এক্ষণে আমাদের দেশে কোনরূপ লোকবিভাগ আর বিশেষ বলবৎ নাই সেইজন্য হয় ত জুরীর বিচারের সারাংশটি বিলাতে পড়িয়া আছে। তাঁহারা বলেন আইনের চক্ষে সকল বাঙ্গালী সমান, বাঙ্গালীর ছোট বড় নাই, বাঙ্গালীর লার্ড ও কমনার নাই, কাজেই ইংলণ্ডে জুরির বিচারে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল বাঙ্গালায় তাহার প্রয়োজন বোধ হয় নাই! এখানে জমীদার প্রজার বিচার করিতে পারে, প্রজা জমীদারের বিচার করিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডে তাহা পারে না।

স্বশ্রেণী দ্বারা বিচার যে একান্ত বাঞ্ছনীয় এমত আমরা বলি না, বরং তাহার বিপরীত বলিতে সাহস করি। স্বশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে সহৃদয়তা প্রবল থাকে; তাহাদের মধ্যে কেহ আসামী কেহ বিচারক হইলে নিরপেক্ষতার বিষয় সন্দেহ হইতে পারে। একজন ইংরেজ লিখিয়াছেন:—

"The principle that a tribunal ought to be composed of the prisoner's equals, strikes us as being *prima facie* unreasonable. If the sole object of administering justice were to provide every means of escape for a prisoner accused of even the gravest offences, we could see a direct purpose in the provision which substantially enacts that his judges shall be of the class most likely to sympathize with him, and look with a lenient eye on his guilt."

এই কথার প্রমাণ ইংলণ্ডে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়, এই জন্য তথায় কেহ কেহ ইদানীং জুরীর বিচারের বিশেষ বিরোধী দাঁড়াইয়াছেন।

স্বশ্রেণীস্থ লোকের দ্বারা বিচার বলিয়া

জুরীর বিচার এক সময়ে ইংলণ্ডে যে আদর পাইয়াছিল এক্ষণে বোধ হয় সে আদর আর বড় থাকে না। সাধারণ লোকে যাহাই বলুক, বিবেচকগণ এ বিচারপদ্ধতির প্রতি সন্দেহ আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা হইলে আমাদের দেশে এ বিচারের সারাংশ আইসে নাই বলিয়া যেঁ কাহার কাহার আক্ষেপ আছে, তাহা অনর্থক। যে ভাগকে তাঁহারা সারাংশ বলেন, এই বিচারের পদ্ধতির সেইটিই অপকৃষ্ট অংশ। তাহা ভারতবর্ষে আইসে নাই, ভালই হইয়াছে। বোধ হয় আমাদের রাজপুরুষেরা বিবেচনা করিয়াই এই অপকৃষ্ট ভাগটি চালান দেন নাই।

এদেশে জুরীর বিচার বলিয়া যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পঞ্চায়েত বিচারের অনুকরণ মাত্র। তবে এই বিচারে কেন লোকে উপহাস করে, কেন কাজির বিচারের সহিত তুলনা করে, তাহা একবার আলোচনা করা উচিত।

পঞ্চায়েত আমরা আপনারা মনোনীত করিয়া থাকি, যাহার দ্বারা অবিচার সম্ভব কদাচ তাহাকে মনোনীত করি না। যাঁহারা বিজ্ঞ, বিবেচক ও অপক্ষপাতী, যাঁহাদের প্রতি আসামী ফরিয়াদি উভয়ের শ্রদ্ধা আছে, কেবল তাঁহারাই পঞ্চায়েত মনোনীত হইয়া থাকেন। কিন্তু মফঃস্বলে জুরীনির্ব্বাচন যেরূপে হইয়া থাকে তাহাতে বিজ্ঞ বা অপক্ষপাতী লোক ভিন্ন অন্য লোক মনোনীত হইবার কোন বাধা নাই। আইনে এমত নিষেধ নাই যে অধর্ম্মী, অবিশ্বাসী, কি পক্ষপাতী লোক জুরীর আসনে বসিয়া বিচার করিতে পারিবে না। আইনে এরূপ নিষেধ থাকিলেও কোন ফলদায়ক হইতে পারে না; যতদিন আদালতে এই সকল দোষ সপ্রমাণিত না হয় ততদিন অধর্ম্মী অবিশ্বাসী কি পক্ষপাতী বলিয়া কেহ আদালত হইতে দোষস্পৃষ্ট হইতে পারে না, আমরা গোপনে যাহাকে যাহা মনে করি না কেন, আইন অনুসারে সকলেই ধর্ম্মিষ্ঠ, সকলেই বিশ্বাসী, সকলেই অপক্ষপাতী; অতএব আইন অনুসারে অপামর সাধারণ সকলেই জুরীর আসনে বসিতে পারে, কাহার পক্ষে তাহার বাধা নাই, জুরীর আসন বারোইয়ারীর সভার ন্যায়। রাজা দুর্য্যোধন, উড়ে মালী, মুচে ঢুলি সকলেই এক আসনে।

জুরীনির্ব্বাচনের ভার কালেক্টার সাহেবের প্রতি আছে। কিন্তু এসকল বিষয়ে কালেক্টার সাহেবের প্রতিনিধি নাজির সাহেব, কখন কখন নাজিরের বক্সি সাহেবই কর্ত্তা দাঁড়ান। জুরীর আসনে কে কে বসিবে তাহা প্রায় তাঁহারাই স্থির করেন; কালেক্টার সাহেব ফর্দ্দে দস্তখত ভিন্ন আর কিছুই করেন না। কেবল একবার মাত্র আমরা শুনিয়াছি, সার উইলিয়ম হারসেল এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দ্বারা জুরী-নির্ব্বাচন

করাইয়াছিলেন ; যেখানে নাজির সাহেব কর্ত্তা, সেখানে জুরী-নির্ব্বাচন কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। প্রায় ভাল লোক ব্রতী থাকে না কাজেই জুরীর বিচারের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকে না।

যাঁহারা জুরীর আসনে বসেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই চারি জন বিশেষ ভদ্র লোক থাকিলে থাকিতে পারেন ; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অতি সামান্য। ক্ষুদ্র দোকানদার, অল্প পটল বিক্রেতা, কৃষী, উমেদার, তন্তুবায়, কুম্ভকার বা তদ্রূপ লোকই জুরীর মধ্যে অধিক। সামান্য লোকের প্রতি আইন কর্ত্তাদের কোন আপত্তি নাই। তাঁহারা বিবেচনা করেন, যে সামান্য লোকে সামান্য বুদ্ধিতে যাহাকে অপরাধী বলিয়া স্থির করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অপরাধী। এ কথা বাস্তবিক সত্য। কিন্তু আদালতে প্রমাণ প্রয়োগের এক্ষণে যে প্রণালী তাহাতে এ কথা বড় খাটে না। জোবানবন্দির যুদ্ধ হইতে প্রকৃত কথা বুঝিয়া লওয়া সামান্য লোকের কার্য্য নহে। এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক, অন্ততঃ বুদ্ধির কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণতা আবশ্যক, কিন্তু সামান্য লোকদিগের ততটা থাকে না। উকীল কৌন্সিলেরা বিপক্ষের সাক্ষীকে ভ্রান্ত করিবার নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগী থাকেন, তাঁহাদের কৌশলে অধিকাংশ সাক্ষীরা বাস্তবিক হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, প্রকৃত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিলেও তাহা বলিতে পারে না ; বলিতে গেলে হয় ত এরূপ বিপর্য্যয়ভাবে বলে, যে তাহার প্রত্যক্ষতার বিষয়ে সন্দেহ হয়। এরূপ স্থলে সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য কি না তাহা মীমাংসা করা বড় কঠিন ; যে সকল বিচারকদের বহুদর্শন আছে, তাঁহারাও অনেক সময় ভ্রান্ত হন, সামান্য লোকের ত কথাই নাই। যে সকল কামার কুমার জুরীর আসনে একবার কি দুইবার বসিয়াছে, তাহারা কিছুই স্থির করিতে পারে না। তাহাদের সঙ্গে কোন সুশিক্ষিত ভদ্রলোক থাকিলে প্রায় তাঁহার উপর নির্ভর করিতে তাহারা নিতান্ত বাধ্য হয়।

যাঁহারা আমাদের দেশে ইতরলোকের সহিত অধিক আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে বুঝিবার শক্তি ইতর লোকের অতি সামান্য। তাহারা চাসের কথা, দ্রব্যাদির মূল্যের কথা, পীড়ার কথা, বা যে বিষয় লইয়া তাহারা আপনাদের মধ্যে নিত্য আলাপ করিয়া থাকে সেই বিষয়ের কথা ভিন্ন অন্য কথা বড় বুঝিতে পারে না, তাহারা জোবানবন্দির ফেরফার একেবারেই বুঝিতে পারে না ; বিশেষতঃ এক একজন সাক্ষীর জোবানবন্দি শেষ হইতে দীর্ঘকাল লাগে, সেই দীর্ঘকাল মনঃসংযোগ করিয়া থাকা কামার কুমার প্রভৃতি অশিক্ষিত লোকের পক্ষে বড় কঠিন। কোন বিষয়ে দীর্ঘকাল মন নিবিষ্ট রাখা শিক্ষার কার্য্য, অশিক্ষিত লোকের নিকট তাহা একেবারে প্রত্যাশা

করা যাইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত আমরা কখন শুনি নাই যে কোন সামান্য লোক জুরীর আসনে বসিয়া সাক্ষীর জোবানবন্দি আদ্যন্ত শুনিয়াছে বা তাহা বুঝিয়াছে। তাহারা যাত্রা শুনিতে বসিলে যে পর্য্যন্ত সং না আইসে ক্রমাগত ঢুলিতে থাকে, জোবানবন্দির মধ্যে সং তামাসা নাই, কাজেই জোবানবন্দি শুনিতে শুনিতে তাহাদের ঢুলিতে হয়। অধিকন্তু এজলাষে টানাপাকা আছে, আহারান্তের নিয়মিত নিদ্রা কেনইবা উপেক্ষিত হইবে। যাহারা জোবানবন্দি বুঝিতে পারে না, যাহারা তৎপ্রতি দীর্ঘকাল মনোনিবেশ করিতে পারে না, তাহারা বিচারক হইলে কাজিদের ন্যায় কাজেই হইবে।

কোন বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা কি হইয়াছিল, জোবানবন্দি শুনিয়া স্থির করা অতি কঠিন। সকল কার্য্যেইকিছু কিছু শিক্ষা আবশ্যক, বিচারকার্য্যে বিশেষতঃ। কিন্তু জুরীর বন্দোবস্ত দেখিয়া বোধ হয় আইনকারদিগের ধারণা যে বিচারকার্য্য অতি সহজ। সকলেই এই কার্য্যে পটু, তাস খেলিতে শিখিতে হয়, তথাপি বিচারকার্য্য শিখিতে হয় না। বলু ঘানি ছাড়িয়া এজলাসে বসিলেই বিচার করিতে পারে, তাঁতি কখন বিচার আসনে যায় নাই তথাপি এজলাষে বসিবামাত্রই বিচার করিতে পারে। বোধ হয় আইনকর্ত্তাদের মতে এজলাষ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন। সিংহাসনের গুণে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয়। তথায় যে বসিবে সেই বিচারে অদ্বিতীয় দাঁড়াইবে। গোরুর রাখাল হউক না কেন, তাঁহার বিচারের প্রশংসা অবশ্য হইবে।

আর এক কথা। যে সকল সামান্য লোক জুরীর আসনে বসে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সচ্ছল অবস্থার লোক নহে। হয় ত কেহ কষ্টে দিনপাত করে, হয় ত কেহ যে দিন পরিশ্রম দ্বারা কিছু উপার্জ্জন না করিতে পারে, সে দিন তাহাদের ঋণ করিতে হয়। এরূপ দরিদ্র লোককে আবদ্ধ রাখিলে অত্যাচার করা হয়। এক জনের পক্ষে সুবিচার করা ইতে গিয়া আর একজনের উপর পীড়ন করা হয়। একবার একজন দরিদ্র ব্যক্তি জুরীর ফন্দ হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া বাহিরে দাড়াইয়াছিল। আমরা কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবার পরামর্শ দেওয়ায় সে ব্যক্তি যোড় হাত করিয়া বলিল, "নাজির বাবুকে একখানা পত্র দিলে ভাল হয়, তিনিই আমার এই বিপদের মূল।" জুরীর আসনে বসা সামান্যজীবীর পক্ষে বাস্তবিক বিপদ। পূর্ব্বে নবাবী আমলে "বেগার" ধরা প্রথা ছিল, এক্ষণে জুরীধরা সেইরূপ হইয়াছে। ইংলণ্ডে জুরীরা পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ কিছু কিছু পাইয়া থাকেন, এখানে সে প্রথা নাই। কেন নাই তাহা বুঝা যায় না। বোধ হয় বিচারকার্য্যের ব্যয় কমাইবার

নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম করা হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাতে গবর্ণমেণ্টের লাভ অতি সামান্য, দরিদ্রের ক্ষতি অতি গুরুতর।

যে স্থলে সামান্য দীনদরিদ্র ব্যক্তি বিচারক, সে স্থলে উৎকোচের আশঙ্কা প্রবল। দরিদ্রের পক্ষে লোভ সম্বরণ করা বড় কঠিন। আসামীরা তাহা জানে, প্রয়োজন হইলে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারে। দরিদ্র, কাজেই কেহ তাহাকে লোভ দেখাইতে ভয় পায় না, বা কুণ্ঠিত হয় না।

কে কে জুরীর আসনে বসিবে তাহা পূর্ব্বাহ্নে আসামী জানিতে না পারিলেই উৎকোচের পথ বন্ধ হইতে পারে, এরূপ অনেকের সংস্কার আছে। এই জন্য কোন কোন জজ সাহেব এক এক মোকর্দ্দমায় ৭০ কি ৮০ জন ব্যক্তিকে জুরীর নিমিত্ত আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে আবশ্যকমত কয়েকজনকে বাছিয়া লইয়া অবশিষ্ট সকলকে বিদায় দেন। ইহা দ্বারা কিরূপে উৎকোচের পথ বন্ধ হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কে কে জুরীর আসনে বসিবে আসামী পূর্ব্বে জানিত না কিন্তু পরে জানিল, উৎকোচ দিবার প্রয়োজন হইলে অনায়াসে পরে দিতে পারে, মোকর্দ্দমা সচরাচর একদিনে নিষ্পত্তি হয় না, জুরীরাও রাত্রে আদালতে তালা কুলুপ বন্ধ থাকে না, গৃহে যাইতে পায়, গৃহে যাহার সহিত ইচ্ছা আলাপ করিতে পায়; এ অবস্থায় প্রস্তাবনার প্রতিবন্ধক কিছুই থাকে না। আমরা এমনও মধ্যে মধ্যে শুনিয়াছি যে জুরীরা কে কি মত দিবেন, বাটীতে বসিয়া প্রতিবাসীর সহিত তাহার পরামর্শ আঁটিয়া কাছারী যান, নহিলে চলে না, নিজে কিছুই বুঝেন না, হয় ত লাভালাভের বিষয় যিনি পরামর্শী তিনি একাই ভোগ করেন। অনেক সময়ে জুরীর সহিত কোন বন্দোবস্ত না করিয়া তাহার পরামর্শীর সহিত বন্দোবস্ত করিলেই চলে।

অতএব জুরীর উৎকোচ অসম্ভব নহে। বিলাতেও তাহা আছে। কোথাও কোথাও শুনা যায় যে, জুরীর সহিত পূর্ব্বাহ্নে কোন রফা করিতে হয় না, বিচারের পর জুরীর "বিদায়" মামুলি দস্তুর। জুরী তাহা ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই পায়। কিন্তু না চাহিলে পায় না। আমাদের দেশে "বিদায়" মন্দ কথা নহে। "বিদায়" "দক্ষিণা" প্রভৃতি অনেক প্রচলিত নিয়ম আছে, গুরু, পুরোহিত, আত্মীয়, কুটুম্ব সকলেই "বিদায়" প্রত্যাশা করেন। গরিব জুরীর দুই এক জন কেনই বা তাহা প্রত্যাশা না করিবে।

অনেকে বলিতে পারেন, যে যে সকল দোষের উল্লেখ করা হইল, অনায়াসে তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। যদি ইতরলোক বা অশিক্ষিত লোককে জুরীর আসনে বসিতে না দেওয়া যায়, যদি কেবল ভদ্র ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাচন করা হয়, তাহা হইলে এ সকল দোষ আর

থাকে না। তদুত্তরে আমরা বলি তাহা হইতে পারে না। এত ভদ্রলোক কোথা পাওয়া যাইবে? প্রতিবৎসর যে পরিমাণে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার নিমিত্ত জেলায় জেলায় অন্ততঃ দুই তিন শত জুরি আবশ্যক। অল্পলোক মনোনীত করিয়া রাখিলে প্রায় প্রত্যেক মোকদ্দমাতেই তাহাদিগকে আসিতে হয়, কাজেই বহুসংখ্যক লোক আবশ্যক। কিন্তু প্রতি জজ আদালতের নিকটবর্ত্তী স্থানে দুই চারি শত বিশেষ সুশিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি পাওয়া যায় না। না পাইলে কাজেই ইতর লোক মনোনীত করিতে হয়।

মনে করুন প্রত্যেক জেলায় তিন চারি শত সুশিক্ষিত ভদ্র লোক পাওয়া গেল। প্রতি মোকদ্দমায় ভদ্রলোক ভিন্ন আর কেহ জুরীর আসন গ্রহণ করিতে পাইল না। তাহাতেই বা কি লাভ হইল। একজন বিজ্ঞ জজ একা যেরূপ বিচার করেন, পাঁচ জন অব্যবসায়ী একত্র হইয়া সেরূপ বিচার করিতে পারিবার কথা নহে। শত অব্যবসায়ী একত্রিত হইয়া একজন ব্যবসায়ীর কার্য্য করিতে পারে না। লোকের সংখ্যা বাড়িলে বল বাড়ে, কিন্তু পারকতা বাড়ে না। তাঁতি একা কাপড় বুনিতে পারে কিন্তু অপর ব্যবসায়ী পাঁচজন একত্রিত হইলে, তাহারা একত্রিত হইয়াছে বলিয়া কাপড় বুনিতে পারিবে না। বস্ত্রবয়ন প্রথমতঃ তাঁহাদের শিখিতে হইবে। অব্যবসায়ী পাঁচ সহস্র লোক একত্রিত হইলেও শিক্ষা ব্যতীত কাপড় বুনিতে পারিবে না।

জুরীর মধ্যে কেহ আপনাকে দায়ী বলিয়া মনে করে না। সকলেই পরস্পরে বিবেচনা করে পাঁচ জনের মধ্যে আমি একজন মাত্র। যদি অবিচার কি নিন্দা হয় পাঁচ জনেরই হবে কেহ আমার একার নিন্দা করিবে না, ভালমন্দে কেহ আমার নামও করিবে না। জজের এ সকল কথা মনে হয় না, তিনি একা বিচার করেন কাজেই একাই দায়ী থাকেন। তাঁহার নিজের সম্ভ্রমও রক্ষা করিতে হয়।

জজের বিচারে সকলেই সন্তোষ ছিল। জুরীর বিচার আরম্ভ করাইয়া কি উৎকর্ষ সাধন হইল, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, গরিব বাঙ্গালীকে বিচারকার্য্য শিখাইবার নিমিত্ত যদি এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে তবে সে পরামর্শ ভাল হয় নাই। ইহাতে লোকের মাথা কাটিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম শিখান হইতেছে মাত্র। এই যাটকোটী লোকের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কয়জন জুরীর আসনে বসিয়াছে? কয়জন বিচারকার্য্য শিখিয়াছে? অনেক দিন জুরীর বিচার আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে অবিচার ও অত্যাচার ভিন্ন কি লাভ হইয়াছে? বিশেষ বিজ্ঞ জজ মাত্রেই এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যে রিপোর্ট করিয়া থাকেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে কেন মনোযোগ করেন না তাহা আমরা জানি না। অবশ্য কোন গুরুতর কারণ আছে।

রাজসিংহ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

এক্ষণে আমরা বলিব, অকস্মাৎ এই সৈন্য কোথা হইতে আসিয়া মোগলদিগকে আক্রমণ করিল।

মাণিকলাল পার্ব্বত্যপথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে, জমী করিত; ডাক হাঁক করিলে ঢাল, খাঁড়া, লাঠি, সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত; এবং সকলেরই এক একটি ঘোড়া ছিল। মোগলসেনা আসিলে রূপনগরের রাজা তাহাদিগকে ডাক হাঁক করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে তাহাদিগের ডাকিবার কারণ, মোগলসৈন্যের সম্মান ও খবরদারিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা। গোপন অভিপ্রায় যদি মোগলসেনা হঠাৎ কোন উপদ্রব উপস্থিত করে তবে তাহার নিবারণ। ডাকিবামাত্র রাজদূতেরা ঢাল খাঁড়া, ঘোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল—রাজা তাহাদিগকে, অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র দিয়া সাজাইলেন। তাহারা কয়দিন নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগলসৈনিকগণের সহিত হাস্য পরিহাস ও রঙ্গরসে কয়দিবস কাটাইল। তাহার পর ঐ দিবস প্রভাতে মোগলসেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়া যাওয়াতে, রূপনগরের সৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা পাইল। তখন তাহারা অশ্ব সজ্জিত করিল এবং অস্ত্র সকল রাজার অস্ত্রাগারে ফিরাইয়া দিবার জন্য লইয়া আসিল, রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া স্নেহসূচকবাক্যে বিদায় দিতেছিলেন, এমত সময়ে আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল ঘর্ম্মাক্ত কলেবর অশ্ব সহিত সেখানে উপস্থিত হইল।

মাণিকলালের সেই মোগলসৈনিকের বেশ। একজন মোগলসৈনিক অতি ব্যস্ত হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি সম্বাদ?"

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাধিয়াছে, পাঁচহাজার দস্যু আসিয়া রাজকুমারীকে ঘেরিয়াছে। জোনাব হাসান আলি খাঁ বাহাদুর, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন—তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু আর কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না। আপনার নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছেন।"

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈন্য সজ্জিতই আছে।" সৈনিকগণকে বলিলেন, "তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে!

তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই যুদ্ধে চল। আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।"

মাণিকলাল বলিল, "যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ আর কিছু সেনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসুন। দস্যুরা সংখ্যায় প্রায় পাঁচহাজার। আরও কিছু সেনাবল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

স্থূলবুদ্ধি রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহস্র সৈনিক লইয়া মাণিকলাল অগ্রসর হইল; রাজা আরও সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। মাণিক, সেই রূপনগরের সেনা লইয়া একেবারে মবারকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল। মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে তৎপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু রন্ধ্রপথে রাজসিংহ প্রবেশ করিয়াছেন: হঠাৎ তাহার শঙ্কা হইয়াছিল যে মোগলেরা রন্ধ্রের এই মুখ বন্ধ করিয়া রাজসিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্যই সে রূপনগরের সৈন্যসংগ্রহার্থে গিয়াছিল। এবং সেই জন্য সে প্রথমেই এইদিকে রূপনগরের সেনা লইয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বুঝিল যে রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই হয়—মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। তখন, মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ সকল দস্যু! উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

সৈনিকেরা কেহ কেহ বলিল, "উহারা যে মুসলমান।"

মাণিকলাল বলিল, "মুসলমান কি লুঠেরা হয় না? হিন্দুই কি যত ডাকাইতি-কারী? মার।"

মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল। মবারকের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। রূপনগরের সেনা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল।

এই অবসরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কিছু জান?"

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, "জানি। যখন আমি দেখিলাম যে মহারাজ রন্ধ্রপথে নামিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। প্রভুর রক্ষার্থ আমাকে আবার একটি নূতন জুয়াচুরি করিতে হইয়াছে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাণাকে শুনাইল। আপ্যায়িত হইয়া রাণা মাণিকলালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মাণিকলাল! তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত! তুমি যে কার্য্য

করিয়াছ, যদি এখন উদয়পুর ফিরিয়া যাই, তবে তাহার পুরস্কার করিব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় সাধে বঞ্চিত করিলে। আজ মুসলমানকে দেখাইতাম যে রাজপুত কেমন করিয়া মরে।"

মাণিকলাল বলিল, "মহারাজ! মোগলকে যে শিক্ষা দিবার জন্য মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে। সেটা রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয় নহে। এখন, উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে রাজকুমারীকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করুন।"

রাজসিংহ বলিলেন, "আমার কতকগুলি সঙ্গী এখন ওদিকের পাহাড়ের উপরে আছে—তাহাদের নামাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব। আপনি অগ্রসর হউন। পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

রাণা সম্মত হইয়া, চঞ্চলকুমারী সহিত উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রাণাকে বিদায় দিয়া, মাণিকলাল রূপনগরের সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতারোহণ করিল। পলায়নপরায়ণ মোগলসেনা তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যে যে খানে পাইল পলায়ন করিল। তখন মাণিকলাল রূপনগরের সৈনিকদিগকে বলিলেন, "শত্রু সকল পলায়ন করিয়াছে—আর কেন বৃথা পরিশ্রম করিতেছ? কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে রূপনগরে ফিরিয়া যাও।" সৈনিকেরাও দেখিল—তাও বটে সম্মুখে শত্রু আর কেহ নাই। তখন তাহারা মহারাজা বিক্রমসিংহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রণজয় গর্ব্বে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দণ্ডকাল মধ্যে পার্ব্বত্য পথ জনশূন্য হইল—কেবল হত ও আহত মনুষ্য ও অশ্ব সকল পড়িয়া রহিল। দেখিয়া উচ্চ পর্ব্বতের উপরে, প্রস্তরসঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নামিল। এবং কোথাও কাহাকে না দেখিয়া রাণা অবশিষ্ট সৈন্য সহিত অবশ্য উদয়পুর যাত্রা করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া তাহারাও তাঁহার সন্ধানে সেই পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মাণিকলালও আসিয়া জুটিল। সকলে একত্রে উদয়পুরে চলিলেন।

এ দিকে মোগলসেনাপতি বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। রণে তিনি পরাজিত হইয়াছেন—বাদশাহের ভাবী মহিষী তাঁহার হস্ত হইতে রাজপুতে কাড়িয়া লইয়াছে। কি বলিয়া তিনি দিল্লীতে মুখ দেখাইবেন? বাদশাহকে কি উত্তর দিবেন? বাদশাহের নিকট লঘুদণ্ডের সম্ভাবনাই বা কি? সৈন্যের অধিকাংশই হত হইয়াছে—যাহা জীবিত আছে তাহারা কে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে তাহার কোন ঠিকানাই নাই। তিনি

নবাবকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নবাবের পরামর্শে এক প্রান্তরমধ্যে নিশান পুতিয়া ভেরী বাজাইতে আজ্ঞা করিলেন। দুই জনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মোগল সেনাগণ এ দিক ও দিক পলাইতেছিল—যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে বুঝিয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে আসিয়া নিশানের কাছে জুটিল। তখন সেই ভগ্নসেনা লইয়া সেই প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়া হাসান আলি রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর একাকী তাম্বুমধ্যে বসিয়া হাসান আলি খাঁ গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি উপায়ে বাদশাহের কাছে মান ও প্রাণ রক্ষা হইবে? শেষ তাহার উপায় স্থির করিয়া আপনার প্রিয়পাত্র হামিদ খাঁকে ডাকিয়া স্বীয় অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন। হামিদ সেলাম করিয়া বিদায় হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন আবদুল হামিদও ভাবিতে জানে। তাহারও একটী ছোট তাম্বু ছিল—সেখানে সে আসিয়া কুরশীর উপর বসিয়া হুক্কায় অম্বুরী তামাকু চড়াইল। চারি পাঁচ জন পারিষদ জুটিয়া গেল। সকলে মিলিয়া রাজপুতগণের ধূর্ত্ততা ও ভীরুতার বিশেষ নিন্দা, এবং আপনাদিগের অসাধারণ বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দাড়ি চুমরাইয়া, চেপ ফেলিতে ফেলিতে স্থির করিলেন যে, তাঁহারা একটা ভারি রণজয় করিয়াছেন, এবং রাজপুতেরা মূষিক তুল্য পলায়ন করিয়াছে—কোন ক্রমে রাজকুমারীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে মাত্র। বিশেষ শিবিরমধ্যে গোটাকত বড় বড় বকরি ও আরও বড় বড় চতুষ্পদ ও পক্ষবিশিষ্ট দ্বিপদের শুভাগমন হইয়াছে ও শুভ জবাইয়ের উদ্যোগ হইতেছে ইতি সম্বাদ আসিবায় অদ্য রাত্রে সমাংস খিচুড়ী ভোজনের বিশেষ প্রত্যাশা সকলেরই চিত্তমধ্যে উদিত হইল। সুতরাং তাঁহারা যে বিজয়ী বীর পুরুষ তদ্বিষয়ে আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পলাণ্ডু লসুণ বিমিশ্র পক্ক মাংসের সুগন্ধে যাঁহার মনে বীররস উছলিয়া না উঠে, তাঁহার দাড়ি গোঁপ বৃথায় ধারণ। সে গিয়া শ্মশ্রু গুম্ফ ও মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া, আতপতণ্ডুল ও মর্ত্তমান রম্ভার উপর ভরাভর করুন—তাঁহার আর কোন গতি দেখি না। তাঁহাদিগের দুঃখে আমি সর্ব্বদা কাতর।

এই রূপে আবদুল হামীদ এবং তস্য পারিষদেরা, মাংসাহার ভরসায় উচ্ছলিত বীররসে পরিপ্লুত হইয়া, শ্মশ্রুভার বহন সার্থক বিবেচনা করিলেন। আবদুল হামীদ তখন ছিলিমে একটু ফুৎকার দিয়া বলিলেন, "ভাই সব! বীরপনা ত দেখাইয়াছ—কিন্তু মেয়েটা যে রাজ-

পুত্রেরা লইয়া গিয়াছে, সে কাজটা বড় ভাল হয় নাই।—বাদশাহ সে কথা শুনিলে মনে করিবেন, যে তোমাদের রণজয় সব বৃথা গল্প। বিশ্বাস করিবেন না।” এই বলিয়া আবদুল হামীদ, একটী ফারশী বয়েৎ আওড়াইলেন—আমরা শুনিয়াছি যে সে বয়েতের একটি শব্দও ফারশী নহে—তবে খাঁ সাহেবের রক্তবর্ণ চক্ষু, হাত নাড়ার জোর, এবং গম্ভীর উচ্চারণের ঘটায় পারিষদেরা সকলেই মনে করিল যে এ একটা ভারি বয়েৎ। তখন আবদুল হামীদ বিস্মিত শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে সেই অলৌকিক বয়েতের ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, যে ফলেই কার্য্যের পরিচয়। ফলটী না দেখিলে বাদশাহ রণজয়ের কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন? তাঁহাকে ফলটি দেখাইয়া দিতে হইবে। তবে আমাদের সেরপা মিলিবে।

মাজ্জুমহোসেন নামে একজন স্থূলবুদ্ধি পারিষদ বলিল, “সে ফলটি কি?”

আবদুল হামিদ বলিলেন,

“বদ্‌বখ্‌ৎ! বুঝিলে না? সে ফলটি রাজকুমারী।”

মাজ্জুম। রাজকুমারী আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

আবদুল হামীদ। কেন, রাজকুমারী কি কাহারও গায়ে লেখা থাকে? যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া দোলায় চড়াইয়া লইয়া গেলেই বাদশাহকে ভুলান যাইতে পারে।

শ্রোতৃগণ আবদুল হামীদের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইল। তাঁহারা বিস্তর সাধুবাদ করিলেন। কিন্তু বোকা মাজ্জুম সহজে বুঝে না। সে বলিল,

“ছঁ। যে সে মেয়ে লইয়া গিয়া দিলে কি বাদসাহ ঠকিবে? মুলুকের বাদশাহ—সে কি ছোট লোক বড় লোক চিনিতে পারে না।”

আবদুল। আমরা বড় ঘরের মেয়েই লইয়া যাইব।

মাজ্জুম। কোথায় পাইবে?

আব। যেখানে বড় বাড়ী দেখিব, সেইখানে তরবাল হাতে প্রবেশ করিয়া, মেয়ে কাড়িয়া আনিয়া দোলায় বসাইব।

মাজ্জুম। দোলাই বা পাইবে কোথায়? তাও ত রাজপুত কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

আবদুল। তাহাও যেখানে দেখিব সেইখান হইতে কাড়িয়া আনিব।

মা। বস্ত্রালঙ্কার?

আ। তাও লুঠ করিয়া আনিব। হাতিয়ার থাকিলে অভাব কিসের? যার হাতিয়ার আছে, দুনিয়া তার।

পারিষদগণ আবদুল হামিদের বিজ্ঞতার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু মূর্খ মাজ্জুম তবু বুঝে না—তথাপি আপত্তি করিতে লাগিল—বলিল “তোমরা যেন রাজকন্যা সাজাইয়া বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলে

এই রূপনগরের রাজকুমারী—কিন্তু কন্যা যদি বলে যে না—আমাকে মার কোল থেকে কাড়িয়া আনিয়া জাল রাজকুমারী সাজাইয়াছে ?”

আবদুল বলিল ‘ উঃ তা আর বলিতে হয় না—দিল্লীর বাদসাহের বেগম হতে কার অসাধ ?”

মাজ্জুম। হৌক—না হয় সেই যেন লোভে পড়িয়া চুপ করিল—কিন্তু এই ছাউনিতে এত শিপাহী—ইহাদের কাহা রও না কাহার দ্বারা এ জাল প্রকাশ পাইবে—তখন আমাদিগের প্রাণ কে রাখিবে ?

আবদুল। হতাশ হইয়া বলিল—“আল্লা ! এত বড় বে-অকুব বদ-হোস কমবখ্‌ৎ বেচারা আমি ত কখন দেখি নাই। এই ছাউনির মধ্যে আমার এ কারসাজি জানিবে কে ? আমি কি এ কথা আর কাহাকে বলিব না কি ? কন্যা আনিয়া ছাউনিতে উপস্থিত করিয়া বলিব যে রাত্রে রাজপুতের ছাউনিতে পড়িয়া তাহাদের ফতে করিয়া রূপনগরের শাহজাদীকে কাড়িয়া আনিযাছি। ভাবনা কি ? সকলে সেরোপা পাইব।”

শুনিয়া পারিষদেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সুভান-এল্লা ! এত আক্কেল ও হোস ও ফেকের ও হিম্মৎ ও যওয়া মরদী ও এলেম পোষত পোষতান্ বুজুর্গ মধ্যে কেহ কখন দেখে নাই। মাজ্জুমও পরাভূত হইয়া নীরব হইয়া রহিল।

তখন আবদুল হামীদ আপন পৌরুষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ বলিলেন, “হে ভাই সকল! কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই।—আজ রাত্রেই এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এখানে কোথায় বড় লোকের বাড়ী আছে কেহ সন্ধান রাখ ?”

তখন মেহের সেখ নামে একজন শিপাহী বলিল, “আমি একটি বড় মানুষের বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি। যুদ্ধ কালে বড় পরিশ্রম হওয়ায় আমি দণ্ড ক্ষণজন্য বিশ্রামলাভের অভিপ্রায়ে এক উদ্যানমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলাম (অস্যার্থঃ প্রাণ লইয়া পলাইয়া বনের ভিতর সারা দিন লুকাইয়াছিলেন)—সেইখানে এক বড় ভারি বাড়ী দেখিয়াছি—বড় লোকের বাড়ী অনুমান হয়।”

আবদুল হামীদ খুসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“সে বাড়ীতে যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে কি না কোন সন্ধান রাখ ?”

যে বাড়ীর কথা মেহের সেখ বলিতেছিল সে মোহনলাল শেঠিয়া নামে একজন অতি ধনাঢ্য বণিকের বাড়ী। তাহারই পার্শ্বস্থ জঙ্গলে মেহের লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে যমুনা নামে একজন অর্দ্ধবয়সী পরিচারিকা ছিল—কৃষ্ণাঙ্গী, স্থূলোদরী,—পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্কা। দৈবাৎ উপরের জানেলা হইতে, বনমধ্যে লুক্কায়িত মেহেরের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। মেহেরেরও সেই সময়ে যমুনার উপর

দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এখন, এ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে কেহ কখন যমুনার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পানে চাহে নাই। যমুনা মনে করিল আজ সে সুখের দিন উপস্থিত হইয়াছে—যখন এ ব্যক্তি বনের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া আমার পানে চাহিতেছে তখন নিশ্চিত এ আমার উপাসক, ইহাকে মদনানলে পীড়িত করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া যমুনা মেহেরের প্রতি চক্ষুঃকোঠর হইতে একটি বিলোল কটাক্ষ ঝাড়িয়া গৃহকর্ম্মে গেল। আবার একটু ঘুরিয়া আসিয়া আবার একটী ধারাল রকম নয়ন বান হানিয়া ফেলিল। মেহেরও মর্ম্ম বুঝিয়া চরিতার্থ হইলেন—এই পঞ্চষষ্টি বৎসর বয়সে তাঁহার পাকা দাড়ি সার্থক বিবেচনা করিলেন—এবং বিমুগ্ধচিত্তে সন্ধ্যার পর সেই ত্রিতল গৃহমধ্যে দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যার গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পমালা সহিত যমুনাসুন্দরীর বাহুলতায় কণ্ঠ বেষ্টনের সুখকল্পনা করিতেছিলেন—ইত্যবসরে হাসান আলির ভেরী বাজিল। অগত্যা তাঁহাকে শিবিরে আসিতে হইয়াছিল কিন্তু অদর্শন কল্পনাদেবীর কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ হয়—অতএব মেহের ক্রমে ভাবিতে লাগিলেন যে সেই বাতায়নবিহারিণী মেহের-প্রেমে অভিভূতার ন্যায় সুন্দরী আর ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহাতে মেহেরের অপরাধ নাই—কেন না এই পঞ্চষষ্টি বৎসর পরিমিত জীবনমধ্যে তাহার অস্থিময় কৃষ্ণকান্তি কখনও স্ত্রীজাতির সরস কটাক্ষের বিষয়ীভূত হয় নাই। অতএব যখন আবদুল হামীদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে গৃহে যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী আছে কি না, তখন মেহের বেচারা এককালীন কল্পনা ও অলঙ্কার শাস্ত্রাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবীর বশীভূত হইয়া বলিল, যে গোলাবের মত মোলায়েম, আফতাব ও সেতারের মত রোশনাই করনেওয়ালী দুই এক জন ষোড়শী রমণী তিনি সেই গৃহে দেখিয়া আসিয়াছেন। আরও বলিলেন যে তাহারা (কল্পনায় বহু বচন)—তাহারা অত্যন্ত সুরসিকা,—তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন—এবং কেবল নিমকের অনুরোধেই তিনি সেই ত্রিতল গৃহস্থিত দুগ্ধফেণনিভশয্যা পরিত্যাগ করিয়া শিবিরের কঠিন মাটীতে শয়ন করিতে আসিয়াছেন।

আবদুল হামীদ মেহেরের সকল কথায় বিশ্বাস করিলেন কি না বলিতে পারি না—কিন্তু তিনি আহারান্তে সেই গৃহমধ্যে ইষ্টসাধনার্থ প্রবেশ করাই স্থির করিলেন। এবং অনুচরবর্গকে বলিলেন, যে তোমরা ভাই বেরাদরি মধ্যে পঞ্চাশ জন জোয়ান সংগ্রহ কর। ঠুসিয়া খিচুড়ী ভোজন করিয়া সকলে হাতিয়ার বন্দ হইয়া এইখানে আসিও। মোল্লা মুফতির মাথায় বাজ পড়ুক—আমি কিছু উত্তম সরাব সংগ্রহ করিয়াছি—একত্রে পান করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে যাত্রা করিব।

বঙ্গদর্শন ।

ষষ্ঠ বৎসর ।

কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ ।

একটি শৃঙ্খলের সঙ্গে আর একটি শৃঙ্খল, তাহার সঙ্গে আর একটি শৃঙ্খল এইরূপ অনেকগুলি শৃঙ্খল একত্র সংলগ্ন হইয়া যেরূপ এক সুদীর্ঘ শৃঙ্খল প্রস্তুত হয়, সেইরূপ এই জগৎকার্য্যে একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা, তাহার পর আর একটী ঘটনা, এইরূপ ঘটনা পরম্পরা কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবন্ধ হইয়া সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বহমান করিতেছে। একটী ঘটনা, কারণ রূপে, আর একটী ঘটনারূপ কার্য্য উৎপাদন করিল। আবার শেষোক্ত ঘটনাটী কারণ হইয়া আর একটি ঘটনারূপ কার্য্য উৎপাদন করিল। যাহা একবার কার্য্য তাহাই আবার কারণ হইয়া অন্য কার্য্য উৎপাদন করিতেছে। এইরূপ আবহমান কাল যাহা কারণ বিশেষের কার্য্য মাত্র, তাহাই আবার কারণ হইয়া অন্য কার্য্য উৎপাদন করিতেছে। জল ও উত্তাপের সংযোগ একটি ঘটনা, বাষ্প উহার কার্য্য। আবার বাষ্প হইতে মেঘ উৎপন্ন হইল। মেঘের সহিত শীতল বায়ুর সংযোগ হইয়া বৃষ্টি হইল। সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যে এইরূপ ঘটনার পর ঘটনা চলিতেছে। একটী ঘটনা আর একটীর সহিত অখণ্ডনীয় যোগে বদ্ধ। বিংশতিটি গোলা একটী একটী করিয়া সরল রেখায় রাখিয়া দেও; প্রথমটিতে আঘাত কর, যদি পার্শ্বে সরিয়া যাইবার কোন কারণ না থাকে, তাহা হইলে প্রথমটী গিয়া দ্বিতীয়টিকে, দ্বিতীয়টী তৃতীয়টিকে এইরূপে শেষে উনবিংশ গোলাটী বিংশ গোলাটীকে আঘাত করিবে। প্রথম গোলাটীকে যে বলের সহিত আঘাত করা হইল, যদি সেই বলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায়, এবং প্রতিকূল অবস্থা সকলের শক্তি (অর্থাৎ ভূমির বন্ধুরতা, বায়ুর প্রতিঘাত ইত্যাদি) নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহা

হইলে প্রথম গোলা টি যখন চলিল, তখনই ঠিক করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বিংশ গোলাটী চলিবে কি না। কেবল তাহাই নহে। কয় মুহূর্ত্ত পরে শেষ গোলাটীতে আঘাত লাগিবে ও উহা চলিবে তাহা নিঃসন্দেহে গণনা করা যাইতে পারে। প্রথম গোলাটীর গতির উৎপত্তি হইতে, শেষ গোলাটির গতি উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত যে কয়েকটি ঘটনা হইল উহা কার্য্য কারণ শৃঙ্খল মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী আঘাত পরবর্ত্তী আঘাতের কারণ, আর সেই পরবর্ত্তী আঘাত তৎপরবর্ত্তী আঘাতের কারণ, সুতরাং যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যাহা একটি ঘটনা সম্বন্ধে কার্য্য তাহাই আবার আর একটী ঘটনা সম্বন্ধে কারণ হইতেছে। ঘটনা সকল পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য ও কারণ হইতেছে।

সামান্য গোলার বিষয়ে যে কথা বলা হইল অসীম ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনা সম্বন্ধে সেই কথা খাটিবে। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে নিয়ম বলেন তাহা আর কিছুই নহে, এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধীয় প্রণালী মাত্র। সমান কারণ সমান অবস্থায় সমান কার্য্য উৎপাদন করে, ইহা দেখিয়াই আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান হইয়াছে। কোন একটি ঘটনা একপ্রকার অবস্থায় একপ্রকার কার্য্য উৎপাদন করিল। আবার সেইরূপ ঘটনা, অবিকল সেই রূপ অবস্থায় ঠিক সেইরূপ কার্য্য উৎপাদন করিল, এইপ্রকার পুনঃপুনঃ দেখিয়াই আমরা বুঝিয়াছি যে, প্রকৃতি নিয়মানুসারে চলিতেছে। ইহাতে কিছুই বিশৃঙ্খলা নাই। কোন ঘটনাই আকস্মিক নহে।

সামান্য একটী দৃষ্টান্ত দেখ। শুষ্ক তৃণ অগ্নিতে নিক্ষেপ কর, তৃণ দগ্ধ হইয়া গেল। যখন যেখানে শুষ্ক তৃণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, সেইখানেই তৃণ দগ্ধ হইবে। কিন্তু আর্দ্র তৃণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দেখ, উহা যতক্ষণ আর্দ্র থাকিবে, কখনই দগ্ধ হইবে না। যখন যেখানে আর্দ্র তৃণ অগ্নিতে দিবে, আর্দ্রাবস্থায় উহা কখনই দগ্ধ হইবে না। এই প্রকার দেখিয়া দেখিয়াই লোকের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান জন্মে। যদি এমন হইত যে, একসময় দেখিলাম শুষ্কতৃণ অগ্নিতে দগ্ধ হইল, আর এক সময় হইল না, এক সময় দেখিলাম উত্তাপসংযোগে জল বাষ্পরূপে পরিণত হইল, আর এক সময় হইল না; এক সময় দেখিলাম বৃক্ষস্খলিত ফল পৃথিবীতলে পতিত হইল, আর এক সময় উহা ঊর্দ্ধগামী হইল। এক সময় দেখিলাম জল নিম্নগামী হইয়া চলিতেছে, আর এক সময় দেখিলাম উহা ঊর্দ্ধগামী হইতেছে, এক সময় দেখিলাম বিষ শরীরের রক্তকে দূষিত করিয়া দিতেছে, আর এক সময় দেখিলাম উহাকে বিশুদ্ধ করিতেছে, যদি জগতে সকল সময়ে, ও সর্ব্বত্র এই প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখিতাম, যদি দেখিতাম যে, সমান কারণ, সমান অবস্থায় সমান কার্য্য উৎপাদন করি-

তেছে না, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে নিয়মের জ্ঞান অসম্ভব হইত। বাস্তবিক প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে সমান ভাব (uniformity) দেখিবাই আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান জন্মিয়াছে।

যাহা আলোচনা করা হইল তাহাতে এই দুটি কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ কার্য্যকারণশৃঙ্খলে সমগ্র জগৎ দৃঢ় নিবদ্ধ রহিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ সমস্ত ঘটনা পরস্পরের সহিত অখণ্ডনীয় কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান জন্মিয়াছে।

বহির্জগতে যেমন অন্তর্জগতেও সেইরূপ। বহির্জগতে যেমন গ্রহ নক্ষত্রের গতি হইতে সামান্য ধূলিকণার পতন পর্য্যন্ত কিছুই আকস্মিক নয়, কিছুই বিনা কারণে হয় না, সেইরূপ অন্তর্জগতেও কোন জ্ঞান, ভাব, বা ইচ্ছা বিনা কারণে উৎপন্ন হয় না।

আমি একটি কার্য্য করিলাম। কার্য্যের কারণ কি? ইচ্ছা (will)। ইচ্ছার কারণ কি? ইচ্ছা কখন কি বিনা কারণে উৎপন্ন হইতে পারে? ইচ্ছার অবশ্য কারণ আছে। ইচ্ছার কারণ বাসনা (desire) বাসনা কোথা হইতে আসিল? বাহ্যপদার্থ বা ঘটনার সহযোগে প্রকৃতি বা চরিত্র হইতে। প্রকৃতি ও চরিত্রের কারণ কি? কতক বৈজিকতত্ত্বানুসারে পিতৃপুরুষ হইতে, এবং কতক অবস্থা ও শিক্ষা হইতে।

"স্বাধীন ইচ্ছা" এই বাক্যটির তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কেহ কি এরূপ মনে করিতে পারেন যে, মনুষ্যের কোন একটি ইচ্ছা বিনা কারণে উৎপন্ন হইতে পারে? ইচ্ছা থাকিলেই তাহার উৎপত্তির কারণ আছে। ইচ্ছা মাত্রেই বাসনার কার্য্য। কার্য্য, কারণের অধীন, সুতরাং ইচ্ছা অবশ্য তাহার কারণ বাসনার অধীন।

বাহ্য প্রতিবন্ধক অনতিক্রমণীয় না হইলে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি। ইহারই নাম যদি "স্বাধীন ইচ্ছা" হয়, তবে সে স্বাধীন ইচ্ছা ত মনুষ্য মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকে। ইচ্ছা হইলে সেই ইচ্ছা অনুসারে মনুষ্য স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে, এ কথা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছামতের পক্ষপাতীরা কি এরূপ বলিতে পারেন যে, মনুষ্য যাহা ইচ্ছা তাহাই ইচ্ছা করিতে পারে? যাহা ইচ্ছা তাহাই ইচ্ছা করা, এ বাক্যের ত কোন অর্থই নাই। ইচ্ছার উৎপত্তির পূর্ব্বে কেমন করিয়া ইচ্ছা আসিবে? ইচ্ছার উৎপত্তির পূর্ব্বে অবশ্য আর কিছু আছে। সেই "আর কিছু" ইচ্ছার কারণ, ইচ্ছা তাহার কার্য্য; সুতরাং ইচ্ছা তাহার অধীন। ইচ্ছার স্বাধীনতা কোথায় রহিল?

আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি, সেই জন্যই ইচ্ছার স্বাধীনতার মতটি উঠিয়াছে। স্বাধীনতা শব্দের অর্থই স্ব অধীনতা, আপনার অধীনতা অর্থাৎ

আমাদের যাহা ইচ্ছা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারি। কিন্তু ইচ্ছার সৃষ্টি করিতে পারি না। কেন না কোন্ ইচ্ছা দ্বারা ইচ্ছার সৃষ্টি করিব? ইচ্ছাসৃষ্টির পূর্ব্বে অবশ্য ইচ্ছা ছিল না।

"স্বাধীন ইচ্ছা" মতের পক্ষপাতীরা বলেন যে, প্রত্যেক মনুষ্য আপনাকে স্বাধীন বলিয়া অনুভব করেন, স্বাধীনতার বিশ্বাস স্বাভাবিক। আমরা জিজ্ঞাসা করি প্রত্যেক মনুষ্য কি অনুভব করে? ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে যে, আমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি। যদি কাহারও পক্ষাঘাত হয় সে আপনাকে স্বাধীন মনে করে না কেন? এই জন্য যে মনে ইচ্ছা থাকিলেও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার শক্তি নাই। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্য কি এরূপ অনুভব করে যে, সে ইচ্ছার সৃষ্টি করিতে পারে? কোন প্রকার বিশেষ ইচ্ছা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা যদি জন্মিয়া থাকে, তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, সে ইচ্ছাই জন্মিয়াছে। স্বাধীন-ইচ্ছামতের পক্ষপাতীরা বলেন যে, কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে মন বলিয়া দেয় যে, উহা করিতেও পারি, না করিতেও পারি। উক্ত কার্য্য করিলে পর মনই বলিয়া দেয় ইহা না করিলেও করিতে পারিতাম। সেই জন্যই দুষ্কর্ম্ম করিয়া অনুতাপ হয়। এটি অত্যন্ত অযুক্ত কথা। মনোবিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেরই মতে সংজ্ঞা (consciousness) মনের বর্ত্তমান অবস্থা বলিয়া দেয়। ভূত ভবিষ্যতের সহিত উহার সম্বন্ধ কি?

বিপরীত প্রকৃতির দুটী অভিসন্ধি বা বাসনার মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন মনুষ্য আপনাকে বিশেষরূপ স্বাধীন বলিয়া প্রতীতি করে। বিরোধের অবস্থায় মনুষ্য বিচার করে, বিতর্ক করে, আলোচনা করে, একবার অগ্রসর হয়, আবার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, সুতরাং সে মনে করে যে সে নিজে স্বাধীন ভাবে এ প্রকার করিতেছে। এরূপ বিরোধের অবস্থায় স্বাধীনতায় বিশ্বাস উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে।

একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। মনে কর, দুটী চুম্বক পাথরের দুই পার্শ্বে ও মধ্যস্থলে এক খণ্ড লৌহ রহিয়াছে। যদি দুইখানি চুম্বকের আকর্ষণ সমান হয়, তাহা হইলে লৌহখণ্ড যেখানে আছে সেইখানেই থাকিবে। কোন দিকেই চালিত হইবে না। কিন্তু যদি দুইখানি চুম্বকের মধ্যে একখানির আকর্ষণ প্রবলতর হয়, তাহা হইলে লৌহ সেই দিকেই চালিত হইবে। আমাদের প্রবৃত্তি বা বাসনা সকল অবিকল এই প্রকার ভাবে কার্য্য করে। যদি দুটী বাসনা সমান প্রবল থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য কোন দিকেই হেলিতে পারিবে না। কিন্তু যদি দুটির মধ্যে একটী অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে তাহা হইলে সেই প্রবলতর বাসনার দিকেই ধাবিত হইবে, এবং সেই বাসনার অনুযায়ী কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইবে।

মনে কর একটি নির্জ্জন স্থানে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা কুড়াইয়া পাইলাম, পাইবামাত্র উহা আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তৎপরক্ষণেই মনে হইল যে উহা অধর্ম্ম, যাহার ধন তাহাকে অন্বেষণ করিয়া প্রত্যর্পণ করাই বিধেয়। এই উভয়প্রকার বাসনার মধ্যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইল। একবার একটী আবার অপরটি পর্য্যায়ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে উভয়ের মধ্যে কোন একটির জয়লাভ হইল।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, প্রবলতর বাসনা যে মনুষ্যকে স্বীয় অধীনে আনিল এমন নহে, মনুষ্য নিজেই সেই অভিসন্ধিকে প্রবল করিল, সে আপনিই স্বাধীন ভাবে উভয়প্রকার অভিসন্ধির মধ্যে কোন একটীকে জয় দান করিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জয় দান করিল কেন? একটীর পরিবর্ত্তে আর একটিকে জয়দান করিবার যে ইচ্ছা তাহার কি কোন কারণ নাই? সেই মানসিক অবস্থার উৎপাদক কি কোন পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা নাই?

আমরা দেখিলাম যে জড় জগৎ কার্য্য কারণ শৃঙ্খলবদ্ধ একটী কল মাত্র। আবার ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, মনোজগৎও ঐ প্রকার আর একটি কল। আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের ইহাই উপদেশ যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সকল অংশের সহিত সকল অংশের যোগ রহিয়াছে। নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও নিয়ত পরবর্ত্তীরূপে ঘটনা সকল পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ। এই প্রকাণ্ড যন্ত্রের নিগূঢ় কার্য্যপ্রণালীর অনুসন্ধান করাই মনুষ্যের সুমহৎ অধিকার। এই যন্ত্রসম্বন্ধীয় সত্য আহরণ করাই বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। এই যন্ত্রের জ্ঞানই প্রকৃত বিজ্ঞান।

জড় ও মন উভয়ই যখন নিয়মে বদ্ধ তখন উভয় সম্বন্ধীয় ঘটনারই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব। কেবল সম্ভব কেন? বহুকাল হইতে বৈজ্ঞানিকেরা ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিতেছেন, এবং উহা সফলও হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে গোলার বিষয়ে যেমন বলিয়াছি যে, সমস্ত অবস্থাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে প্রথম গোলাটিতে আঘাত করিবামাত্র নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে বিংশ গোলাটিতে আঘাত লাগিবে কি না, সেইরূপ সমস্ত অবস্থা নিয়ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে জগতের যাবতীয় ঘটনাসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। কবে সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ হইবে, কবে ধূমকেতুর উদয় হইবে, জ্যোতির্ব্বিদ্‌পণ্ডিতেরা বহুকাল হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিতেছেন। গ্রহ উপগ্রহ বিষয়ক নিয়মাদির জ্ঞান কতকটা লাভ করা হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা অক্লেশে উক্ত ঘটনা সকল বহুকাল পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পান।

যে পরিমাণে বিজ্ঞান উন্নতিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে, সে পরিমাণে মনুষ্য, জগতের ভাবী ঘটনার জ্ঞানলাভ করিতে

থাকিবে। এই শতাব্দীতে বিজ্ঞান যতটুকু উন্নত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই আমরা আশ্চর্য্য হই। কিন্তু বাস্তবিক ইহা নিশ্চয় যে বিজ্ঞানের এখন শৈশবাবস্থা মাত্র। *সেই জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অতি* অল্প বিষয়েরই ভবিষ্যৎ দেখিতে পান। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশ বিষয়েরই এখন ভাবী জ্ঞান অসম্ভব। কেন না, সে সকলের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান এখনও মনুষ্য উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। মনুষ্য যদি সকল বিষয়েরই কার্য্যকারণশৃঙ্খল সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে সকল বিষয়েরই ভাবী কার্য্য বলিয়া দিতে পারিত। জড়জগৎ সম্বন্ধে যেমন বলিয়া দিতে পারিত এবং এখনই কিয়ৎপরিমাণে পারে, মনোজগৎ সম্বন্ধেও অবশ্য সেই রূপ পারিত। জড় ও মন সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইলে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল ঘটনারই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইবে। এখন যেমন বলা যায় যে, কবে ধূমকেতুর উদয় হইবে, কবে চন্দ্রগ্রহণ হইবে ; সেই প্রকার আমাদের জ্ঞান অধিকতর উন্নত হইলে আমরা বলিতে পারিব যে কবে অমুক ব্যক্তি একটী মিথ্যা কথা বলিবে, কবে সে প্রবঞ্চনা করিয়া আপনার ভ্রাতার সম্পত্তি অপহরণ করিবে, কবে সে নরহত্যা করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অথবা কবে সে অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ করিয়া জনসমাজের হিতসাধন করিবে। সামাজিক বিষয়েও সেইরূপ নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যাইতে পারিবে যে, কতদিন পরে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বিনাশদশা প্রাপ্ত হইবে, আর কতদিন ভারতবর্ষ বিদেশীয় *জাতির অধীন থাকিবে।*

এ স্থলে একটী কথা সহজেই আসিতেছে। প্রসিদ্ধনামা জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার রচিত তর্কশাস্ত্রে আসিয়া (Asia) দেশের প্রচলিত অদৃষ্টবাদ ও ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত কারণবাদ মধ্যে বিভিন্নতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, আসিয়ার প্রচলিত অদৃষ্টবাদ মনুষ্যের অদৃষ্টকে কোন অজ্ঞাত বা দৈব শক্তির অধীন করে, কিন্তু ইউরোপে প্রচলিত কারণবাদ মনুষ্যের কার্য্যনিচয় ও কার্য্যকারণসম্বন্ধ দ্বারা ব্যখ্যা করে।

Real fatalism is of two kinds. Pure Asiatic fatalism, the fatalism of Œdipus, holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract destiny, will over-rule them and compel us to act, not as we desire, but in the manner pre-destined. The other kind, modified fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, our will by our desires, and our desires by the joint influence of the

motives presented to us and of our individual character.

J. S Mill.

মিল যে কথা বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই উভয় প্রকার মত মূলে বিভিন্ন হইলেও ফলে সম্পূর্ণ এক। আসিয়ার প্রচলিত অদৃষ্টবাদ যেমন নিশ্চয় করিয়া বলে যে, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটবেই, কেহ তাহার অন্যথা করিতে পারে না, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রচারিত কারণবাদ হইতেও সেই কথা নিষ্পন্ন হইতেছে যে, যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে। ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন অখণ্ডনীয় কার্য্যকারণসূত্রে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইউরোপ ও আসিয়ার মত বিভিন্ন পথ দিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু পরিশেষে একস্থানেই আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই উভয় মতের মধ্যে ফলে প্রভেদ কোথায়?

আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, এক্ষণে তাহার ফলাফলের বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাউক। জড়জগৎ ও জনসমাজ কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ; এই মত হইতে অতি গুরুতর ফল উৎপন্ন হইতে পারে। আলোচিত মতে যদি সকল মনুষ্যের সন্দেহশূন্য সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে এখন জগতে যেপ্রকার ভাবে নিন্দা প্রশংসা, ঘৃণা ও শ্রদ্ধার কার্য্য চলিতেছে ইহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কেবল তাহাই নহে অনুশোচনা ও উদ্যোগ বিনাশদশা প্রাপ্ত হয়।

মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ব্যভিচারী নরহন্তা, মনুষ্য যতই কেন দুষ্ক্রিয়াসক্ত হউক না, তাহাকে তুমি ঘৃণা করিতেছ কেন? তাহার নিন্দা করিবার তোমার অধিকার কি? তাহার যখন নিজের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই, কার্য্যকারণশৃঙ্খলে তাহার দেহ মন দিবারজনী যখন দৃঢ়নিবদ্ধ, নিয়মচক্রে যখন সে প্রতিনিয়ত ভ্রাম্যমাণ তখন তাহার অপরাধ কি? আবার যে পবিত্রচেতা সাধু, লোকহিতব্রতে শরীর মন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারই বা এত প্রশংসা করিতেছ কেন? তিনিও ত অখণ্ডনীয় নিয়মের দাস মাত্র? তুমি উত্তর করিবে যে সুন্দর পদার্থ দেখিলে প্রীত হওয়া মনুষ্যের স্বভাব। সুন্দর গোলাব, সুন্দর চন্দ্রমা দেখিয়া কে না আনন্দিত হয়? ভাল জিনিষ দেখিলেই লোকে তাহাকে স্বভাবতঃ ভালবাসে, কুৎসিত বস্তু দেখিলেই তাহাকে স্বভাবতঃ ঘৃণা করে। চন্দ্র স্বাধীন ইচ্ছায় সুন্দর হয় নাই, এবং পঙ্ক স্বাধীন ইচ্ছায় মলিন হয় নাই, অথচ আমাদের এমনি প্রকৃতি যে আমরা একটীকে ভাল না বাসিয়া এবং অপরটীকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারি না। মনুষ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। ভাল লোককে আমরা স্বভাবতঃ ভালবাসি, মন্দ লোককে স্বভাবতঃ ঘৃণা করি। স্বাধীন ইচ্ছা থাকুক না থাকুক তাহাতে কি আসিয়া গেল?

এ সকল কথা মানিলাম। মন্দলোককে মন্দ অবশ্য বলিবে, কিন্তু তাহাকে অপরাধী বলিতে পারিবে না; কেন না সে নিয়মের দাস। ভাললোককে ভাল অবশ্য বলিবে কিন্তু ভাল হওয়াতে তাহার যে নিজের কিছুই "বাহাদুরি" নাই এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কেননা তিনিও নিয়মের দাস। যে বসন্তরোগী রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, যে গলিতকুষ্ঠ রোগপ্রপীড়িত দরিদ্র পথে বসিয়া চীৎকার করিতেছে, উহাদিগকে তুমি ঘৃণা কর? লোকের বাড়ী বাড়ী কি উহাদের রোগের জন্য উহাদের নিন্দা করিয়া বেড়াও? তাহা যদি না কর, তবে তোমার যে প্রতিবাসী চৌর্য্যবৃত্তিপ্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার কেন নিন্দা করিতেছ? চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা সমাজের যত অনিষ্ট সংঘটিত হয়, সংক্রামক বসন্তরোগে কি তদপেক্ষা কিছু অল্প অনিষ্ট হয়? আর বসন্ত ও কুষ্ঠরোগ যেমন নিয়মের ফল, চৌর্য্যবৃত্তিও কি সেইরূপ নহে?

সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে অদৃষ্টবাদে বা কারণবাদে দৃঢ়বিশ্বাস হইলে যে ভাবে এখন জনসমাজে নিন্দা প্রশংসা চলিতেছে সে ভাবে কখনই চলিতে পারে না। চোর, প্রতারক, নরহন্তা প্রভৃতি লোকের কথা দূরে থাকুক, এখন জনসমাজের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে যে অশেষ যন্ত্রণাপ্রপীড়িত জীর্ণদেহ অক্ষম দরিদ্র উদরের জ্বালায় অপরের অন্নমুষ্টি অপহরণ করে, তাহাকেও অন্নপানে পরিপুষ্ট পিতৃপুরুষার্জ্জিত ধনলাভে নিশ্চিন্ত, নীতিজ্ঞেরাও আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন না। যে যুবতী বিধবা, প্রকৃতির দুর্নিবার উত্তেজনা অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া বিপথে পদার্পণ করে, তাহাকেও যে অশীতিপর বৃদ্ধ চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন, তিনিও অসতী বলিয়া ঘৃণা করিতে সঙ্কুচিত হন না।

কারণবাদে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে সহানুভূতি ও ক্ষমা যে এখনকার অপেক্ষা সহস্র গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। লোকে যদি দেখে যে মনুষ্য অবস্থার দাস মাত্র, ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের একটি অংশ মাত্র, সে নিজে স্বাধীনভাবে, কার্য্যকারণ সূত্র অতিক্রম করিয়া একটী ক্ষুদ্র কেশকেও বিচলিত করিতে পারে না, তাহা হইলে কেন আর কর্কশভাবে তাহাকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইবে? যে বংশখণ্ডের আঘাতে তুমি মস্তকে বেদনা পাও তাহাকে কি তুমি তিরস্কার করিতে চাও? বালক ভূমিতলে পতিত হইলে রাগ করিয়া ভূমিকে আঘাত করে, কেন না সে মনে করে যে ভূমি চৈতন্যবিশিষ্ট পদার্থ ও সে তাহাকে স্বাধীনভাবে আঘাত করিল। কিন্তু যখনই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারে যে ভূমি চৈতন্যবিশিষ্ট ও স্বাধীন নহে, তখন আর পতিত হইলে সে ভূমির উপর রাগ করিবে না। মনুষ্য

সম্বন্ধেও সেইরূপ। যখন লোকে বুঝিতে পারিবে যে প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর মন কার্য্যকারণসূত্রে বদ্ধ,তখন আর কাহারও দোষের জন্য তাহাকে কেহ ঘৃণা বা তিরস্কার করিতে যাইবে না।

এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে তবে কি রাজনৈতিক ও সামাজিক শাসন একেবারে উঠিয়া যাইবে? স্বাধীনতা নাই বলিয়া কি চোর ও নরহন্তাকে রাজা শাস্তি দিবেন না? কেহ কোন দুষ্কার্য্য করিলে কি সমাজ তাহার শাসন করিবে না? এবং তাহা হইলে সংসার হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা এককালীন কি তিরোহিত হইয়া যাইবে না?

নিশ্চয়ই যাইবে। যাঁহারা কারণবাদের পক্ষপাতী তাঁহারা কখনই এমন বলেন না যে রাজনৈতিক ও সামাজিক শাসন উঠাইয়া দেও। যে সকল কারণে লোকের চরিত্র ও আচরণকে নিয়মিত ও পরিচালিত করে, রাজকীয় ও সামাজিক শাসন তন্মধ্যে প্রধান,সুতরাং রাজকীয় ও সামাজিক শাসন কারণবাদের বিরোধী নহে, বরং উহার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গত। কারণবাদীরা ইহাই বলেন যে, মনুষ্য অভিসন্ধির অধীন হইয়া কার্য্য করে। দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির পক্ষে, অন্যান্য অভিসন্ধির মধ্যে শাসনের ভয় একটী অভিসন্ধি হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সামাজিক ও রাজকীয় শাসনের সহিত কারণবাদের অসঙ্গতি কেন থাকিবে? কারণবাদ স্বীকার করিলে দোষী ব্যক্তিকে ঘৃণা অবশ্য করিতে পারি না, কিন্তু ভবিষ্যতে সে আর দুষ্কর্ম্ম না করে সে জন্য তাহাকে শাসন করিতে পারি। এতদ্ভিন্ন অন্য লোকে দুষ্কর্ম্ম করিতে ভয় পাইবে বলিয়াও শাস্তিবিধান আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে ভাবে এখন জনসমাজে নিন্দা প্রশংসা চলিতেছে, কারণবাদে বিশ্বাস জন্মিলে তাহা আর কখনই চলিতে পারে না। ইহাও বলা হইয়াছে যে কারণবাদে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে অনুশোচনা ও উদ্যোগ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

এ কথা যদি সত্য হয়,তবে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, উহা কারণবাদের একটি নিতান্ত অনিষ্টকর ঘৃণিত ফল। এস্থলে কারণবাদীরা বিরক্ত হইয়া বলিবেন, কারণবাদ হইতে এ প্রকার জঘন্য ফল কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা এখনই পরিষ্কাররূপে দেখাইব যে, কারণবাদে নিশ্চয়ই এই বিষময় ফল প্রসব করে।

এস্থলে পাঠকগণ বলিতে পারেন যে, তুমি যে কারণবাদকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য এতক্ষণ তর্কজাল বিস্তার করিলে, স্বাধীন ইচ্ছা মতের মূলে কুঠারাঘাত করিলে, এখন আবার সেই কারণবাদেরই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে কেন? তাহারই অশুভ ফল প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইতেছ কেন?

এ কথার উত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে, আমরা মতের দাস হইতে চাই না,

সত্যের অনুগত থাকিতে ইচ্ছা করি। যে বিশুদ্ধযুক্তি আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে যে, স্বাধীন ইচ্ছা মতের কোন মূল নাই, সেই বিশুদ্ধযুক্তিই আমাদিগকে বলিতেছে যে, উক্ত মতের নৈতিক ফল নিতান্ত শোচনীয়।

সূর্য্য হইতে কি অন্ধকার আসিতে পারে? সত্য হইতে কি অমঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে? কারণবাদ যদি সত্য হয়, তবে তাহা হইতে অশুভ ফল প্রসূত হইবে কেন? এ প্রশ্নের এখন আমরা কোন উত্তর করিতে পারি না। দুটি সিদ্ধান্ত আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হইতে পারে, অথচ তাহাদিগের মধ্যে বাস্তবিক সঙ্গতি থাকাও অসম্ভব নহে। সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছি না বলিয়া যে, দুটি আপত্তির বিরুদ্ধ মতের মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ইহা আমরা স্বীকার করি না।

কিন্তু কারণবাদীরা বলিবেন যে, বাস্তবিক এ স্থলে সে প্রকার অসামঞ্জস্যের বিষয় কিছুই নাই। কারণবাদ হইতে মানবচরিত্র সম্বন্ধে কোন অশুভ ফল উৎপন্ন হয় না।

আমরা বলি হয়। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। একজন কারণবাদী দেখিলেন যে, তাঁহার তরুণবয়স্ক পুত্র বিদ্যাশিক্ষায় অনাবিষ্ট হইয়া দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া পুত্রকে তিরস্কার ও উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্র পিতাকে বলিল আপনি কেন আমাকে তিরস্কার করিতেছেন? আপনি ত জানেন যে সকলই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ। আমি নিজে স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারি না। আমার প্রত্যেক চিন্তা, ইচ্ছা, ও কার্য্য এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের অংশ মাত্র। জগতের সকল ঘটনাই অখণ্ডনীয়। উপযুক্ত ভাবী দৃষ্টি থাকিলে, আমি যে মন্দ হইয়া যাইব ইহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কেহ বলিয়া দিতে পারিত। পিতা বলিলেন, কারণবাদ সত্য বলিয়াই আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, উপদেশে তোমার মন পরিবর্ত্তিত হইবে। পুত্র বলিলেন আপনি উপদেশ দিন, কিন্তু হয় ত ইহাই অনাদিকাল হইতে স্থির হইয়া রহিয়াছে যে, আপনি কলের ন্যায় আমাকে তিরস্কার করিবেন, এবং আমিও আপনার তিরস্কার কলের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া মন্দ হইয়া যাইব। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে যখন ভূত ভবিষ্যৎ বদ্ধ, তখন ভাল হইবার হয় ত ভাল হইব, মন্দ হইবার হয় ত মন্দ হইব।

আর একটী দৃষ্টান্ত। ঐ যে সম্মুখে ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিতেছে মনে কর উহার জ্ঞান আছে। ঘড়িতে তিনটায় একটা বাজিল। তুমি বিরক্ত হইয়া ঘড়িকে বলিলে, "ঘড়ি, তোমার ইহা বড় অন্যায়, মিথ্যা কথা বল কেন?" ঘড়ি বলিল আমার দোষ কি? আমি কল মাত্র। আমার স্বাধীনতা নাই; সুতরাং অপরাধ নাই, অনুতাপও নাই,

বাস্তবিক ঘড়ি তিনটার সময় একটা বাজার জন্য আপনাকে অপরাধী মনে করিতে পারে না ; এবং অনুতপ্ত হইয়া আক্ষেপ করিতেও পারে না "হায়! হায়! আমি কি করিলাম! আমি মহা পাপী।"

মনুষ্যেরও যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সে জ্ঞানবিশিষ্ট কল মাত্র। তবে সে কখনই অনুতাপ করিতে পারে না। করা অসম্ভব। কেহ বলিতে পারেন যে, অনেক লোক ত কারণবাদী আছেন কিন্তু তথাচ তাঁহারা অন্যায় কর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করেন কেন? এই জন্য যে কারণবাদের মতে তাঁহাদের সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই।

যেমন অনুশোচনা অসম্ভব সেইরূপ চেষ্টা ও যত্নও অসম্ভব। ঘড়ির দৃষ্টান্ত পুনর্ব্বার গ্রহণ কর। যে ঘড়িতে তিনটার সময় একটা বাজিল তাহাকে তুমি যদি বল "ঘড়ি" তুমি ভবিষ্যতে আর এমন কর্ম্ম করিও না। ঠিক তিনটার সময় যাহাতে তিনটা বাজে তাহাই করিবে। ঘড়ি উত্তর করিল আমি কল, চেষ্টা করিবার আমার সাধ্য কি?

মানুষ্যঘড়িও সেই প্রকার বলিবে, আমি কি করিব? নিয়তির অবিনশ্বর পুস্তকে যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহাই হইবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, কারণবাদে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে উৎকর্ষ লাভ বা সংশোধনের চেষ্টা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আলস্য সম্পূর্ণ প্রশ্রয় পাইবে। সুতরাং সংসারের যারপর নাই অমঙ্গল সংঘটিত হইবে। দায়িত্ব বোধও চলিয়া যাইবে, কেন না যে কল, তাহার আবার দায়িত্ব কি?

এ স্থলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, হয় কারণবাদের মত মিথ্যা, নতুবা তাহার যে ফলের কথা বলা হইল তাহা মিথ্যা। আমরা বলি তাহা হইতে পারে। কিন্তু যদি তাহা কেহ প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে ভাল হয়। আমরা জানি বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা যাহা লিখিলাম তাহা অনেকেরই মতের সহিত মিলিবে না। সেই জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, যদি কেহ এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখিয়া ইহার ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট একান্ত অনুগৃহীত হই।

ন, না।

গঙ্গাধর শর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেম-বিকার।

শ্রীনগর ও শান্তিপুরের প্রান্তরের মধ্যে বেগবতী ক্ষুদ্র নদীর কূলদ্বয় শরদাগমে আজ কাল রমণীয় শ্রীধারণ করিয়াছে। উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত হরিতময় শস্যক্ষেত্রে শিখা পরিপূর্ণ শস্যদল নিরন্তর ঊর্ম্মিবৎ হেলিতেছে দুলিতেছে, চকিত মাত্র আলোকচ্ছায়া শন শন করিয়া হরিত-পল্লবের শস্যোপরি বেগবান হইতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রগাঢ়পীতবর্ণ শণকুসুম শস্য ক্ষেত্রের উপর শিরোত্তোলন করিয়া শরৎ-বায়ুতে আন্দোলিত হইতেছে, আবার কোথাও দুই একটী ক্ষেত্রে উচ্চ উচ্চ পাট-বৃক্ষশিরে তীক্ষ্ণ শণপত্র সমূহ বায়ু শ্বাসে উল্টাইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষেত্রের প্রান্তরে বহুদুরবিস্তৃত নীল জলাশয়, শ্বেত রক্ত শতদলে পরিপূর্ণ, নীল-বসনা মহীর স্বচ্ছ উরসে আঙ্গিয়া সদৃশ দৃশ্যমান। এই সরসীর পার্শ্বে আশু তোষ বাবুর বিস্তৃত "রমণা" কাননের পাকা প্রাচীরপরিধি দেখা যাইতেছে। রমণার কোন অংশে ফলের উদ্যান, কোন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বদেশী বা বিদেশ জাত বহুল পুষ্পতরুতে শোভমান। আবার কোন স্থল শত শত ক্ষুদ্রফুলের বীজভূমি; শরৎজলে ধৌত হইয়া সকল বৃক্ষের সকল পত্রের সকল পুষ্পেরই নবভাব প্রাপ্ত, শরদালোকে সকলই কমনীয়। উদ্যানের নৈঋত কোণে একটী পুষ্করিণীর তটে একটী শ্বেত অট্টালিকা শোভমান। তাহার ছায়া স্বচ্ছ সরোবর-বক্ষে নতশিরে কাঁপিতেছে, আজ বর্ষা-জলসিক্ত শারদ মেঘদল আকাশের মধ্য-ভাগ ত্যাগ করিয়া বহুদূরে, প্রান্তরে, বৃক্ষশিরে শয়ন করিয়া যেন সূর্য্যকিরণে অঙ্গ বিশুষ্ক করিতেছে। আকাশের মধ্যদেশ নির্ম্মল নীলিম স্বচ্ছ স্ফাটিকের কটাহের মত উদ্যানের উপরিভাগে চাপিয়া বসিয়াছে। অট্টালিকার যেদিকে পুষ্করিণী তাহার অপরদিকে সোপান-শ্রেণীর পাদদেশ হইতে একটি কঙ্কর-নির্ম্মিত বিস্তৃত পথ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে ও বহুদুরে একটি সুরম্য ঝিলের উপর কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। সূর্য্যদেব আজ প্রাতেই কোমল রশ্মিতে নির্ম্মল আকাশ, উচ্চ বৃক্ষের পল্লবদল, অট্টালিকার কাচদ্বার, শ্বেত শতদল, রাঙ্গা পদ্ম, রাঙ্গা জবা, শেফালিকা, কৃষ্ণচূড়া, হাস্যমুখী স্বামিসোহাগিনী সূর্য্যমণি, নানাজাতীয় গোলাব,

নবদুর্ব্বাদল, জলজপুষ্প উজ্জ্বল করিয়াছেন। বর্ষা শেষ হইল, এমনি বোধ হইতেছে, কারণ, বায়ুতে হীমানুভব হইতেছে ও দূর্ব্বাদলে শিশিরবিন্দু দেখা যাইতেছে। প্রিয় ভৃত্য ভৈরব আশুতোষ বাবুর মাথার উপর বাঙ্গা সাটিনের ছাতাটি হেলাইয়া ধরিয়াছে, ঝালর ঝলমল করিতেছে, আশুতোষ বাবু একটি ক্ষুদ্র কাচি হস্তে ইতস্ততঃ বৃক্ষপরিদর্শনে যথার্থ প্রভুশ্রী ধারণ করিয়া পাদচালনা করিতেছেন ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় মালিগণ আসিলে যে কয়েকটি কথা কহিবেন তাহা ভাবিতেছেন। ইত্যবসরে খঞ্জভীমকে বাগানের লম্বমান পথে আসিতে দেখা গেল। আমি বৈঠকখানার একটী গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি। শনৈঃ শনৈঃ তালে তালে খঞ্জপদ চালাইয়া বাবুমহাশয়ের সম্মুখে আসিলেন ও নমস্কার করিলেন।

"কি হে ভীমচন্দ্র" বলিয়া আশুতোষ বাবু সম্ভাষণ করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া আবার কহিলেন "এত চঞ্চলচিত্ত, মলিন মুখ কেন?"

খঞ্জ ভীম কহিলেন, মনের কথা কখন আপনাকে কহিতে ভীত নহি। আমার ধর্ম্মনীতি সমুদয় মহাশয় পরিজ্ঞাত। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" অবলম্বন করিয়া আমার জাতিভেদের প্রতি যে বড় ভক্তি নাই, তাহাও মহাশয় জানেন, আমি যে সুন্দরী গোপিনীতে অনুরক্ত তাহাও মহাশয় শুনিয়া থাকিবেন। তাহার সুনীতি ও সতীত্ব রক্ষা হেতু আমি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। তাহার জন্মদাতা কনৌজিয়া শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাহার নিজের প্রকৃতি বিশুদ্ধ। এখন কিশোরী সুন্দরী গোপিনী সদ্যোজাত বনকুসুমের স্বরূপা পবিত্র নির্ম্মলা। কি কহিব। দেওয়ানজী মহাশয়ের ষড়যন্ত্রে সেই সুন্দরী গৃহ ত্যাগিনী হইয়া যবনধর্ম্মানুসারী নাজির সাহেবের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। অবশেষ লোভপরায়ণা হইয়া ভ্রষ্টা হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমার পরিণয়ের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত দেখিতেছি। শেষোক্ত কথাগুলি কহিতে কহিতে খঞ্জভীমের চক্ষে জল আসিল।

আশুতোষ বাবু ভাবিলেন এ এক প্রকার বায়ুগ্রস্ত লোক! এবং বিয়ে পাগলা শীতু ক্ষেপাকে স্মরণ করিয়া কহিলেন এ বিবাহের ফল কি?

খঞ্জ ভীমচাঁদ উত্তর দিলেন, আমার অতি আনন্দের শুভদিন যে, মহাশয়ের মত মহদভিপ্রায় মহাজন এ কথার জিজ্ঞাসু হইলেন? কিন্তু এই আক্ষেপই ত নিতান্ত শোচনীয়, যে আপনারা এক বার দেখেন না যে, জাতিভেদে কি অনিষ্টপাত হইতেছে, পরিশুদ্ধ প্রীতির পথে কি কণ্টক রোপিত হইয়াছে—আমাদের ইংরেজি পুস্তকে একটি কথা রহিয়াছে "সুশিক্ষা হইতে সুদৃষ্টান্ত ভাল।" আমি বলি কুলীন কন্যাপেক্ষা বিধবা কন্যাবিবাহ করা ভাল, তাহা করিলে কত উন্নতি লাভ হইতে পারে।

—আমায় বাঙ্গাল বলুন আর যাহাই বলুন তবু আমরা সভ্য—ব্রাহ্মসমাজ করেছি, বিধবা ভদ্রবধূর বিবাহ দিয়াছি, আমরা দেশের ভদ্র স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া সাহেবদের সঙ্গে খানা খাইয়াছি, কতবার সভ্যতার পরিচয় দিয়াছি, এখন আবার আর একটি শ্রেয়স্কর দৃষ্টান্ত সকলকে দেখাইব। জাতিভেদ যে মন্দ তাহা কেবল মুখে না কহিয়া এক্ষণে কার্য্যে তাহার অসারতা দেখাইব এবং আশা করি আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপরে উৎসাহিত হইবে। কেবল বিফরমার কথায় হয় না।

আশুতোষ বাবু কহিলেন শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দেশাচারবিরুদ্ধ কার্য্য হঠাৎ করা কি ভাল? চরম ফল কি হইবে?

"মহাশয় এ কার্য্য প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়, তাহা হইলে শাস্ত্রবিরুদ্ধও নয়। শাস্ত্র শাস্ত্র কি? আপনি যা চালাইবেন তাই চলিবে, আপনার বাক্যই শাস্ত্র—আপনি কি বৈষ্ণবীর সহিত গরিব ব্রাহ্মণের বিবাহ দেন নাই? আবার তাহাকে জাতিতে তুলেন নাই। আপনি চালাইলে সকলই চলিতে পারে, মহাশয় পতিতপাবন।"

আশুতোষ বাবু কহিলেন এ কথা বিবেচনাধীন, সুন্দরীর কি বিপদ?

খঞ্জভীম নিম্নস্বরে আশুতোষ বাবুকে কি কথা কহিলেন, শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু বাক্য সমাপ্ত হইবামাত্র মুন্সির নিকট কি এক আদেশ লইয়া এক হরকরা দ্রুতপদে চলিল। এদিকে তর্কালঙ্কার মহাশয় ও রঘুবীর আসিয়া উপস্থিত হইল। তর্কালঙ্কার মহাশয় কাশীর নস্য প্রচুর রূপে প্রশস্ত নাসারন্ধ্রে যেন জোড়া নলী বন্দুকে বারুদ ঠাশিতেছেন, মধ্যাতর্জ্জনীর অর্দ্ধেক প্রবেশ করিতেছে অথচ নস্য তেজোহীন হইয়াছে, বর্ষায় জলসিক্ত হইয়াছে কহিতেছেন।

রঘুবীর একটি শুভ্র রেকাবিতে শুভ্র রুমাল ঝাপিয়া কি দ্রব্য হস্তে বাবুজি মহাশয়ের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া সসম্মান মূর্ত্তি স্থিরভাবে দাঁড়াইল। দ্রব্য গুলি কি আমি জানিতাম, আমি স্বস্থান হইতে আরও অন্ধকার স্থানে লুকায়িত হইলাম।

আশুতোষ বাবু প্রথমতঃ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বর্ণশঙ্করের বিবাহ কতদূর শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তাহারই বিধান জিজ্ঞাসা করিলেন। তর্কালঙ্কার তদুত্তরে বিশুদ্ধ জাতির সহিত বিশুদ্ধ জাতির বিবাহ ভিন্ন অপর সমস্ত বিবাহ পশুবৎ বা পৈশাচিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। আশুতোষ বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন শাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিলে কোন্ বিষয়ের বিধান প্রাপ্তি না হয়? রঘুবীর কহিয়া উঠিল হজুর, বড় দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তা আর এ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুঁথি কামধেনু, আমার মোকদ্দমায় বড় উকীল সাহেব রকম ররকম আইন বাহির করে আমায় খালাস দিলেন, সুগন্ধি বাবুও ইস্বর কাগজে খুব মোসাবেদা করেছিলেন। সাহেব শুনিলেন আর কহিলেন রঘু

নির্দ্দোষী খালাস। বাবাঠাকুর মাষ্টার বাবুকে উদ্ধার করিবেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন "হতে পারে—অনেক বিষয়ই যুক্তির উপর নির্ভর।"

বন্ধু কহিল, আর দক্ষিণার উপর। তর্কালঙ্কারমহাশয় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ও চর্ম্মপাদুকা গ্রহণ করিতেছিলেন কিন্তু নাসের শম্বুক ভূমে পতিত হওয়ায় নস্য ছড়া ছড়িতে বস্ত্র তাম্রবর্ণ হইল।

আশুবাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বিধানানুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন ও বন্ধুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ভূমে একটি থালি রাখিয়া বন্ধুবীর নজর দান করিল।

আশু। এ কি ?

বন্ধু। মোকর্দ্দমা জিতে ঘরে আসিয়াছি। প্রভুর জন্য যৎকিঞ্চিৎ নজর আনিয়াছি। ফল মাত্র—

ভৈরব রুমাল উঠাইল ও কহিল এই তোমার এলাইচ দানা—আর বেদানা। এদিকে ঢাকুনী উঠাইতেই রেকাবের একাংশ হইতে ফর ফর করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত কাচপোকা থালা হইতে উড়িয়া গেল আর এক পাশে বিলাতী ঘেটু বৃক্ষের নব নব রাঙ্গা কুসুম গুলি মাত্র রহিল।

আ। এ কি ?

বন্ধু। এ ঘেটু ফুল আর কাচপোকা অনেক যত্নে জমা করিয়াছিলাম, প্রভু, পোকা গুলি মারিয়া আনিয়াছিলাম বাতাসে বাঁচিয়া উঠিল।

আ। এ কি তামাসা ?

বন্ধু। আজ্ঞা না, উভয় দ্রব্যই ত হুজুরের প্রিয়। এই বিলাতী ঘেটু ফুল যাহাকে হুজুর বেদানা কহেন। এ ক্ষুদ্র কাচপোকা যাহাকে বড় লোকে এলাইচ দানা বলেন।

আ। এ শিক্ষা তোরে কে দিলে ?

ব। জটাধারী। এখন হুজুরের মর্জ্জি হয় ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের টোলে পাঠাইয়া দিই। এত পক্কান্ন নব ইহার কোন দোষ নাই—বাবু মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিলেন, এই সময় এক জন অশ্বারোহী পুরুষ দড় বড় করিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীযুত মহাশয় একখানি পত্র পাইয়া পুনরায় তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবামাত্র অশ্বারোহী আবার বেগে উদ্যানের বৃহৎদ্বার হইয়া বহির্দ্দেশে ত্বরিত গমন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বিয়ে পাগলা শীতু।

রমণী কাননের বৈঠকখানার হল কামরায় আশু বাবু বসিলেন। পাখা শন শন শব্দে দুলিতে লাগিল, সেই শব্দ বাহিরে ঝাউগাছের উচ্চ উচ্চ পত্রশীর্ষে সাঁও সাঁও শব্দের সহিত সংমিলিত, এক একবার বাতাসের ঢেউ কামরায় প্রবেশ করিয়া বেলওয়ারি লণ্ঠন ঝাড়, দেওয়ালগিরি আর গিল্ড লেপের স্ফাটিক

ঝালরে সংস্পর্শনে সুমিষ্ট বাদ্যের তরঙ্গ উঠিয়াছে, এই সময় ইঙ্গিত মাত্র একটী ভৃত্য বিলাতী বাজার বাক্সের কল ঘুরাইল, অমনি সুমিষ্ট বাদ্যতরঙ্গ ঝণকে ঝণকে কর্ণকুহর পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। পাখার শন শন, ঝাড় লণ্ঠনের ঠনটন, ও আবগিনের সঙ্গীত মিলিয়া এক সুমিষ্ট রাগিণী উত্থিত হইল। সকলেই কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ, এমন সময় দূরে ঝিলের উপর কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতুর রেলে ঠেস দিয়া শীতু ক্ষেপা সুকণ্ঠ হইতে একটি গ্রাম্য গীত ছাড়িয়া দিল।

অতিসামান্য গীত—কিন্তু সময় গুণে মিষ্ট লাগিল,

সদা, ববম্ ববম্, ববম্,বাজায় ভোলা গাল।

ভাঙ্গে ভোর নেশায় ঘোর
আবার ভাঙ্গ্ ভাঙ্গ্ ভাঙ্গ্ বলে শিঙ্গে,
ডম্বুরেতে ধরে তাল ॥
আজ আমাদের কি আনন্দ, নৃত্য করে সদানন্দ,
সদানন্দের সঙ্গে আবার নাচে তাল বেতাল।

সুরধুনীর শুনে ধ্বনি
আমাদের নৃত্য করে মহাকাল ॥

গীতটি শিখ্‌তে হবে, কারণ জটাধারীর একটী গোপনীয় আখড়া ও সংগীতের দল ছিল। এই মনে করে ফেরতা গাইতে আরম্ভ কালে, পাশের একটি দ্বার দিয়া বৃক্ষ তল হইয়া এক দৌড়ে সেতুর নিকট উপস্থিত। শীতু ঠাকুর গানে মত্ত, আমি আশে পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, তাঁহার গানেই মন, দুইবার গীত গাওয়া হইল, আমি কহিলাম, "শিখেছি শীতু খুড।" ক্ষেপা উত্তর করিলেন,"কি ভাই!" আমি কহিলাম খুড়ীর ঠিকানা হইয়াছে, বাবুমহাশয় কহিতেছিলেন যে আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই তোমার শুভবিবাহ নির্ব্বাহ হইবে—আজ আপনার গানে বড় সুখী হইয়াছেন। আমার শেষ কথা উচ্চারিত না হইতেই শীতুঠাকুর আবার গান করিতে উদ্যত। আমি এমন সময় কহিয়া উঠিলাম, আপনি সকল গুণসমন্বিত—কেবল বর সাজতে হবে কি না, —এক পদের রসারাতটী—আরাম করা আবশ্যক।

শীতু। আর বাবা চুলগুলি যে পাকিয়াছে, তার ঔষধ জানিস্? তোমরা যে ইংরেজী পড়ছ, ইংরেজীতে অনেক ঔষধ আছে যে শুনি ভাই। আমি কহিলাম ডাক্তার বাবু আমায় বড় ভাল বাসেন, তা সব আরাম করে দেওয়া যাইবে, কেশ কাল হইবে, পদদ্বয় স্বাভাবিক ভঙ্গী পাইবে—দাঁত? সব আছে না?

শীতু। বাবা সব আছে, কেবল কসের আ.টটী গিয়াছে আর সম্মুখের নিম্নপাটিতে একটিও নাই।

"এখন যে দাঁত তৈয়ার হতেছে।"

মনে মনে কহিলাম, বনপাশের কর্ম্মকার ভিন্ন ও কোদালিদন্ত সংস্কার হওয়া কঠিন।

শীতু আবার কহিলেন, তা বাবা ইংরেজে সব পারে, বিবাহের পণ উঠে যাবে না? বাবা চক্ষুদুটি ত আছে?

"পদ্মচক্ষু" (প্রকৃতার্থে গুগ্গুলিঙ্গিত।) "আবার মহাশয়ের নাকটি যথার্থই বাঁশী বলিলেও হয়, ইংরাজী "ড্রাওইটজ্ঞার" আখ্যা বা উহাকে বিনিন্দিত বলা যাইতে পারে।"

শীতু। দেখতে ভাল?

"ভাল নয় কি। আয়নাতে মুখ দেখেন নাই? মহাশয়, পরকালে আপনি যথার্থই লক্ষ যোদান করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশ, পূর্ব্বদেশ সমলোমাবীর্ণ ঐ সৎপুরুষের প্রকৃত লক্ষণ। বেশ কান করা ও পায়ের কুণ্টিক আরাম করা আমার ভার, টাকার কি খুড় মহাশয়?"

শীতু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তারও কি ভাবনা ছিল, বাবা, গজানন অধঃপাতে যাক। বাব বাংরেযী ব্রহ্মত্র সেই কুচক্রী বহু এক কালে গ্রাস করিল, রাজ্যপুত্র বরে নিলে, তা না হলে আর কিসের অভাব।" আমি কহিলাম, সে গজানন তোমার অভি-সম্পাতেই মর্‌বে।

শীতু কহিলেন, "তার মরণ আছে? যদি ব্রহ্মস্ব হরণ কে কর্‌বে—সে অন্ধ হয়ে পাপ ভোগ কর্‌বে।" আমি কহিলাম, বৃথা কথার সময় নাই, উদ্যোগ কি আছে—

"তোমার পিতৃপ্রসাদে আমি নিঃসম্বল নাই, যখন মোকর্দ্দামা হয় জেলায় গেছ্‌লাম, দুইরকমই গান অভ্যাস করেছিলাম, দুই দলেই গেয়েছি,—দুই দলেই টাকা খেয়েছি, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন—এই দেখ কোমরে গোঁজ, এখন কিছু টাকা নগদ মজুত আছে, আর নাগেশ্বর পুষ্করিণীর অর্দ্ধেক অংশ আছে তাহা বন্ধক দিব, আবার বিবাহ করিব, স্থির হই—আমার বগলে এই কাগজের তাড়া দেখছ? দলীল দস্তাবেজ সব প্রস্তুত, আমি কি ব্রহ্মত্তর বৃথা ত্যাগ কর্‌ব। আবার মোকদ্দামা আরম্ভ কর্‌ব, ডিক্রি হাসিল কর্‌ব, বাঁশগাড়ী করে খরচা আদায় করে তবে ছাড়্‌ব, ওটাকে তবে ছাড়্‌ব, তবে দেখ্‌বে শীতু শর্ম্মা! ব্রাহ্মণ ঔরসজাত! তবে দেখ্‌বে শীতুক্ষেপা। হতভাগার এতই লোভ—" কহিতে স্বর কম্পিত হইল, শীতুঠাকুরের কোন হৃদয়গত গুপ্ত ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল ও বগল হইতে একটি বস্ত্র প্রলেপিত কাগজের নথী বাহির করিয়া কহিলেন, "এই দেখ, মোহর দস্তখত, মহারাজ রাজচন্দ্রের ছাড়, এই দেখ পরওয়ানা ফয়সালা কি নাই? এই জজ সাহেবের মোহর দস্তখত—" আমি কহিলাম, খুড়ো একবার যে কলিকাতা পর্য্যন্ত মোকদ্দামা করিলে, কোথাও জিত ত হল না।

শী। হবে কিসে, সব সত্য ত মিথ্যে করে দিলে, আমায় ক্ষেপা বলে কাছারীর বার করে দিলে, আইন আদালত কি দরিদ্রের জন্য বাবা! ছেঁড়া কাপড়ের জন্য, নাটাপালায়ের জন্য,

তিলকের রক্ষা জন্য, না শামলার পাগড়ি, বেনসের চাপকান, সোণার চেনের শ্রীবৃদ্ধিজন্য স্থাপিত হয়েছে বাবা? যা হোক্ এবার পাঁপর করুন। উকীল বাবু বল্লেছেন সীমানা ফেরফার করে দিলে আবার মোকর্দ্দামা চলবে।

জ। খুড়ো আগে মোকর্দ্দামা না আগে বিবাহ?

শী। আগে সংসারটা বজায় করি, গৃহী হই।

আমি। আর কি কখন গৃহ হয় নাই।

শীতু খুড়া হাসিয়া কহিলেন, "লোকে বলে আমার বাবার হয়েছিল কি না সন্দেহ। আহার আভরণের যা সংস্থান ছিল, পোড়া দেওয়ান্জি তা সকল নৈরাশ করিল, বিবাহের চিন্তা কি ছিল?"

"ফলে এখন পিত্তের উপায় করা উচিত হয়েছে, চল ঔষধ দিইগে।" এই কথা কহিয়া শীতু ঠাকুরকে ঝিলের মধ্যস্থিত উপদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র গৃহে আনিলাম, তথায় তাঁহাকে তৈল মাখাইয়া তাহার উপর এখানে সেখানে শিমুল তুলা বসাইয়া ঔষধ দিলাম।

একদিকে অর্থপ্রিয়, মোকর্দ্দামা বাবসায়ী আর দিকে লোভী বিষয়ীর প্রাদুর্ভাবে দেশ বিদেশে এমন কত ক্ষেপা ক্ষেপিয়াছে! আমার শীতুঠাকুরের মূর্ত্তি দেখিয়া হাসি সম্বরণ করা দুষ্কর হইল। আমি কহিলাম, খুড চল, গীত গাইতে গাইতে বাবুর নিকট চল, শীতু রামপ্রসাদী সুরে গীত আরম্ভ করিলেন—

"ক্ষেপা ক্ষেপা বলে, সবে, কিসের ক্ষেপা কেবা জানে,
আমায় উকীল চাঁদে মজালে ভাই,
আকাশের চাঁদ হাতে এনে॥
সেটেমে ফুরাল টাকা,
চিরকুটের দামে হাজার টাকা,
ফিরেছে ফকির, শেষে,
ভিটে নিলে মহাজনে॥
বাকি জমী যে ক কাঠা,
সব নিলে গজানন বেটা,
এখন সম্বলমাত্র এই দলিল কটা
সুবিচারের গুণ বাখানে॥

গাইতে গাইতে শীতু বৈঠকখানার হল কামরায় উপস্থিত। ভৈরব খানসামা কহিয়া উঠিল, "কি বিটকেল।" শীতু যত দূর পারিলেন উপরপাটির দংষ্ট্রা নির্গত করিয়া ভৈরবের মাথার উপর দুইবার কি বিটকেল! কি বিটকেল! কহিলে, ভৈরব ভীত হইয়া কহিল, "মনিকারের ঘরে গিয়াছিলাম, ভাল মটুকের ফরমাইস দিয়াছি।" যেন চকিতে মেঘান্ত-শশীর উদয়। শীতু হাস্য করিলেন ও চর্ম্মের ক্ষুদ্র থলি হইতে এক গুলি গঞ্জিকা ভৈরবকে হাসিতে হাসিতে অর্পণ করিলেন।

আশুতোষ বাবু শীতুঠাকুরের উত্তর পাদার্দ্ধ তৈল তুলায় রঞ্জিত দেখিয়া শীতুকে কহিলেন, কি হে শীতলচাঁদ, এ যে নায়কের বেশ।

শীতু কহিলেন, কন্যা স্থির করিয়াছি?

আশুবাবু কহিলেন, কোথায়?

শী। মহাশয়। সুন্দরী গোপিনীকে আমার মনোনীত, কাল সেই পথে আসিতে ছিলাম, সে স্নান করিয়া কেশমুক্ত করিয়া একটী ক্ষুদ্র পূর্ণ কলসী কক্ষে লইয়া বক্ষঃ ঈষৎ বাঁকাইযা, ঘরমুখে আসিতেছে আমি তার অনুসারী হলেম, তাদের ঘরে গেলাম—তার মা সাহেবিনী গোপিনীকে বলিলাম, আমায় জামাই কর্‌তে হবে, সে বল্‌লে কি দিবে? আমি কোন কথা না কয়ে গেঁজে খুলিলাম। ডবল টাকা দুই হাতে দিয়া বায়না করিয়া আসিলাম।

কথা শুনিযা খঞ্জভীম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মনে করিলেন, হাতে ধন আসিতে আসিতে পথেই মারা যায়। প্রকাশ্যে কহিলেন, "মহাশয় কেমন কথা। উনি যথার্থই কি পাগল—আপনি কর্ত্তা এর সৎবিচার আপনার নিকট; আমার অনেক কালের দাবি, বোধ করি সুন্দরীকে জিজ্ঞাসিলে সে আমারই প্রিয়া প্রকাশ পাইবে। আমার উদ্দেশ্য "বিকরগেসন" ইহাও মহাশর জ্ঞাত আছেন।"

আশুতোষ বাবু কহিলেন ইহার সৎ মীমাংসা সত্বরই হইবে—এমন সময় গজানন আসিয়া উপস্থিত। খঞ্জভীমের সাক্ষাৎ তেলে বেগুনে দেখা দেখির মত। খঞ্জভীম ঠিকুরে চলিয়া গেলেন। শীতুকে গজানন কহিলেন, কি খুড়!

শীতু। এ নাগর বেশ!!

গ। মোকর্দ্দমা কর্‌বে?

শী। মোকর্দ্দমা করবে! তুমি জমি গুলি ফাঁকি দিবে?

গ। যেদিন কণের মায়ের নিকট জামাইয়ের আদর পাবে, সে দিন খুড়ো জমি লবার মর্ম্ম জান্‌বে। শীতুর হাত ধরিয়া গজানন অন্য কামরায় লইয়া গেলেন। দুজনে একটি "নিরালা" মজলিস করিলেন।

গ। বলি বেশ কথা বাবা, এত বেশ কথা। সুন্দরীই স্থির, ও ভীমাটাকে আমিই ভাগাব, তোমার যে জমি লইয়াছি, তাহার মর্ম্ম আছে; দোহাই ভগবান্! দোহাই রঘুবীর! তুমি আশুতোষ বাবুকে কোন কথা বলো না, সেই জমি পাঁচ বৎসরের জন্য বন্ধ রেখে পণের আড়াইশ টাকা প্রস্তুত করেছি। বাবা আড়াই, আড়াই শ টাকা পণের টাকা, পণের?

শীতু। ভালারে মোর ভাইপো। গজু তোমার নিত্য নিত্য শ্রীবৃদ্ধি হক। পর ক্ষণেই আবার শীতু গীত গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

চলি চলি পা পা
ঘুরে গজুর চাকা,
সংসারটা চলে
গজাননের কলে,
মন জ্বলে দাবানলে
(গজুর) প্রাণ ঠাণ্ডা নগদ পেলে॥

মণিপুরের বিবরণ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ইতিহাস।

প্রাচীনকালে কাছাড়েশ্বর পূর্ব্ব ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে সম্রাট্ নামে অভিহিত হইতেন। সে সময় মণিপুর নিতান্ত অপরিচিত ছিল। কালে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের ভুজগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া আসিলে, ত্রিপুরেশ্বর মস্তকোত্তোলন করিলেন। আসামের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে, আরাকান, ব্রহ্মপুত্র (মেঘনা) হইতে, ঐরাবতীতীর তাঁহার "ধবল ছত্রের" ছায়ায় আচ্ছাদিত হইল। তৎকালে মণিপুর উপত্যকা টৈনবাং, খোমান, আঙম ও লোয়াং এই চারিটী স্বতন্ত্র জাতীয় রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আত্মকলহে ত্রিপুরার অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। করদ নৃপমণ্ডলী, সময় বুঝিয়া স্বাধীনতার স্বর্গীয় সুখ লাভে যত্নবান্ হইলেন। দীর্ঘকাল বিবাদের পর পূর্ব্বোক্ত চারিটি ক্ষুদ্র রাজ্য সম্মিলিত হইয়া পৃথক্ এক রাজ্য সংস্থাপিত হইল।* তাহারই প্রকৃত নাম "মিতাই লেইপাক"।† "ধর্ম্মপ্রচারক" অধিবাসীদিগের কৃপায় অনতিপ্রাচীন নাম মণিপুর হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যচতুষ্টয়ের সম্মিলনকাল, সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসরের অধিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

মণিপুরপতি ক্রমে সাংপো ১, কাপোই ২, কোবেং ৩, লুহুপ্পা ৪, চামবো ৫, খাইবো ৬ ও তাংখোল‡ ৭ প্রভৃতি উপত্যকার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় করিয়া মণিপুরের সীমা বিস্তার করিলেন। বিজিত রাজ্যের প্রজাদিগের সহিত উপত্যকাবাসীদিগের সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। উপত্যকা-

---

* বোধ হয় এই চারিটী রাজ্যের অধিবাসিগণ "কুকি" ও 'নাগা" জাতীয় ছিল। কাছার প্রদেশে প্রচলিত প্রবাদ অবলম্বন করিয়া এডগার সাহেব লিখিয়াছেন।—"There (*Maniporis*) origin is ascribed by tradition to the union of two powerful tribes, one *Naga* and the other *Kooki* which had for a long time contended for the fertile valley of Manipore—" (History and Statistics of the Diecca Divison. Page 331.)

† মিতাই, অর্থ মিশ্রজাতি, লেইপাক অর্থ ভূমি। ইহার যৌগিক অর্থ "মিতাই ভূমি" বা "মিতাই দেশ।"

‡ তাংখোল তিনভাগে বিভক্ত, যথা উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য তাংখোল। ইহাদের পরস্পর ভাষার প্রভেদ আছে। (See Jorn B. A. Society vol. VI page 1028.)

বাসিগণ "মিতাই" বলিয়া উক্ত হইয়াছে বিজিত পার্ব্বত্য মানবগণ "হাও"* নামে পরিচিত।

মণিপুরের পূর্ব্ব সীমা জামডুঙ্গ পর্ব্বত।† পশ্চিমে কাছাড়, উত্তর সীমা নাগা পর্ব্বত দক্ষিণসীমা লুসাই প্রদেশ। ইহার উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্য ১২৫ মাইল, পূর্ব্ব পশ্চিমে পরিসর ৯০ মাইল। পরিমাণ ফল ৭৫৮৪ বর্গ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ হইবে।‡

মণিপুরীয়গণ মধ্যমাকার, সবলশরীর সমরপ্রিয়, অহঙ্কারী ও পরজাতিবিদ্বেষী। কিন্তু বাহ্যাকৃতি দর্শনে ইহাদিগকে শান্তপ্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। উপত্যকাবাসী মিতাইগণ বাঙ্গালিদিগের ন্যায় গো মহিষ দি দ্বারা হাল চাস করে, পর্ব্বতবাসী হাওগণ অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় "জুম"¶ কৃষি। মণিপুরে ধান্য কলাই, মুগ, সোমারি, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সিগং ও নিংথং উপত্যকায় লবণ জন্মে। থাবাবোল ও টৈতাং নগরে রেসমের কারখানা আছে। মণিপুরীয়গণ প্রায়ই স্ব স্ব গৃহনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে। মিতাই মহিলাগণ শিল্পকার্য্যে বিলক্ষণ পটু §

---

* হাও অর্থ নাগা কুকি প্রভৃতি।

† নিংথি নদী মণিপুরের পূর্ব্বসীমা অবধারিত ছিল। কিন্তু "য়ান্দাবুর" সন্ধিতে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মরাজের মনস্তুষ্টি জন্য জামডুঙ্গ পর্ব্বত মণিপুরের পূর্ব্ব সীমা অবধারিত করিয়া দিয়াছেন এবং মণিপুরের এই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট মণিপুরপতিকে বার্ষিক ছয় সহস্র টাকা দান করিয়া থাকেন। See Aitchison's Treatees vol. I page 121.

‡ মণিপুরের পরিমাণ কোন কোন স্থলে ১২৬৩ বর্গ মাইল লিখিত আছে। এচিসন সাহেব মণিপুরের লোকসংখ্যা ৭৫৮৪০ লিখিয়াছেন। মণ্টগোমেরি মার্টিন সাহেব দুইটি মণিপুরের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি Munnipoor, ও অপরটী Monipoor লিখিয়াছেন। বোধ হয় একটি মিতাইভূমি বা মণিপুর উপত্যকা। অপরটী পার্ব্বত্যপ্রদেশ সম্মিলিত মণিপুর রাজ্য। মার্টিন সাহেব প্রথমোক্তটীর দৈর্ঘ্য ৪০ মাইল ও পরিসর ৩০ মাইল লিখিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে উপত্যকাটি এতাধিক বিস্তৃত হইবে না। See History, Antiquities, Topography and statistics of Eastern India by Montgomery Martin. Vol. III. page 640 and 664.

¶ জুম কৃষিকার্য্যপ্রণালী (রাজমালার) ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে বিস্তারিত বিবৃত হইয়াছে। (ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত ॥৶০, ৮০ পৃষ্ঠা) ১২৮১ বঙ্গাব্দের ৩য় সংখ্যক বঙ্গদর্শনে কবিবর বাবু নবীনচন্দ্র সেন "জুমিয়া জীবন" নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার শীর্ষভাগে জুমকৃষীর কার্য্যপ্রণালী লিখিত আছে।

§ আমাদের ঘরের লক্ষ্মীদের মত মিতাই মহিলাগণ পার উপর পা তুলিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদিগকে পতির সহিত ভাগাভাগিতে কাজ করিতে হয়। "আচার ব্যবহার" নামক প্রস্তাবে এই সকল বিষয় বিবৃত হইবে।

মণিপুরীয় গো, মহিষ আমাদের দেশীয় গো মহিষাপেক্ষা বড়। অশ্বগুলি খর্ব্বকায় সুশ্রী ও শ্রমসহিষ্ণু। হস্তী গুলিও সুন্দর বটে। তত্রত্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে গো, মহিষ, অশ্ব হস্তী ও গবয়ই* প্রধান। মিতাইগণ অশ্বারোহণ বিদ্যায় বিশেষ সুশিক্ষিত। ইহারা অশ্বের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত।†

ইমফাল তুরেল।‡ তিকি প্রভৃতি কতকগুলি নদী মণিপুরের উত্তর পূর্ব্ব দিক্স্থ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, উপত্যকার মধ্যদিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। ইবং বড়াক বা বড়চক্র ঐ পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া মণিপুরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইতেছে।

রাজকীয় ঘটনা

মণিপুরীয়গণ বলে,—"গুরুসিদাবা" দেব মানবের অধিপতি। তিনি মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহার পত্নী "লেইমরেন সিদাবী।" তাঁহাদের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ "সানামাহি" কনিষ্ঠ "পাখংবা"। পাখংবা নাগকুলের ঈশ্বর। কনিষ্ঠ পুত্র পিতার পরম স্নেহভাজন ছিলেন। এই জন্য গুরু সিদাবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতিক্রম করিয়া তাহার হস্তে মিতাই ভূমির আধিপত্য সমর্পণ করেন।

পাখংবার উত্তর পুরুষ চেরাইবংবা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মণিপুর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে "সামজুক"¶ রাজ মিতাই দেশ আক্রমণ করেন। চেরাইবংবা ও তাঁহার পুত্রের বাহুবলে আক্রমণকারী পরাভূত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধবৃত্তান্ত মণিপুরীয়গণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই গ্রন্থের নাম "সামজুক-

---

* গবয়, গো ও মহিষের সাদৃশ্য বিশিষ্ট জন্তু; চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কাছার, ও মণিপুর পার্ব্বত্যপ্রদেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। যুবরাজ "প্রিন্স অব ওয়েলস" কে ত্রিপুরার মহারাজ একটী গবয়বৎস উপহার দিয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি "জুলজিকেল গার্ডনে" আছে।

† এডগার সাহেব লিখিয়াছেন। যে মণিপুরীয়গণ অশ্বক্রয়ের জন্য সময়ে সময়ে প্রাণপ্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকেও বিক্রয় করিয়া থাকে। (See History and statisties of Dacca Division page 331) অশ্বক্রয়ের জন্য স্ত্রী বিক্রয় সম্বন্ধে আমরা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী বিক্রয় বন্ধক ও দান করার প্রথা প্রচলিত আছে। "আচার ব্যবহার" প্রস্তাবে এই সকল বিশদরূপে লিখিত হইবে।

‡ ইমফালতুরেলকে বৈদেশিকগণ "মণিপুর নদী" বলেন। ইহার তীরে রাজধানী "মণিপুর" নগর অবস্থিত। কোন কোন ইংরেজি লেখক এই নদীকে "Nankatha khyaung River" লিখিয়াছেন।

¶ সামজুক রাজ্য মণিপুরের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। অধুনা ইহা ব্রহ্মরাজের অধীন।

ঙাম্বা' * অর্থাৎ সামজুক বিজয়। এই হস্তলিখিত গ্রন্থ ৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে চেরাইরংবা জীবনলীলা সংবরণ করিলে তস্য পুত্র "পামহেইবা" রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মণিপুরীগণ সচরাচর পামহেইবাকে "গরিব-নওয়াজ" বা "করি-করিম-নওয়াজ" বলিয়া থাকে। গরিব-নওয়াজ ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সমসাময়িক। ত্রিপুরার সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার জন্য যে সকল সৈন্য ছিল, গরিব নওয়াজ তাহাদিগের সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।† ঘোরতর সংগ্রামে ত্রিপুর সৈন্যজয় করিয়া, গরিব-নওয়াজ "তাখেল্ঙাম্বা" বা ত্রিপুরাজয়ী উপাধি ধারণ করিলেন। কতিপয় ত্রিপুরসৈন্য পরাজয় করিয়া মণিপুরীয়দিগের যে গর্ব্ব হইয়াছিল ১৬০¶ বৎসর অতীত হইল অদ্যাপি তাহাদিগের সেই অভিমান অন্তরিত হয় নাই। স্বজাতীয় বীরত্বের চিহ্ন প্রদর্শন করিতে হইলেই তাহারা "তাখেলঙাম্বার" নাম উল্লেখ করে। এই সামরিক ঘটনাগুলি একখণ্ড পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। তাখেল্ঙাম্বা গ্রন্থ ৯০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

তাংখোল প্রভৃতি ৭টী ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই ত্রিপুরার অধীন ছিল। এই যুদ্ধ দ্বারা সে সকল মণিপুরের কুক্ষিগত হইয়াছে। গরিব নওয়াজ ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করিয়া কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিজিত অংশে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই।§ গরিব নওয়াজের তিন পুত্র ছিল। সামসাই, উগত সাই, ও চিংতোমখোম্বা বা ভাগ্যচন্দ্র। মধ্যম উগত পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়া মণিপুর সর্পাসন অধিকার করেন। ভাগ্যচন্দ্র, দুর্দ্দান্ত

* মণিপুরীয় শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় লেখা নিতান্ত কষ্টকর।

† ধর্ম্মমাণিক নিতান্ত দুর্ভাগ্য ছিলেন। যবন দিগের ক্রমাগত পঁচ বৎসর চেষ্টার পর, তাঁহার রাজ্যশাসনসময়ে, মুসলমান সাম্রাজ্য ফেণী নদীর তীর পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

‡ বোধ হয় এ সংগ্রামে কবিচন্দ্র ঘোষ ত্রিপুর সেনানায়ক ছিলেন।

¶ কবিচন্দ্রের মণিপুর গমনকাল প্রথম প্রস্তাবে ১৬০ বৎসর নির্ণয় করা হইয়াছে। এস্থলে সেই সূত্রে ১৬০ বৎসর লেখা হয় নাই। ১৭১৪ হইতে ১৮৭৮ খৃঃঅব্দে গণনা দ্বারা ১৬০ বৎসর পাওয়া গিয়াছে।

§ আবুল ফজলের মতানুসরণ করিয়া মণ্টগোমেরি মার্টিন সাহেব কামরূপ সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা "মহা চীন" বা পিণ্ড সাম্রাজ্য অবধারিত করিয়াছেন। বোধ হয় এ সময়েও আবা প্রদেশ পিণ্ড সম্রাজ্যের অধীন ছিল। কারণ তখনও পিণ্ড রাজ বংশের ধ্বংসকারী বর্ত্তমান ব্রহ্মরাজ্যের স্থাপয়িতা প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর আলমপ্রা রঙ্গভূমে আত্ম প্রকাশ করেন নাই।

অগ্রজের ভয়ে মণিপুর পরিত্যাগ করিয়া "তুমু"* রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উগত অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ছিলেন। তাঁহার উৎপীড়নে প্রজাগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ভাগ্যচন্দ্র প্রজাবর্গের মানসিক ভাব অবগত হইয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। স্বীয় সৈনিকবর্গ দ্বারা অবাধ্য প্রজাবর্গকে দমন করিতে না পারিয়া, অগত্যা উগতকে মণিপুর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইল। ইত্যবসরে নাগবংশাবতংস যশস্বী ভাগ্যচন্দ্র নাগাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

ভাগ্যচন্দ্রের অমিত যত্নে মিতাইগণ এক্ষণে হিন্দুশ্রেণীতে আসন অধিকার করিয়াছে। তাঁহারই অসাধারণ অধ্যবসায়ে মিতাইগণ সজীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিতাইদিগের সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ তাঁহারই সময়ে লিখিত। ভাগ্যচন্দ্র শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিনি প্রায় দেবারাধনায় জীবনযাপন করিয়াছেন। এই জন্যই মণিপুরে প্রথমে রাসক্রীড়া† সৃষ্টি করেন। একমাত্র তাঁহার দ্বারাই মণিপুরের আভ্যন্তরিক যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ভাগ্যচন্দ্রের দুই পুত্র ছিল। গুরুশ্যাম ও জয়সিংহ। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ গুরুশ্যাম রাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি নামে রাজা ছিলেন মাত্র। জয়সিংহই রাজ্যশাসন করিতেন। আবা রাজ বারম্বার মণিপুর আক্রমণ করিতেছিলেন। জয়সিংহ তাহাকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া সাহায্যান্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি চট্টগ্রামস্থ পার্ব্বত্যনরাধিপদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, সরদারবর্গের অনুরোধে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর জয়সিংহের সহিত কোম্পানিবাহাদুরের সন্ধিবন্ধন হইল‡। চট্টগ্রাম হইতে ভারলেষ্ট সাহেব ৩৭৫ জন পদাতিসৈন্যের সহিত পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া কাছাড়ের তদানীন্তন রাজধানী খশপুরে উপনীত হইলেন। সে সময় পর্ব্বতপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া মণিপুর গমন করা নিতান্ত ক্লেশকর ছিল বলিয়াই ইংরেজসৈন্য আপাততঃ খশপুরেই বিশ্রাম করিতে লাগিল। এমত সময় পশ্চিমবঙ্গে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কালবশে আলিজা মিরকাসেমের সৌভাগ্যসূর্য্য ক্রমে অস্তগত হইতে চলিল। কলিকাতার কৌন্সেল

* তুমুরাজ্য মানসুকের ভোর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

† রাসক্রীড়ার মনোহর চিত্রটী আমরা প্রস্তাবান্তরে পাঠকবর্গকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।

‡ Aitchison's Treaties vol 1 page 121.

ভাবলেষ্টকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলে; তিনি অগত্যা জয়সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা করিলেন।*

জয়সিংহ স্বদেশে উপনীত হইলে, গুরুস্যাম ভ্রাতৃ উপদেশানুসারে ইংরেজদিগের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পূর্ব্বোক্ত সন্ধিপত্রে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

ভ্রাতৃবিয়োগের পর জয়সিংহ প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজ্যশাসন করেন। তাঁহার সাত পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রগণ মধ্যে মধুচন্দ্র, চৌরজিৎ, মারজিৎ ও গম্ভীর সিংহই বিখ্যাত। জয়সিংহ স্বীয় দুহিতাকে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ রাজধর মাণিক্যের করে সমর্পণ করেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মধুচন্দ্র পৈতৃকাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি ভ্রাতৃবর্গের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অনুজদ্বয় চৌরজিৎ ও মারজিৎ তাঁহাকে সমরাঙ্গনে আহ্বান করিলেন। মারজিতের বাহুবলে মধুচন্দ্র সমরক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইলেন। ভ্রাতৃবর্গমধ্যে মারজিৎই প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধান্তে ভোক্ত ধার্ম্মিক চৌরজিৎ অনুজ মারজিতের সহিত এই মর্ম্মে বন্দোবস্ত করিলেন যে, তিনি দুই বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া, মারজিতের হস্তে সিংহাসন সমর্পণ করত, চিরকালের তরে তীর্থবাসী হইবেন।

মধুচন্দ্র, কাছাররাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কাছারপতি বিপদাপন্নের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। পঞ্চ শত যোদ্ধা সমরাভরণে সজ্জিত

* History and statistics of Dacca Divison

† কাছারের রাজবংশ মণিপুরের রাজবংশের ন্যায় অভিনব নহে। ইহা অতি প্রাচীন। সাধারণের এরূপ সংস্কার যে দ্বিতীয় পাণ্ডব বৃকোদরের পত্নী রক্ষরাজ হিড়িম্বের সহোদরা হিড়িম্বা, কাছার রাজকুলের আদি মাতা। এই উক্তি সমর্থনোপযোগিনী একটি বংশাবলীও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি, এই বংশাবলী ১৭৯০ খৃঃ অব্দে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া তৎপ্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন। আমরা এতদুভয়ের কোন একটী মত পোষণ করিতে পারি না। প্রায় সার্দ্ধ চারি শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ "রাজমালা" বলিয়া গিয়াছেন যে "ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দৌহিত্র স্বত্বে (কাছার) হেরম্বরাজের সিংহাসন অধিকার করেন। ত্রিলোচনের দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণ পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হন।" কাছারের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের পর, যে মহাত্মার হস্তে সেই রাজ্যের শাসন ভার (History and statistics of Dacca Divisou p. 335) সমর্পিত হয়, তিনি (কাপ্তান ফিসর লিখিয়া গিয়াছেন) প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইল আসাম,

হইল। মধুচন্দ্র কাছাড়রাজের সৈন্য লইয়া ভ্রাতৃবর্গের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। রণকামুক মিতাই জাতি কাছার সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা শ্রবণে, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মধুচন্দ্র মণিপুরের সীমান্তপ্রদেশে উপনীত হইলে, সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘ কালের পর এই প্রবল হুতাশন মধুচন্দ্রের রুধিরপ্রবাহে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

তিন বৎসর পর মারজিৎ অগ্রজকে আত্মপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। চতুর চূড়ামণি চৌরজিতের স্মৃতি বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গেল। অধিকন্তু মারজিতের প্রাণবধের চক্রান্ত হইতে লাগিল। এই দারুণ সংবাদ অবগত হইয়া মারজিৎ একমাত্র অশ্বারোহণে কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গোপনে কাছাড় যাত্রা করিলেন।*

কাছাড়রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র মারজিতের মনোহর অশ্ব দর্শনে লোভাক্রান্ত হইলেন। ইচ্ছানুরূপ মূল্য লইয়া অশ্ব বিক্রয়ের জন্য মারজিৎকে অনুরোধ করা হইল। মিতাই রাজনন্দন প্রাণপ্রিয়তর অশ্বের জন্য সহস্র সহস্র সুবর্ণ তুচ্ছজ্ঞান করিলে, গোবিন্দচন্দ্র সেই অশ্ব বলক্রমে গ্রহণ করিলেন।

রঙ্গপুর, কাছাড় ও ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশ সকল দীর্ঘকালাবধি শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার রাজধানী কামরূপে অবস্থিত ছিল। কুচরাজগণ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরকে রাজচ্যুত করেন। সিংহাসনচ্যুত নৃপতির জ্যেষ্ঠপুত্র কাছাড়ে স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপন করিলে, সেই রাজার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্রজের ন্যায় ত্রিপুরা রাজ্য স্থাপন করেন। গোবিন্দ চন্দ্রের মৃত্যুতে (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে) কাছাড়ের সেই প্রাচীন বংশের লোপ হইয়াছে। কনিষ্ঠের উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ ষোড়শ সিংহ ধৃত আসনে উপবেশন করিতেছেন। এই উভয় মত দ্বারাই কাছাড় রাজবংশের প্রাচীনত্ব অবধারিত হইতেছে। কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটি কমিসনর এডগার সাহেব এই সকল প্রাচীনতত্ত্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, "হৃদ্ধীব নিভা নারায়ণ কাছাড় রাজবংশের স্থাপয়িতা। তিনি খ্রীষ্টাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। তাঁহার উত্তর পুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্র ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। হরিশ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর ৩৭ বৎসর রাজ্য শাসনের পর দেহ ত্যাগ করিলে, গোবিন্দচন্দ্র ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রাতৃ-উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। এডগার সাহেব কোন প্রকার বিশেষ প্রমাণ দ্বারা স্বীয় উক্তি সমর্থন করেন নাই। তিনি স্বেচ্ছাচারিতা সহিত লেখনী সঞ্চালিত করিয়াছেন। এডগার সাহেবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার এ উপযুক্ত স্থান নহে। যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে পতিত না হই, তবে সময়ান্তরে পাঠকবর্গকে কাছাড়ের চিত্রপট উপহার দিয়া পরিতোষ লাভ করিব। কিন্তু চিররুগ্ন ব্যক্তির আশা দুরাশা।

* মণিপুরীয়গণ বলে, চৌরজিৎ অসিযুদ্ধে সুশিক্ষিত ছিলেন। মারজিৎ অশ্বারোহণে সংগ্রামক্ষেত্রে অলোকসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার অশ্বের ন্যায় সুশ্রী ও সমরকুশল অশ্ব কস্মিনকালে মণিপুরে জন্মে নাই বলিয়া প্রবাদ আছে। সর্ব্বকনিষ্ঠ গম্ভীর সিংহ ভগদত্তের ন্যায় হস্ত্যারোহণে যুদ্ধ করিতেন।

হৃতসর্ব্বস্ব মারজিৎ আশ্রয়দাতা কর্ত্তৃক মর্ম্মপীড়িত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

বহুকষ্টে নগনদী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মারজিৎ আবা রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তিনি ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন। শ্বেতগজাধীশ বিপন্নকে মণিপুর রাজাসনে অভিষিক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মারজিৎও প্রতিশ্রুত হইলেন যে "ব্রহ্মের ভুজবলে মণিপুর রাজাসন তদধিকৃত হইলে, তিনি স্বয়ং আবার উপস্থিত হইয়া রাজন্য বর্গ পূজিত ব্রহ্মরাজের রাজাসন সমক্ষে মস্তক অবনত করিবেন।"

মারজিৎ বৃহৎ একদল ব্রহ্ম সৈন্য লইয়া ভ্রাতৃবিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। চৌরজিৎও গম্ভীরসিংহ স্বজাতীয় সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। তুমুল সংগ্রামের পর মিতাইদিগকে ব্রহ্ম সৈন্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। চৌরজিৎ ও গম্ভীর সিংহ কাছার ও ত্রিপুরায় পলায়ন করিলেন। মারজিৎ মিতাই রাজাসন অধিকার করিয়া ভ্রাতৃসুহৃদ্বর্গের প্রাণদণ্ড করেন। রাজ্যচ্যুত নৃপতি চৌরজিৎ ত্রিপুরার তদানীন্তন যুবরাজ কাশীচন্দ্রের হস্তে কন্যা (কুটিলাক্ষা) সমর্পণ করিয়া ত্রিপুরার সহিত প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইলেন।

মারজিৎ পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অপহারী পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের রাজাসনে বিরাজ করিতেছেন। প্রতিহিংসাবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইল। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কাছার ধ্বংস করিতে চলিলেন।*

মারজিৎ কাছারে প্রবেশ করিয়া রাক্ষসবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। রাজধানী কশপুর ভস্মীভূত হইল। গোবিন্দ চন্দ্র শ্রীহট্টে পলায়ন করিলেন। নররুধিরে কাছার প্লাবিত হইল। পথে, ঘাটে, মাঠে মাংসজীবী পশুপক্ষী সকল শব লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। গ্রাম নগরে আবাল বৃদ্ধের রোদনধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত হইল। কাছার ধ্বংস করিয়া মারজিৎ "মৈয়াঙাম্বা" বা কাছারবিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিলেন।

রাক্ষসবৃত্তি মারজিতের প্রায়শ্চিত্তের সময় শীঘ্রই উপস্থিত হইল। ব্রহ্মরাজ তাঁহাকে আত্মপ্রতিশ্রুতি পালন জন্য আহ্বান করিলেন।

"কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি।" বোধ হয় এ সংসারে অধিকাংশ লোক এই জঘন্য প্রকৃতির। মারজিৎও তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি আবারাজকে লিখিলেন "যদি ব্রহ্মরাজ উভয় রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী কোন একটি স্থান

* মণিপুরীয়গণ বলেন শিশু বৃদ্ধ ব্যতীত মণিপুরীয় পুরুষ মাত্রই মারজিতের মরণাস্ত্রে সহগমন করিয়াছিল।

নির্দ্দেশ করিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন, তবে মণিপুরেশ্বরও সেস্থানে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন।" ব্রহ্মরাজ, মারজিতের পত্র পাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু পুনর্ব্বার শান্তভাব অবলম্বন করিয়া লিখিলেন, "রাজা মারজিৎ আত্মপ্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে প্রস্তুত হউন, নচেৎ মণিপুর উপত্যকা নররুধিরে রঞ্জিত হইবে।" অহঙ্কারী মণিপুরীয়দিগের অহঙ্কার খর্ব্ব হইল না। আবাদূত অপমানিত হইয়া ব্রহ্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, বসুন্ধরা নররুধিরের জন্য লালায়িত হইলেন।

আবাসৈন্য দলে দলে মিতাইদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। মিতাইগণ শত্রু সৈন্যের গতিরোধ করিতে অগ্রগামী হইল। নিংথি নদীতীরে প্রথম সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে মিতাই অশ্বারোহিগণ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু "বন্দুক" ও "কামান" দ্বারা ব্রহ্মগণ তাহাদিগকে পরাভূত করে। নিংথি তীরে মিতাইগণ পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলে, আবা সৈন্য উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত মিতাইগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। পরে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইল। রাজাও পলায়ন করিলেন।* আবা সৈন্যগণ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহী সিপাহিদিগের ন্যায় শিশু, বৃদ্ধ ও রমণীর প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল। যুবতীদিগকে সানন্দ চিত্তে বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল। গ্রাম ও নগর সকল পুড়াইয়া ছারখার করিল। জীবসঙ্কুল শস্যশালিনী উপত্যকা মরুভূমিতে পরিণত হইল।

মারজিৎ কাছারে আসিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে আহ্বান করেন। চৌরজিৎ ও গম্ভীর সিংহ ভ্রাতৃসমক্ষে উপনীত হইলে মারজিৎ তাঁহাদিগকে বিজিত রাজ্যের (কাছার) এক একটি অংশ দান করিলেন, সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিপদে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কাছাররাজ গোবিন্দচন্দ্র সিংহাসন-

---

* হাওগণ তখন মিতাইদিগকে বলিয়াছিল।

চুয়া চন্দন পংতেই তেই,
অতুয়া না তালা পংচেন চেন।"

অর্থ। তোমরা চুয়া চন্দন দ্বারা শরীর ভূষিত করিয়া জাঁকজমক কর এবং আপনাকে আপনি অলোকসামান্য যোদ্ধা বলিয়া জ্ঞান কর। কিন্তু আবাদিগকে দর্শন করিলে তোমাদের আতঙ্ক হয়। আত্মরক্ষার জন্য দিক্ বিদিক্ জ্ঞান না করিয়াই দৌড়িতে থাক। এই সময় মণিপুরীয়গণ স্বদেশ ছাড়িয়া কাছার শ্রীহট্ট, ও ত্রিপুরায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ঔপনিবেশিক মণিপুরীয় সংখ্যা, কাছার ১১০০০০, শ্রীহট্ট ৩০০০০ ত্রিপুরা ১৫০০০। অল্পকাল মধ্য ঢাকায়ও কতকগুলি মণিপুরীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

চ্যুত হইয়া ইংরেজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, কিন্তু সে সময় কোম্পানি বাহাদুর অমিত পরাক্রম মহারাষ্ট্রীয় ও পিণ্ডারিদিগের সহিত বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বাক্যে কেহ কর্ণপাত করিলেন না। উপায়হীন গোবিন্দচন্দ্র অবশেষে আবারাজসদনে সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। আবাগণ সে সময় মণিপুর গ্রাস করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। পররাজ্য গ্রাসের আর একটী সুন্দর উপায়দ্বার উদ্ঘাটিত দর্শনে তাহাদের আলস্য অন্তর্হিত হইল। আবাদিগের রাজ্যকামুকতায় অচিরাৎ—কাছার সমরানলে প্রজ্জলিত হইল। মারজিৎ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে এই বিষমাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কোনও ফল দর্শিল না। অবশেষে মণিপুরীয়দিগের রুধিরপ্রবাহে সমরানল নির্ব্বাপিত ও কাছার প্রদেশ আবারাজের কুক্ষিগত হইল। গোবিন্দচন্দ্র পুনর্ব্বার ইংরেজদিগের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। তখন নিতাই রাজকেও গোবিন্দ চন্দ্রের মতানুসরণ করিতে হইল।

ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আবাদিগের দমনার্থ ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ লর্ড আমহার্ষ্ট সাহেব যুদ্ধঘোষণা করিলেন।* প্রায় দুই বৎসরাবধি এই সংগ্রাম চলিয়াছিল। সেই লোমহর্ষণ ঘটনার রুধির রঞ্জিত যবনিকা অর্দ্ধ উত্তোলন করা অসঙ্গত বোধে আমরা আবার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ভার্গববিজয়†।

সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ, আমাদের 'আদর্শ' বাঙ্গালি সমালোচক বাবু দ্বিবিধ সমালোচনা শিখিয়া রাখিয়াছেন। যে কোন গ্রন্থ হাতে পড়ুক না কেন, এই দুইয়ের অন্যতর অবলম্বিত হইয়া থাকে। এক প্রকার সমালোচনা এই রূপ,—"এই গ্রন্থ ভাল, খুব ভাল, অতি ভাল; এমন গ্রন্থ হয় না, হইবার নয়।" আর

* রেভারেণ্ড গ্রিগ বলেন,—১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই ইংরাজ সেনানী কর্ণেল ব্রাউন, শ্রীহট্টের সীমান্তপ্রদেশে আবা সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, গবর্ণর জেনারেল যুদ্ধঘোষণা করেন। (British Empire in India vol iv page 112.) কিন্তু মার্সমেন প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে ঐ তারিখের পূর্ব্বেই যুদ্ধঘোষণা হইয়াছিল।

† ভার্গববিজয় কাব্য। শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

এক প্রকারের সমালোচনা—"গ্রন্থ মন্দ, অতি মন্দ, যার পর নাই মন্দ, ইহার ভিতরে কেবল মাথা আর মুণ্ডছাই আর ভস্ম।" ফল কথা, ইহা এক প্রকার স্থির, যে যাহাকে ভাল বলিতে হইবে, তাহাকে আকাশে তুলিতে হইবে, যাহাকে মন্দ বলিতে হইবে তাহাকে দুই পায়ে দলিতে হইবে। নিয়ম এই, হয় স্তুতি কর নয় নিন্দা কর—সমালোচনা একেবারেই করিও না।

এ কথার সমর্থনার্থ দৃষ্টান্ত খুঁজিতে অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। এই "ভার্গববিজয়" কাব্যের কতকগুলি সমালোচনা মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। যে প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা 'প্যারাডাইস লষ্ট' অথবা "ডিভাইনা কমেডিয়া" সম্বন্ধে করিতে গেলেও একটা কিছু রাখিয়া করিতে হয়। এক জন লিখিয়াছেন,—"যে পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছি তাহাতেই বলিতে পারি যে, পুস্তক খানি অতি উৎকৃষ্ট; ইহাতে রস-ভাব রীতি-গুণ আদি যথাস্থানে যথাসময়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" যে পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন তাহাতেই এই, শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে না জানি কি বলিতেন। আমরা নির্লজ্জ হইয়া জিজ্ঞাসা করি, যদি রস, ভাব, রীতি, গুণ, আবার আদি, যথাস্থানে এবং যথাসময়ে সন্নিবেশিত হইল, তবে আর বাকীই থাকিল কি? বাল্মীকি অথবা ব্যাসে, বর্জ্জিল অথবা মিল্টনে, গেটে অথবা শেক্ষপীয়রে, ইহার অধিক আর কিছু আছে কি?

আবার কতকগুলি সংবাদপত্রে এই পুস্তকের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহা দেখিয়াও আমরা অবাক্ হইয়াছি। সে কেবল খাঁটি নির্জ্জলা নিন্দা। তার সার মর্ম্ম এই যে, গ্রন্থখানি কিছুই নহে—বড় অধম, এবং গ্রন্থকার বাতুল। লিউইস সাহেব তাঁহার 'দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের' এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, কোমতকে নূতন নূতন মত সকল প্রচার করিতে দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে বাতুল স্থির করিয়াছিল, কিন্তু 'প্রামাণিক দর্শন' যদি বাতুলতার ফল হয়, তাহা হইলে আমাদের কামনা, বাতুলতার এপিডেমিক হউক। এতটা গৌরবের সঙ্গে না হউক, কিন্তু তবু আমরা বলিতে পারি যে, ভার্গববিজয় যদি বাতুলতার ফল হয়, তাহা হইলে আমরা কায়মনোবাক্যে কামনা করি—বাঙ্গালার কাব্যলেখকদিগের পালের মধ্যে বাতুলতার এপিডেমিক হউক। অধিকাংশ বাঙ্গালা কাব্য অপেক্ষা ইহা ভাল।

কিন্তু এ কথায় কিছুই প্রশংসা হইল না। জলধরের অপেক্ষা সুন্দর বলিলে কিছু সৌন্দর্য্যের প্রশংসা হয় না। বিদ্যাদিগ্‌গজ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বলিলে কিছু বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হয় না। অধিকাংশ বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ এত জঘন্য, যে তাহার অপেক্ষা ভাল বলিলে কো

নই প্রশংসা হয় না। সেই জন্য একটু বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন।

ভার্গববিজয় গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে কোন পরিচয় দিবার আবশ্যক রাখে না। কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাসের প্রসাদে, কথক ও গায়কের প্রসাদে, যাত্রাওয়ালা ও নাটকলেখকদিগের দৌরাত্ম্যে, মহাভারত ও রামায়ণের কথা কিছু কিছু না জানে এমন লোক বঙ্গদেশে বিরল। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরশুরামের পরাভব, এ গ্রন্থের বিষয়। জিনিসটা কি, সকলেই বুঝিয়াছেন।

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে বিষয়টা গুরুতর বটে। এ মহাকাব্যের যাহারা লিপ্ত তাহারা সকলেই মহৎ—আকাশের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গম্ভীর, বায়ুর ন্যায় দার, হিমালয়ের ন্যায় স্থির। নায়ক, সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম—দেবতার ভয় দূর করিতে, পৃথিবীর ভার লঘু করিতে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন। নায়িকা, ধরাযোনিসম্ভবা সীতা—যিনি স্ত্রীবিহিত গুণে রমণীকুলের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। প্রতিনায়ক, ভার্গব পরশুরাম—যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়শোণিতে "সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্ হ্রদান।" লোকসমাবেশ অতি উচ্চ অঙ্গের বটে। বিষয় মনোনীত করা নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

খুব ভালও হয় নাই। পরশুরাম বীর, রামচন্দ্র বীর, লক্ষ্মণ বীর, দশরথও বীর, বিশ্বামিত্র ঋষি বশিষ্ঠ ঋষি, পরশুরামও ঋষি,—এতগুলা একপ্রকারের লোক একত্র কাব্যক্ষেত্রে আনিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য রক্ষা করা অতি দুরূহ ব্যাপার—সকলে পারে না। আবার রচনা এবং অল্পকথা এমন সংক্ষেপ, যে ইহা লইয়া সার্দ্ধ তিনশত পৃষ্ঠারও অধিক একখানি গ্রন্থ লেখা হয় না—অন্ততঃ সকলে পারে না। তবে কি না, কবি আপন কল্পনাসম্ভূত অনেক নূতন চিত্র দিতে পারেন, অনেক নূতন সৃষ্টি সমাবেশিত করিতে পারেন—ইহাও সকলে পারে না। ভার্গববিজয়ের শেষে গোপাল বাবু পরিচয় দিয়াছেন যে, তিনি অতি অল্পবয়স্ক—অল্প বয়সে, প্রথম উদ্যমে, এই অ[illegible]র, অপার-সাগরে ঝাঁপ দেওয়া ভাল হয় নাই।

এখন গ্রন্থের পরিচয়। প্রথম সর্গে বড় কিছু নাই—বাজে কথায় পরিপূর্ণ, কাজের কথা দেখিলাম না। তবে শেষভাগে কবি বলিয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ স্থল হইতে তিনি রত্নসংগ্রহ করিবেন,—

"হে বাল্মীকে, কালিদাস, কীর্ত্তিবাস,
মধো,
তোমাদের কোষ হতে হে রাজেন্দ্রগণ,
লইবে————ইত্যাদি।"

কোষগুলি যে বহুরত্নপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সকল কোষ হইতে রত্নসংগ্রহ করিয়া অভিনব কাব্য-

ভূষণ নির্ম্মাণ করিলে কতদূর মহামূল্য হয়, তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে—হয় ত খাটে না—প্রায়ই মিলে না। ভার্গববিজয় হইতেই ইহার প্রমাণ দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় সর্গে ভার্গবের আশ্রম বর্ণনা। হিমাচলের এক নির্ঝরিণীতীরে ভার্গবের আশ্রম বিরাজিত। তথায় দেবদারু তরুব্রজ অম্বরস্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইঙ্গুদী, খদির, তীব্রগন্ধ তেজপত্র, লবঙ্গবল্লরী, এলালতাবীথি, দারুচিনি, চিত্রিত বিগ্রহ ভূর্জ্জপত্র, শাল, তাল, তমাল, পিয়াল, যাহা হইতে

মঞ্জুল-মঞ্জরী-রজো-রাশি নভোমার্গ
আনন আবরি উড়ে চন্দ্রাতপনিভ,

পীযূষ পূরিত দ্রাক্ষা, কম সোমলতা, অদূরে শ্যামাভ নীবার ধান্যভূমি,—অশোক, কিংশুক, বকুল, কর্ণিকার প্রভৃতি নানা বৃক্ষে, নানা ফলে, নানা লতায়, নানা ফুলে এই স্থান পরিশোভিত। মলয়ানিল মৃদুল বহিতেছে, পরাগরাশি উড়াইতেছে, লতাপাদপ আন্দোলিতেছে। তথায় কস্তুরী কুরঙ্গ আশ্রম পাদপে গাত্র কণ্ডু নাশ করিতেছে—মৃগমদগন্ধে তপোবনস্থলী আমোদিত করিতেছে। মৃগযূথ অভিনবতম শষ্প-প্ররোহতলে বিশ্রাম করিতেছে; শাবকগণ মেষশিশুর সঙ্গে খেলা করিতেছে। দূরস্থ কন্দরশায়ী সিংহগর্জ্জন শুনিয়া বৃষভ গবয় প্রভৃতি বসুধাতল ক্ষুরাগ্রে বিদীর্ণ করিয়া সদর্পে নাদিতেছে। অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষচ্ছায়ায় হস্তিযূথ আষাঢ়দিগন্তব্যাপী নবমেঘের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং

———করেণু নিবহ
কমল-পরাগ গন্ধি সলিল ছড়ায়ে
দিতেছে প্রণয়ে স্বীয় স্বীয় প্রিয়তমে।

মন্দ নহে, কিন্তু এ সুন্দর চিত্রটী কালিদাসের,গোপাল বাবুর নহে—কুমারসম্ভব হইতে অনুবাদিত।

এই তপোবনে ভগবান্ ভৃগুকুলপতি তপস্যা করিতেছেন—সারঙ্গকীর্ত্তি-আসনে আসীন, বল্কল-পিহিত, আশীর্ষ উন্নত দেহ, অর্দ্ধনিমীলিত স্থির লোচনযুগলে অপূর্ব্ব দ্যুতি, করযুগ নাভীর উদ্ধে বদ্ধ, গলে অক্ষমালা এবং যজ্ঞোপবীত, ললাটফলকে ঊর্দ্ধ-পৌণ্ড্রকেয় লেখা, শরীর শ্বেত চন্দনচর্চ্চিত, মৌলী উপরে জটাজাল বিনিবদ্ধ, বদনমণ্ডল শ্মশ্রুরাজিবিশোভিত—

দেবগৃহ-স্তম্ভ গাত্রে ঝুলিয়া বিরলে
যেমতি চামর-রাজি বিকাশে শুক্লিমা।

উপমাটি অতি সুন্দর এবং সম্পূর্ণরূপে বিষয়োপযোগী। আমরা পাঠকগণকে এই সর্গ পাঠ করিতে অনুরোধ করি—সময় বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া বোধ হইবে না। যদিও ইহা কালিদাসের অনুকরণে রচিত, তবু গ্রন্থকার প্রশংসা পাইতে পারেন এমন অনেক জিনিষ ইহাতে আছে।

তৃতীয় সর্গেও প্রসঙ্গাধীন কথা কিছু নাই—আগা গোড়া কেবল প্রাতঃকালের বর্ণনা।

চতুর্থ সর্গে রাজা দশরথের পুত্র-স্বজনাদির সহিত অযোধ্যা-বর্ত্মে সোৎসব গমন। দশরথ মহা সমারোহে চলিয়াছেন, দেবগণ তাহা দেখিতে আসিয়াছেন। ইহার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে—

——————নীরদ [illegible]

সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত-[illegible]—[illegible],
দামিনী [illegible]

বিনা [illegible] —[illegible] যে [illegible] থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

পঞ্চম সর্গে পরশুরামের আগমন। মহারাজ দশরথ ধ্বনি মত্ত ঘটিতে দেখিয়া বশিষ্ঠকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, কোন চিন্তা নাই, যদি কোন অশিব ঘটনার সম্ভাবনা থাকে, তাহা আমি স্বস্ত্যয়নে নিবারণ করিব।

হেনকালে রুদ্রমূর্ত্তি পরশুরাম দেখা দিলেন। সকলে স্তম্ভিত হইল। সকলেই বুঝিল যে এ অশিব স্বস্ত্যয়নে যাইবার নহে। ক্ষত্রিয়ঘাতীটা না জানি কি আছে বলিয়া সকলেই প্রমাদ গণিল। ষষ্ঠ সর্গে পরশুরাম গালিগালাজ আরম্ভ করিলেন—রাজা দশরথকে, রামচন্দ্রকে, সৈন্যগণকে, প্রাণ ভরিয়া গালি দিলেন। লক্ষ্মণকে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই, এ কি? লক্ষ্মণ বলিলেন, সীতার সঙ্গে উহার বিবাহের কথা ছিল, তাহাতে বঞ্চিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ চটিয়াছে।

সপ্তম সর্গে আবার পরশুরামের গালি গালাজ এবং আত্মশ্লাঘা। দশরথের স্তুতি, রামচন্দ্রের বিনতি—পরশুরামের কেবল কটূক্তি।

অষ্টম সর্গে লক্ষ্মণের ক্রোধ এবং ভার্গবকে ভর্ৎসনা। ভার্গব অপমানিত হইয়া মহাক্রোধে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া ধনুতে শরযোজনা করিলেন। এমন সময় বিশ্বামিত্র আসিয়া তাঁহাকে [illegible] শান্ত করিলেন। তবু সম্পূর্ণ শান্ত হইলেন না। আর সকলকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু রামের সম্বন্ধে বলিলেন যে, আমার এই ধনুঃ ভঙ্গ করুক, নতুবা উহার রক্ষা নাই।

তার পর নবম সর্গে আরও কিছু কটূক্তির পর স্বহস্তস্থিত দুর্জ্জয় ধনুঃ পরশুরাম রামের হাতে দিলেন। এ দিকে সীতার বড় ভয় উপস্থিত হইল—একবার ভার্গব একখানা ধনু আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া তাঁহার সঙ্গে রামের বিবাহ হইয়াছে, আবার আজ ভার্গব সেইরূপ শরাসন আনিয়াছেন, বুঝি রামের আবার বিবাহ হয় অতএব—

কতই সপত্নী মম আছে পোড়া ভালে!

সীতার এই আশঙ্কাটুকু মন্দ নহে। সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, ইহাতে রস আছে।

দশম সর্গে ভার্গব-রাঘব-দ্বন্দ্ব অবলে-

কন করিতে ত্রিদিব-তলে ত্রিদশসমূহ সভা করিয়া বসিয়াছেন। পার্ব্বতী শঙ্করকে বলিলেন, রাম এবং ভার্গব উভয়েই আমার প্রিয়, অতএব এ দ্বন্দ্ব যাহাতে নিবারিত হয় তাহা কর। মহাদেব ভার্গবের নিকট পদ্মাকে পাঠাইলেন। বলিয়া পাঠাইলেন,

পরাজয় অঙ্গীকরি দাশরথি কাছে
সপ্রণয়ে প্রার্থী লহ স্বর্গমার্গরোধ।

ইতিপূর্ব্বেই রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে ধনুর্গ্রহণ করিয়াছিলেন। তার পর একটী শর চাহিয়া লইয়া ধনুতে যোজনা করিয়া বলিলেন—এই শরে আপনাকে বধ করিতে পারিতাম,কিন্তু ব্রাহ্মণ অবধ্য; অতএব ইহার লক্ষ্য দেখাইয়া দিন। এ দিকে পদ্মা আসিয়া ভার্গবের উপর শিবের হুকুম জারি করিয়া গেল। পরশুরাম রামচন্দ্রকে বলিলেন, আমার স্বর্গমার্গ রোধ কর। তাহাই হইল।

একাদশ সর্গে উভয় রামে প্রীতিসংস্থাপন হইল। তার পর ভার্গব সাধারণসমক্ষে ক্ষত্রবধ বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, রাঘবকে আলিঙ্গন করিলেন, ক্ষত্রবধতেজঃ সমর্পণ করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং শেষে প্রস্থান করিলেন। দশরথ আনন্দিত হইলেন, সীতা প্রফুল্লিতা হইলেন—সকলেই উল্লাসিত হইল।

দ্বাদশ সর্গে সকলের আনন্দ, বাদ্য, নৃত্য, গীত, বন্দিবৃন্দের বন্দনাসঙ্গীতিকা, দেবগণের স্বস্থানে প্রস্থান, আকাশ-বাণী, এবং গ্রন্থকারের মামুলি আত্মপরিচয়;—কাজের কথা প্রসঙ্গাধীন কথা, নাই বলিলেই হয়।

ত্রয়োদশ সর্গে সকলের অযোধ্যা প্রবেশ। এই সর্গে পথিপার্শ্বস্থ সৌধবাজিস্থ পুরন্ধ্রীবর্গের বিবিধ বিভ্রমবিচেষ্টা পাঠ করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের কালিদাসকে মনে পড়িবে। বাস্তবিক এই স্থলটি কালিদাসের অনুকরণ, স্থানে স্থানে অবিকল অনুবাদ।

এই খানেই কাব্য শেষ হওয়া উচিত ছিল। ইহার পর তিন সর্গ কেবল প্রকৃতিবর্ণনা এবং অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কথা। এ তিন সর্গ একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিলেও মূল কথার কোনই ক্ষতি হয় না।

আমরা সমালোচ্য গ্রন্থের যতটুক্ পরিচয় দিয়াছি তাহাতেই পাঠকবর্গ অবশ্য বুঝিয়াছেন যে গ্রন্থখানি এত বড় হইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। শেষ তিন সর্গ, দ্বাদশ সর্গ, তৃতীয় সর্গ, এবং প্রথম সর্গ একেবারে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য সর্গেরও অনেক অংশ ত্যাগ করা যায়, এবং প্রত্যেক সর্গেরই শেষ ভাগ—আত্মপরিচয় এবং অনুগ্রহভিক্ষা—পরিবর্জ্জনীয়। যে সকল উপায়ে গ্রন্থকলেবর স্ফীত হইয়াছে, তদবলম্বনের অর্থ আমরা খুঁজিয়া পাই না। নিসর্গবর্ণনাতেই গ্রন্থের প্রায় চতুর্থাংশ নিয়োজিত। নিসর্গ বর্ণনা মন্দ নহে, কিন্তু কেবল প্রাতঃকাল বর্ণনা করা একটা সম্পূর্ণ সর্গ গ্রন্থকারের কুরুচির পরি-